সংসার তরু

বা

শান্তি-কুঞ্জ।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।
শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১১১ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

চতুর্থ সংস্করণ।

শীল-প্রেস।
৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১৫ সাল,

সংসারি তরুর লিখিত বিষয় সমষ্টি বা সূচীপত্র।

পৃথ্বী ও সৃষ্টি-তত্ত্ব।

জীব-তত্ত্ব।

সংসার-তত্ত্ব।

চিকিৎসা তত্ত্ব।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

জ্যোতিষ তত্ত্ব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শান্তি-কুঞ্জের বিষয় সমষ্টী।

পাগলের ফিলজফি।

তীর্থ তত্ত্ব।

ব্রত তত্ত্ব।

পারত্রিক তত্ত্ব।

কর্ম্মভোগ।

—০—

সমাপ্তঃ।

সংসার-তরু।

পৃথ্বী ও সৃষ্টি-তত্ত্ব।

প্রথম প্রবন্ধ।

মনুষ্য মাত্রেরই সময় বিশেষে এই চিন্তা মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের আদি কি, এবং কোন্ পর্য্যায়ে আবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে ভূতপঞ্চের সংযোগসিদ্ধ ধরিত্রী অগণ্য জড়চেতন পদার্থ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এই যে অনন্ত অকুল নীরনিধি অনন্ত ধরণী পরিবেষ্টন করিয়া অনন্তের উদ্দেশে অনন্তগতিতে গমন করিতেছে, এই যে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া আপনার বেগে আপনি পরিচালিত হইয়া অনন্তপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই যে জগতপ্রাণ সমীরণ অলক্ষ্যে থাকিয়া কখন বা সুখদ সুগন্ধসমীরে জীবগণকে শান্তি দান করিয়া—কখন বা ভীম প্রভঞ্জনরূপে জীবগণকে আকুলিত করিয়া আনুভবশক্তির দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদান করিতেছে, এই যে অনন্ত শূন্যময় আকাশ স্বতঃশূন্য হইয়াও পৃথিবীর আচ্ছাদন চন্দ্রাতপ হইয়া রহিয়াছে, এই প্রাকৃতমনুষ্যবুদ্ধির অতীত বিষয় পরম্পরা আলোচনা করিলেই মনে হয়, কোন্ লীলাময়ের এই লীলা? এই লীলাক্ষেত্রের আদিতেই বা কি ছিল, অন্তেই বা কি হইবে? এই বিশ্ব কোন্ অনাদি পুরুষের অনন্তশক্তির প্রতিভূ? এ তত্ত্বের সর্ব্ববাদীসম্মত সামঞ্জস্য কৈ অনুসন্ধান করিয়া ত পাই না?

এমতস্থলে সৃষ্টির পূর্ব্বকালের কোন ধারাবাহিক ঘটনার সমাধান, যদ্দারা পরিতৃপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় কোন জাতীর দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই। এই জন্যই বিবেচনা করা যাইতে পারে,

এবং কিম্বদন্তি আছে যে, প্রাচীনতম কালের যৎসামান্য বিবরণাদি অপৌরুষেয়। যাহা অপৌরুষেয়,—তদ্বিষয়ক কোন প্রশ্নের সমালোচনায় সাধারণের অধিকার বা ক্ষমতা নাই।

তবে বাস্তবিকই কি প্রাচীন কালের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই? সৃষ্টিতত্ত্বের প্রীতিপ্রদ সামঞ্জস্যের সুবিধানে তবে কি কোন জাতীয় কেহই আয়াস স্বীকার করেন নাই?—আছে সব। প্রত্যেক জাতীরই কোন না কোন ব্যক্তি সৃষ্টিতত্ত্ব সঙ্কলনে জীবনপাত করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সকল তত্ত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত নহে; সে প্রমাণ সকলের নিকট প্রামাণ্য নহে। যে বিষয় একজনে প্রামাণ্য বলিয়া মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, শতমুখে সেই তত্ত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন, আবার সেই বিষয়টিই অপর এক ব্যক্তি পদদলিত করিতেছেন, এবং সেই বহুযত্ন সংগৃহীত বহুমূল্যমস্তিষ্কবিনিয়োগোদ্ভাবিত বিষয়টি বাতুলের অসম্বন্ধ প্রলাপ-জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্ববাদীসম্মত কোন সামঞ্জস্য অদ্যাপি কোন জাতি দ্বারা কোন ভাষায় মনুষ্যচক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই।

কত মহামহাপণ্ডিত এই তত্ত্ব নিরূপণে তাঁহার অমূল্য জীবনপাত করিলেন, কত কত ধনকুবের এই তত্ত্বের সঙ্কলনে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিলেন, কত কত মহাপ্রাজ্ঞমনিষীগণ এই তত্ত্বের সামঞ্জস্যার্থ মস্তিষ্ক বিকৃত করিলেন, তথাপি সকলই বিফল হইল। তবে আমরা এই তত্ত্ব নিরূপণে কোন্ সাহসে অগ্রসর হইব? এ সমুদ্রের কুলকিনারা নাই, আমরা কি সাহসে এই অকুলসমুদ্রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভেলা ভাসাইব? কোন্ সাহসে এই অভ্রভেদী হিমালয়ের নিকট ক্ষুদ্র বল্মীকপিণ্ডের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাইব? আমাদিগের ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধিতে এই অনন্তের অনন্ততত্ত্ব ধারণায় আসিতে পারে না। আমরা কেবল পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণ যে যে পন্থায় পরিভ্রমণ করিয়া যে যে তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল চিত্রগুলি পাঠকগণের চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিব। কোন্টী প্রামাণ্য এবং কোনটী সমধিক সত্যের ভিত্তিতে গ্রথিত, সে বিবেচনার ভার পাঠকের উপর রহিল।

সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের উক্তিই গ্রহণ করিতেছি। তাঁহারা

বলেন—বেদ হিন্দু ধর্ম্মের শিরোভাগ। বেদ অপৌরষেয়, স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ-নির্গত পবিত্র গ্রন্থ। অতএব বেদের উক্তিই সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদের উক্তি গৃহীত হইতেছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শতাধিক ঊনত্রিংশ সূক্তের কয়েকটী ঋকের তাৎপর্য্য বুঝিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। বেদে আছে "সেই আদিতে সৎ, অসৎ, রজো বা ব্যোম কিছুরই অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল না। তবে কিসের দ্বারা আবৃত ছিল? অথবা এই সকল বীজ কোন্ বস্তুর অভ্যন্তরে নিহিত ছিল। সে কি জল, না গভীর গহন? হয় ত তখন মৃত্যু বা অমৃতত্ব ছিল না, রাত্রি দিবার ভেদ ছিল না। কেবল যাঁহার অন্তর বা ঊর্দ্ধ কিছু নাই, যিনি আপনাতে শ্বাস ক্রীড়ায় নিরত, সেই তিনিই কেবল বর্ত্তমান ছিলেন। অগ্রে অন্ধকার—নিবিড়ান্ধকারে নিমজ্জিত এবং সর্ব্বত্র সলিল দ্বারা আবৃত ছিল। যিনি তুচ্ছ স্বরূপ এবং তুচ্ছদ্বারা আবৃত ছিলেন, তিনিই তপোদ্বারা পরিপুষ্ট হইলেন। মনের প্রাথমিক বীজ কাম সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন এবং কাম হইতে রেতঃ সমুৎপন্ন হইল। সদসদের সংযোগরজ্জু স্বরূপ ইহার অবস্থান। ইহার অনুভব কবিগণ স্ব স্ব হৃদয়ে বুদ্ধিদ্বারা করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগত ব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত, তাহা অধোতে কি ঊর্দ্ধে অবস্থাপিত ছিল? রেতঃ, মহিমা এবং স্বধা নিম্নে ও মহাশক্তি কি ঊর্দ্ধে ছিল? এ সৃষ্টি কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল? কেই বা সৃষ্টি করিল? ইহা কে বলিতে পারে। দেবতারও ত তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে, তাঁহারা ত সৃষ্টির পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারাই বা কেমন করিয়া বলিবেন? অতএব এ তত্ত্ব কে বলিবে? যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি স্বর্গে, তিনিই এ তত্ত্ব অবগত আছেন? অথবা তিনিও হয় ত ইহা না জানিতে পারেন। (১)

১ ন অসদ্ নোশদ্ আসীৎ তদানীং।
নাসীদ্ রজো নো ব্যোমপরোযৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিম্
আসীদ্ গহনং গম্ভীরম্॥ ১॥
ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি রাত্র্যাঃ
অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদ্ অবাতং স্বধয়াতদ্ একং তস্মাদ্ হ
অন্যদ্ ক পরঃ কিঞ্চিনাস॥ ২॥

বেদের পর পৌরাণিকেরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি প্রকার মত প্রকটন করিতেছেন, তাহাও এস্থলে গৃহীত হইল।

জগৎ অনাদি কাল হইতেই এইরূপ ধনধান্যপূর্ণ জীবন্ত জন্তু সমাকুলিত ছিল। কোন সময়ে ইহার আদি এবং কোথায় বা ইহার অন্ত, সে সম্বন্ধে পৌরাণিকেরা তাদৃশ বিচার করেন নাই। তাঁহারা কেবল একটী জল-প্লাবন বা মহাপ্রলয় হইতে সৃষ্টির আদিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। মহাপ্রলয় সম্বন্ধে পৌরাণিকেরা বলেন, "জগৎ পাপভারে পীড়িত হইলে, ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারে জগৎ জলময় হয়। সংসারে জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, চেতনাচে-তনোদ্ভিদমাত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। কেবল একমাত্র বৈবস্বত মনু জীবিত থাকেন। মৎস্যরূপী ভগবানের আদেশে তিনিই সপ্তর্ষিমণ্ডলীর

তমঃ আসীৎ তমসা গুঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতং
সলিলং সর্ব্বং আ ইদম।
তুচ্ছেন আভু আপহিতং যদ্ আসীৎ তপসস
তদ্ মহিমা অজায়তৈকম্॥ ৩॥
কামস তদ্ অগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদ্ আসীৎ।
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন হৃদি
প্রতীষ্যাকবয়ো মনিষা॥ ৪॥
তিরশ্চী নো বিততো রশ্মির এযাম্ অধঃস্বিদ্
আসীদ্ উপরি স্বিদ্ আসীৎ।
রেতোধাঃ আসন্ মহিমানঃ আসন স্বধা
অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫॥
কে অদ্ধা বেদ কঃ উহ প্রবোচৎ কুতঃ
অজাতা কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ
আবাগ দেবাঃ অস্য বির্জ্জনেন অথা
কো বেদ যতঃ আবভুব॥ ৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির যতঃ আবভুব যদি বা
দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গবেদ যদি বা ন বেদ॥ ৭॥

ঋগ্বেদ। ১০ মঃ। ১২৯ সূ।

সহিত সপরিবারে এবং নিষ্পাপ প্রত্যেক জীবের এক এক দম্পতী সহযোগে এক বিচিত্র বহিত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং জলপ্লাবনের সময় মৎস্যরূপী ভগবানের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া জলপ্লাবন হইতে সৃষ্টিরক্ষা করেন।

বাইবেল মতে "ঈশ্বর প্রথমেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করেন। তখন মর্ত্ত্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা বা আকার ছিল না, ঘোর ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঈশ্বর কহিলেন, আলোক হউক, এমতে আলোক হইল। তখন তিনি ইহা সুন্দর দেখিয়া অন্ধকার হইতে আলোককে পৃথক করিলেন। এইরূপে ক্রমশ দিবা রাত্রি, স্থল জল, নদী সমুদ্র সৃষ্টি হইল। (২) তিনি প্রথমে জলচর, ও খেচর সমূহ সৃজন করিলেন। তৎপরে পশ্বাদি সৃষ্ট হইল, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার স্বরূপ মনুষ্য সৃজন করিলেন। (৩) পৃথ্বী ও সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা এই পর্য্যন্ত। জলপ্লাবন সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি, ঈশ্বর পাপীদিগের দমনার্থ একচত্বারিংশদিবসব্যাপী জলপ্লাবন করেন। তাহাতে পরম পুণ্যাত্মা নোয়া নামধেয় ব্যক্তি এক বিচিত্র বহিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সমস্ত জীবের এক এক যুগ্ম রক্ষা করেন। স্বয়ং এবং সেম্, হাম্ ও যাফেৎ নামা পুত্র ও পুত্রবধূত্রয় সহ সেই নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। নোয়া হইতেই সেই মহাজলপ্লাবনে সৃষ্টিরক্ষা হয়।

গ্রীক পুরাণে উল্লেখ আছে, "সর্ব্বাগ্রে মহাপ্রলয়ের (choas) উৎপত্তি হইল, সুতরাং উহাই প্রথম এবং সৃষ্টির আদি। তৎপরে সর্ব্বসহা গেয়া অর্থাৎ পৃথিবীর উদ্ভব। ইহার পৃষ্ঠস্থলে দেবমানবের বাসস্থান এবং নিম্নস্থলে

(২) In the begining God created the heaven and the Earth, without form and void; and darkness was upon the face of the deep. * * And god said. let there be light. and there was eight. and it was god devibed the light from the darknese.

(৩) And god said, let us make man in our image, Bible,

The Italian Author Dr. Francesco says "man, made in the image of God, was also made in the image of the Ape"

গুহার আকারে তার্ত্তারোস্ বা নরক স্থান।" (৪) গ্রীক পুরাণ বিশেষে আবার ইহার বিভিন্ন মতও আছে। (৫) জলপ্লাবন সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণে বারদ্বয় উক্ত হইয়াছে। প্রথমবারে ওপাইজেস্ এবং দ্বিতীয় বারে ডিউকেলিয়ন কর্ত্তৃক সৃষ্টি রক্ষা হয়।

চীনদিগের পৌরাণিকেরাও তাহাদিগের শাস্ত্রে জলপ্লাবন স্বীকার করে। জলপ্লাবনে পয়ানসু নামক পুণ্যাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টি রক্ষা প্রাপ্ত হয়।

সাইবিরীয়েরা জলপ্লাবন স্বীকার করে। হন্দল পর্ব্বত গুহা তাহাদিগের এক প্রধান তীর্থস্থান। ইহাদিগের বিশ্বাস, এই গুহাপথে জলপ্লাবনের তাবৎ জল ভূগর্ভে প্রবাহিত হইয়াছিল।

মিসরীয়দিগের শাস্ত্রে ঈশ্বর স্বয়ং দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রথম ভাগের নাম নেক অর্থাৎ অনন্তকাল ব্যাপক, এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম পথা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাদের আর একটি দেবতার নাম আমন। ইনি পালন কর্ত্তা। (৬) জলপ্লাবনেরও উল্লেখ আছে। তাহাদিগের দেবতা জোন্দের পরামর্শ মতে আসিরিস্ নামক ব্যক্তি সৃষ্টিরক্ষায় ব্রতী হয়েন।

কাল্ডীয় জাতীর ইতিহাসে উল্লেখ আছে, প্রথমে শূন্য হইতে এক আদিম পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাহার নিম্নতর দশমপুরুষের সমকালে জলপ্লাবন হয়। সেই সময় ধর্ম্মাত্মা রিসুথ্রস্ রাজা ছিলেন। তিনি মীন-

(৪) গ্রীক পুরাণের বিবরণ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "গ্রীক ও হিন্দু" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

(৫) গ্রীক পুরাণকার আর্ফিউসের মতে সর্ব্ব প্রথমে ক্রোণোস্ বা কালের উৎপত্তি। তৎপরে ইথার অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয়। মহাপ্রলয় হইতে ক্রোণোস্ একটি অণ্ড উৎপাদন করেন, সেই অণ্ড উদ্ভেদ করিয়া স্ত্রীপুরুষ উভয় গুণ ও ধর্ম্মযুক্ত এক দেবতার আবির্ভাব হয়। ইহার নাম ফানিস। ফানিস ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি প্রসব করে। ইহার অভ্যন্তরে যাবতীয় সৃষ্টীর প্রাথমিক বীজ নিহিত ছিল। এই উক্তির সহিত হিন্দুশাস্ত্রের সম্যক সামঞ্জস্য উপলব্ধি হয়। স্থানান্তরে সে কথা বিবৃত হইবে।

(৬) হিন্দুর ত্রিদেবের সহিত ইহার সামঞ্জস্য অনুভূত হয়। বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

নরাকার ওয়ানে নামক দেবতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এক সুবৃহৎ তরণী নির্ম্মাণ করেন এবং যাবতীয় জীবজন্তু সহ স্বয়ং সপরিবারে সেই তরণীমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন। (৭)

ফিনিসীয়েরা জলপ্লাবনের কথা স্বীকার করে না। তাহাদিগের মত, জগৎ স্বয়ংই অনাদি, অনন্তকাল হইতে এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে, ইহার আদি বা অন্ত নাই। ইহাদিগের মতে জগৎ প্রথমে জলময় ছিল। গভীরধূমে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন ছিল। তৎপরে স্বশক্তি সমুৎপন্ন বেল্‌সিমন্‌, আষ্টটি, এবং মেলিক্টস্‌ উদ্ভূত হইয়া যথাক্রমে সৃজন পালন ও ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। (৮)

যূদীয় পুরাণে (পুরাতন বাইবলে) সৃষ্টির বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। য়াভোঃ বা যেহোবো (অগ্নি) প্রথমে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। জলপ্লাবন বৃত্তান্ত নূতন বাইবলের অনুরূপ।

পারসীক পুরাণ জেন্দ রচিত অবেস্থা। এই গ্রন্থের সাধারণ নাম জেন্দাবেস্থা। ইহাদিগের মতে অর্ম্মসদ্‌ও অহ্রিমান নামক আদি পুরুষদ্বয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

কোরাণে আছে, জগৎ প্রথমে অন্ধকার ছিল।--তৎপরে খোদা (আল্লা বা ঈশ্বর) আলোক সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে মনুষ্য, তৎপরে জীবজন্তু সৃজন করিলেন। ইহাদের মতে নু নামক পরমধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জলপ্লাবন হইতে সৃষ্টি রক্ষা করেন।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পেন্সর বলেন, সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু যথেচ্ছা (in a chaotic State) বিস্তৃত ছিল। এই পরমাণুরাশি ভিন্ন কোন পদার্থ বিশেষের অস্তিত্ব ছিল না। (৯) পরে সেই সমস্ত পরমাণুরাশি একত্রিত (condensation) হইতে আরম্ভ হইয়া বাষ্প-

(৭) বৈবস্বত মনুও মৎস্যাবতারের সহিত কাল্ডীয় ইতিহাসের সুন্দর সাদৃশ্য আছে। এ সব কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে।

(৮) হিন্দুপুরাণ বর্ণিত ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের সহিত ঐক্যতা দেখুন।

(৯) আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রেও অবিকল এই মতের পরিপোষক মত নিহিত আছে। পাঠক ন্যায়মীমাংসার সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করিলেই সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন।

রূপে পরিণত হয়। সেই বাষ্প হইতে উত্তাপ ও অগ্নি এবং অগ্নি হইতে উত্তপ্ত তরল পদার্থ (melten State) সমুৎপন্ন হয়। পরিশেষে উত্তাপ হ্রাস হইয়া আসিলে সেই উত্তপ্ত তরল পদার্থ হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইল।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাভারতে উল্লেখ আছে,—"পরমপিতা পরমেশ্বর প্রথমে প্রজাপতিকে সৃজন করিয়া তদ্দ্বারা এই নিখিল বিশ্বসংসার সৃজন করেন। সেই বিশ্বস্রষ্টা সনাতন পুরুষই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা (১০) নামে সুপ্রসিদ্ধ। সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়,—পরে এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশাদি সূক্ষ্ম মহাভূতের উৎপত্তি হয়। (১১)

(১০) ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ সূক্তে ব্রহ্মা স্তুতি ও প্রার্থনা শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ন ব্রহ্মা শব্দের অর্থ করেন, যজ্ঞ, মহত্ব। (Roth) রোথ বলেন, ব্রহ্মা শব্দে, প্রার্থনা, পবিত্র, বাক্য, জ্ঞান, সততা, পরমাত্মা ও পুরোহিত বুঝায়। মোক্ষমূলর (Maxmuller) বলেন, বৃহ ধাতুর অর্থ বর্দ্ধন। যিনি বৃদ্ধি করেন,—জীব বৃদ্ধি করেন অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যদ্বারা যিনি ধরায় জীবসংখ্যা বৃদ্ধি করেন, তিনিই ব্রহ্মাপদ বাচ্য।

(১১) আর্য্য ঋষিগণ পঞ্চভূতেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই পঞ্চভূত সংযোগলব্ধ এই জগৎ, সেই পঞ্চভূতের গুণও পাঁচ পাঁচটী অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। সে সকল বিষয় কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক অনুমোদিত। যথা,—

ক্ষিতি	অপ	তেজ	মরুৎ	ব্যোম
রূপ	রস	স্পর্শ	গন্ধ	শব্দ
চক্ষু	জিহ্বা	ত্বক্	নাসিকা	কর্ণ
Solid	Lirnid	Phlogiston	Gas	Æther

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত যে পঞ্চভূত, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল। কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এ তত্ত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এরিষ্টটল (Aristoace) ভূত পদার্থ দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা,—দ্রব্য Substance, গুণ Quaerty, পরিমাণ Quantity, সম্বন্ধ Relation, কর্ম্ম Action, অধিভাব Passiyon, স্থান Place, কাল Time, অবস্থা Postnre ও স্বভাব Habit.

আবার জার্ম্মাণ দার্শনিক কান্ত (Kant) সপ্তদশ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জর্ম্মনভূমি বিকম্পিত করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত সপ্তদশ তত্ত্ব এই,—কাল Time, স্থান Space একত্ব Unity, বহুত্ব Plurality, পূর্ণত্ব Totality, অস্তিত্ব বাদ Affirmation, নিরীশ্বরবাদ Negation, সীমা Limi-

আবার সেই সকল মহাভূত হইতে এই জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে।

ভগবান প্রজাপতি সর্ব্বপ্রথমে জলের সৃষ্টি করেন। নরের জীবন স্বরূপ বলিয়া জলের আর একটী নাম নার হইয়াছে। ঐ নার সৃষ্টিকালে বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হইয়াছিল। জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে সেই বীজ হইতে একটী হিরণ্যবর্ণ অণ্ড উৎপত্তি হইল। সেই অণ্ডে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নির্গমন কালে অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ স্বর্গ ও অপরভাগ পৃথিবী নামে অভিহিত হইল। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে যে শূন্যময় স্থান রহিল, তাহারই নাম হইল আকাশ।

ভগবান হিরণ্যগর্ভ এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সূর্য্য ও দশদিক সৃজন করিলেন। দ্বিধা খণ্ডিত অণ্ডমধ্যে মন, বাক্য, কাল, কাম ও জড়পিণ্ডের সৃষ্টি হইল। তৎপরে সপ্তপ্রজাপতির সৃষ্টি হইল।

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাণবিশেষের উক্তি,—পিতামহ স্বয়ম্ভু প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আপন দেহ দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। তাহার এক অংশ নর ও অপরাংশ নারী হইল। এই হইতে যোনীসম্ভব জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

এক্ষণে এই বিভিন্ন শাস্ত্রীয় মতানুসারে সর্ব্ববাদী সম্মত এই কয়েকটী কথা প্রাপ্ত হওয়া গেল। প্রথম—জগৎ আদিতে ঘোর অন্ধকার ছিল, অনন্ত বারিরাশি জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ছিল, জনপ্রাণী বা কোন জীবিত
tation, পদার্থ Substance, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ Caucality, পারস্পরিক সম্বন্ধ Reciprocity, সম্ভাবনা Possibility, যথার্থতা Actuality, অপরিহার্য্যতা Necessity, চিৎ Soul, প্রকৃতি Uuiversal, এবং ঈশ্বর God. এই সপ্তদশ তত্ত্ব একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে সকল তত্ত্বের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। মূলে সেই পঞ্চভূতেই সমাহিত হয়।

ভিক্তর কসীন (Victor Cousin) কেবল মাত্র চারিটী তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যথা Ego অহং, Non-Ego আমা ভিন্ন অন্য, Infinite Cause অসীম কারণ এবং Relation of the me and the not me to the infinite substance অসীম কারণের সহিত অহং পদার্থ ও আমাভিন্ন পদার্থের যে সম্বন্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ তত্ত্বচতুষ্টয় সমধিক গ্রাহ্য।

অলভ্যমিচ্ছন্ নৈষ্কর্ম্মান্ মূঢ়বুদ্ধিরিহোচ্যতে।

বা অচেতন সত্বার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত না, এবং উপলব্ধি করিবারও কেহ ছিল না। দ্বিতীয়—একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। নিরীশ্বরবাদীরা বলুন, জগৎ স্বভাবসম্ভূত।—ঈশ্বর কেহ নাই। আমরা নিরীশ্বরবাদীদিগের সহিত তর্ক করিব না, তাঁহাদিগের উক্তি আমরা শিরোধার্য্য করিয়া বলিব, তাঁহারা ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া যে মহাশক্তির উপাসনা করেন, যে মহাশক্তির অসীম ক্ষমতার গুণানুবাদ করেন, যে শক্তির সমন্বয়ে এই জগৎ ও পরিদৃশ্য-মান যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মহান শক্তির নামই আমরা বলি ঈশ্বর। ঈশ্বর শক্তির আধার।

কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা অবশ্যই স্থিরীকৃত ছিল যে, উহা মনুষ্যাদি জীবন্ত প্রাণী, এই জড়পদার্থের আধার হইবে। এতাবতায় জগতে সৃষ্ট সত্বার ভবিষ্য অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ছিল। জগৎ সৃষ্ট হইল, মনুষ্য বাসের জন্য। এখন কিরূপে সেই ধূমাবরিত জীবন্তসত্বাপরিশূন্য অনন্তবারিবিক্ষোভিত জগত মনুষ্যবাসোপযোগী হইল, এবং কিরূপেই বা জনশূন্য সেই নিবিড় ভূভাগে সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন মনুষ্যের আবির্ভাব হইল, তাহাই আলোচিত হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতামত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধেই প্রকটিত হইল, এক্ষণে ইহার অবান্তর ব্যবচ্ছেদে প্রামাণ্য প্রাকৃতিকতত্ব সঙ্কলনে অগ্রসর হওয়া হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

(পৃথ্বীতত্বের উপসংহার।)

প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সম্মত সৃষ্টিতত্ব পর্য্যালোচনা করিলে যাহা সতঃই উপলব্ধি হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

স্বয়ম্ভু সর্ব্বপ্রথমে একটী অণ্ড প্রসব করেন। সেই অণ্ড মধ্যে বিরাট পুরুষ নিহিত ছিলেন। কালে শক্তিবলে বিরাটপুরুষ সেই অণ্ডকে

দ্বিখণ্ডিত করিয়া তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন। অণ্ডের উর্দ্ধভাগ স্বর্গ ও নিম্নভাগ মর্ত্ত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। বিরাটপুরুষ ব্রহ্মা তখন প্রজাসৃষ্টি মানসে ক্রমান্বয়ে নারদাদির সৃষ্টি করিলেন। নারদাদি প্রসূত হইয়াই সাংসারিক কার্য্যকলাপে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেন। প্রসূতমাত্রেই ব্রহ্মপদ ধ্যানে নিরত হইলেন। সর্ব্বশেষে প্রজাপতি দক্ষ (মতান্তরে মনু) সৃজিত এবং তৎকর্ত্তৃক লোক সমূহ সৃষ্ট হইল এবং কালে ধরাপৃষ্ঠে অগণ্য লোক পরম্পরার আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হইল।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক উপাখ্যান ভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এমন একটী সর্ব্ববাদীসম্মত বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার সহিত সকল জাতীয় শাস্ত্রের ঐক্যতা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

শাস্ত্র বিশেষের উক্তি, স্বয়ম্ভূনাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হন, সেই জন্য ব্রহ্মার একটী নাম কমলাসন। বেদে ইহার নাম মানব বা মহৎ। এই মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে ভূমি, ভূমি হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বায়ু এবং সেই সমস্তের সমবায়ে পৃথিবীর উৎপত্তি। অর্থাৎ এই পঞ্চভূতের সংযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি ব্রহ্মার মূর্ত্তি ব্যাখ্যায় পঞ্চভূত দ্বারা তাঁহার দেহ গঠিত হইয়াছিল। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মাকে জগৎব্যাপী বলিয়া থাকেন। জড়বাদীরাও এই সূত্র অবলম্বনে জগৎব্যাপী পঞ্চভূত-সংযোগসাধ্য ব্রহ্মাকে সাধারণতঃ জড় নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রের মতে শক্তিই কেবল অনাদিকাল হইতে আছেন। জড়ের উপর এই শক্তির আবির্ভাব হেতু সৃষ্টিকার্য্য সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই জড় কার্য্যকালে শক্তিবিশিষ্ট হয়। জড়ময় মানবদেহ এই শক্তি বলেই চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। শক্তি প্রাণরূপে যে পর্য্যন্ত মানবদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, ততক্ষণ জীবন অক্ষয় থাকে। শক্তির অভাব হইলেই মানব যে জড়—সেই জড়েই সমানীত হয়। পরন্তু শক্তি বলেই সংসারের অস্তিত্ব। শক্তি না থাকিলে সংসার এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।

পরন্তু কি শক্তি, কি শৈব, কি সৌর আর কি গাণপত্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে কখনই কুণ্ঠিত

হইবেন না। সেই সমস্ত দেবতার আভ্যন্তরিক চিত্ত অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সকলের মূলেই সেই শক্তি ও জড় বা প্রকৃতিপুরুষ। আবার সেই উভয়ের সংযোগে এক অনাদি পুরুষ।

আস্তিক সম্প্রদায়ের মতামত এক প্রকার আলোচিত হইল, অতঃপর নাস্তিক ও দার্শনিকগণের দুই একটী মত আলোচনা করা এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দর্শনের দর্শনশক্তি এই তত্ত্বের স্বরূপ দর্শনে কতদূর সমর্থ হইয়াছেন, এবং নাস্তিক সম্প্রদায় স্বভাবকেই বা কতদূর উচ্চ সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা একবার দেখা আবশ্যক।

সৃষ্টি ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্ব্বিন যে মত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই এখন পাশ্চাত্য প্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার বিশ্বাস্য, সুতরাং পূজনীয়। দর্ব্বিনের প্রতিকূল মতাবলম্বী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অঙ্গুলীমেয়, সুতরাং তাঁহাদিগের মতদ্বৈধ প্রচারার্থ উচ্চ চীৎকার সাধারণের কর্ণপথে প্রায়ই প্রবিষ্ট হয় না। এমন স্থলে দর্ব্বিনের মতই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

সর্ব্বপ্রথমে জগতে যে প্রাণী মাত্রেরই অস্তিত্ব ছিল না, নিম্নে অনন্ত প্রসর বারিরাশি ধূ ধূ করিত, শূন্যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইত না, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণের প্রদীপ্ত রশ্মি তখনও জগতের পৃষ্ঠে পৌঁছে নাই, আকাশে কেবল ঈথর ও নেবুলার গতায়াত ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না, এ কথা দর্ব্বিন স্বীকার করেন। তিনি বলেন, জগৎ জলময় ছিল এবং সেই জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলচর প্রাণী আপনা হইতেই উদ্ভূত হয়। ইহার প্রমাণ, কোন নির্জ্জন স্থানে একটী পাত্রে জল রাখিয়া অতি সাবধানে রাখিলে, কিছুদিন পরে সেই জলমধ্যে কীট এবং মশক দৃষ্টিগোচর হইবে। এই জলে কোন প্রাণী প্রবেশ করিতে পারে এমন পথ ছিল না বা জলেও তাদৃশ কোন পদার্থ ছিল না, যদ্দ্বারা উক্ত কীটাদি জন্মাইতে পারে। দর্ব্বিন এই বাক্যকে দৃঢ় করিয়া তিনি সেই অনন্তব্যাপী জলরাশি মধ্যে জলচর জীবের স্বাভাবিক সত্ত্বা অনুভব করেন (১২) তিনি আরও বলেন, কালের

(১২) প্রবাল কীট হইতে প্রবাল রত্নের উৎপত্তি। ইহাও ঐ বাক্যের

অসামান্য আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া সেই সব জলচর ক্ষুদ্র কীটাদি হইতে বৃহৎ কলেবর মৎস্যের উৎপত্তি হয়। এদিকে চন্দ্রসূর্য্যাদির আকর্ষণে কাল-ক্রমে জলভাগ হইতে ক্রমশঃ স্থলভাগ পৃথক হইতে লাগিল। জলভাগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ জন্মিল। তখন মৎস্যগণের গমনাগমনের অসুবিধা হইতে লাগিল। দ্রুতগমনে তাহারা দ্বীপস্থ মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিহত হইতে লাগিল। এইরূপে বক্ষঃস্থলে বারম্বার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের বক্ষঃস্থল দৃঢ় হইতে লাগিল। ক্রমে কালক্রমে তাহাদিগের প্রবৃত্তি সেই দ্বীপ বিচরণে অগ্রসর হইল। বহুকাল হইল, সেই চেষ্টায় উভচরের সৃষ্টি।

প্রকৃতির এমনই অত্যাশ্চর্য্য নিয়ম যে, যাহার যাহা আবশ্যক তাহা স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, এবং অনাবশ্যকীয় যাহা, তাহা স্বতঃই ধ্বংস হয়। (১৩) ক্রমে বহুসংখ্যক উভচর জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া স্থলভাগেই অবস্থান করিতে লাগিল। সূর্য্যোত্তাপ নিবারণের জন্য ভাববশে তাহাদিগের গাত্র রোমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। স্থলভাগ কখন শূন্য থাকে না, স্বভাবতই মৃত্তিকায় লতাগুল্ম জন্মে। (১৪) বহুকাল অনাবৃত মৃত্তিকায়

অনাহত প্রমাণ। শ্বেতসমুদ্রে (white Sea) বিদ্রুমা নামে একপ্রকার লতা জন্মে। ঐ লতা হইতে যে নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহা হইতে স্বতঃই প্রবাল কীট জন্মে। ভূমধ্য ও লোহিত সাগরেও প্রবাল পাওয়া যায়।

শ্বেতসাগর মধ্যে তু জায়তে বল্লরী তু যা।
বিদ্রুমা নাম রত্নাখ্যা দুর্ল্লভা বজ্ররূপিণী।

রত্নরহস্য।

(১৩) ব্যাঙাচি জলে যতদিন থাকে, ততদিন তাহাদিগের পুচ্ছ থাকে, স্থলে উঠিলেই অনাবশ্যকতা হেতু আপনা হইতেই পুচ্ছ খসিয়া যায়। স্তন্যপায়ী বালকের প্রথম অনাবশ্যকতা হেতু দন্তোদ্ভেদ হয় না, পরে আবশ্যকতা অনুসারে দন্তোদ্গম হইয়া থাকে।

(১৪) এই বিষয়টি পাঠ করিয়াই পরীক্ষার্থ আমরা গঙ্গার মধ্য ভাগ হইতে অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আনিয়া একটি নূতন টবে পূর্ণ করিয়া রাখি। তথায় কোন উদ্ভিদের বীজ বা মূল সংস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রায় এক পক্ষ পরে আমরা সেই মৃত্তিকায় তৃণাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুর দেখিতে পাই, এবং তৎপরে আরও এক সপ্তাহ পরে দেখি, টবটি তৃণাদিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গঙ্গার যে স্থান হইতে মৃত্তিকা আহৃত হয়, সেই স্থান কতকাল হইতে যে জলমগ্ন আছে, তাহা অনুমানেও আইসে না।

আপনা হইতেই নানাবিধ লতাগুল্ম এবং ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিল। তখন সেই সব স্থলচর জীবের আবশ্যকতা হেতু তীক্ষ্ণ দন্ত এবং নখর জন্মিল। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্ম হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া জীবগণ ক্ষুধা দূর করিত। কালে বৃহৎ বৃক্ষ, এবং সেইজন্য ফলাদিও উচ্চ স্থানে জন্মিতে লাগিল। তখন জীবগণের বৃক্ষারোহণ চেষ্টা বলবতী হইল, সেই জন্যই প্রয়োজন সিদ্ধার্থ নখরের উৎপত্তি। এই জীবগণের সাধারণ নাম বানর। দর্ব্বিন ইহাদিগকে মানবের পূর্ব্বপুরুষ স্থির করিয়াছেন।

আরও তিনি বলেন যে, মৎস্য হইতে উভচর হইলেই দুইটী শাখা অবলম্বন করে। মৎস্যজাতির কতকগুলি বক্ষঃস্থলে আঘাত পাইয়া ও বুকে হাঁটিয়া দ্বীপ পার হইতে বাসনা করে. তাহারা ক্রমে বানরে পরিণত হয়, আর এক সম্প্রদায় সন্তরণের সাহায্যার্থ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ ছিল, তদ্দ্বারা উড়িয়া পার হইতে চেষ্টা করে। ইহারা ক্রমে খেচর পক্ষীকুলে পরিণত হয়, দেহের যে কোন অংশ অধিককাল কোন বিষয়ের জন্য পরিচালিত হয়, দেহের সেই অংশ তদ্রূপ আকার ও কার্য্যক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৫) সে জন্যই দুই সম্প্রদায়ের বিবিধ চেষ্টায়—দ্বিবিধ প্রাণীর উৎপত্তি।

দর্ব্বিনের মতের সারাংশ মাত্র অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বস্তুতঃ তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালের জলচর হইতে ক্রমবিকাশ বলে (Evolutioi) বানর এবং তৎপরে তাহা হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি। (১৬)

---

(১৫) Vide Rain's "Mental and moral scienee"

(১৬) (Descent of man) We thus learn that man is desce, nded from a hairy, tailed quadruped, Probably arboreal mits habits, and an inhabitant of the old world. This creature. is its whole structure had been examined by Naturalist, woulp have been classed amongst the quadrumana, as surely as the Still more ancient Progenitor of the old and new world monkeys. The quadrnmana and all the higher mammals are probably derived from an ancient marsupial animal, and this through a long live of diversified forms, from some amphidian like creature. aud this agai ufrom some fishlike aulmal. In the dim obscurity of the

দর্ব্বিনের এ কথা কতদূর বিশ্বাস্য এবং যুক্তিযুক্ত, আমরা তাহার আলোচনা করিব না, আমরা সেরূপ ক্ষমতাপন্নও নহি। এ বিচারভার পাঠকগণের প্রতি। দর্ব্বিনের মত যে সর্ব্ববাদীসম্মত, এ কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। যে সময় দর্ব্বিনের এই মত জনসমাজে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন সকলেই তাঁহাকে বাতুল মনে করিয়াছিল। এই কথা প্রচারিত হইলে তিনি যে সাধারণ্যে হাস্যাস্পদ হইবেন, তাহাও জানিতেন। (১৭) কিন্তু এক্ষণে দর্ব্বিনের মতই বহুমানে পাশ্চাত্যগণ শিরোধার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উক্তি আমরা গ্রহণ করিলাম। নতুবা নব্যশিক্ষিতাভিমানী বঙ্গবাসী পড়িবেন কেন? অন্ততঃ দর্ব্বিনের মানের খাতিরেও এ পুস্তকের একবার পাতা উল্টান তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে।

এ মহা পরিবর্ত্তনের আজিও বিরাম হয় নাই। এদিকে যেমন দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগতেরও তেমনি পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন চলিয়াছে। এ পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভবিষ্যতে আমরা আবার যে কিরূপ জীবে পরিণত হইব, তাহা এখন ভবিষ্যতের ঘনতমসাচ্ছন্ন গর্ভে নিহিত আছে।

আজিও যে পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, তাহারও প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নহে। কয়েকটী সামান্য উদাহরণ দিব। মৃত্তিকার রূপান্তরে কঙ্করের উৎপত্তি। কঙ্কর—না মৃত্তিকা না প্রস্তর। এই কঙ্করই পূর্ব্বে মৃত্তিকা ও বালুকার মিশ্রণে এখন কঙ্কর হইয়াছে, ভবিষ্যতে প্রস্তর হইবে। অনেকে কাচপোকার আরসুলা (তেলাপোকা, তিলপায়িকা) ধরা দেখিয়াছেন। ইহাতে

past we can see that the early progenitor of all the veterbrata must have beeu an aquatic animal, Provided with branchiae, with the two sexes united in the same individual, and with the most important organs of the body imperfectly or not at all developed,

(১৭) The main conclusion arrived at in this work, namely, that man is descended srem some lowly organised from, Will I regret to think, be highly distastiful to many,

Descent of man.

একটী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। কাচপোকা আরসুলাকে বাসায় লইয়া গিয়া তাহার পক্ষ ও গাত্রের উপরিস্থিত অতি সূক্ষ্ম আলোহিত বর্ণ টুকু তুলিয়া খাইয়া ফেলে। পরিবর্ত্তনের গুণে সেই পক্ষহীন গাত্রাবরণচর্ম্মহীন আর-সুলা কিছু দিনের মধ্যে সুন্দর প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যায়। অতি পূর্ব্বকালে আম্র ছিল। "চ্যুতলতার" উল্লেখই প্রাচীন পুস্তকে সমধিক। বহুকালের পরিবর্ত্তনে সেই চ্যুতলতা এখন চ্যুত মহীরুহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আফ্রিকাদেশে নিউক্রস নামে একপ্রকার জন্তু আছে। তাহাদিগের মল হইতে ৩।৪ দিনে ছোট ছোট পক্ষীর ন্যায় একপ্রকার জীব উদ্ভূত হয়। ইহাদিগের নিয়ম, সমস্ত দল একস্থানে একসময়ে মলত্যাগ করে এবং যথাক্রমে একসময়ে দলে দলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীগুলি আকাশে উড়িয়া চলিয়া যায়। ডাক্তার শ্লীমান ইহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র পক্ষীর শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমস্তই পক্ষীর সহিত অভিন্ন। উক্ত সাহেব এই পক্ষীদের নাম দিয়াছেন গলুফরোজ। খাঁটি বাঙ্গালায় ইহার নাম "গোবরে পদ্ম।"

জুলুল্যাণ্ডে একপ্রকার বৃক্ষ আছে। ত্বক্ খসাইয়া লইলে তাহার মধ্যে অবিকল প্রস্তরের ন্যায় বর্ণ ও দৃঢ় কাষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকা ও পুত্তিকার পক্ষোদ্ভেদ ক্রমবিকাশের একটী দেদীপ্যমান প্রমাণ।

কামাসক্তিতো বিভিন্ন জন্তুর পরস্পর সম্মিলনে আজি পর্য্যন্ত এদেশে যে কত অভিনব জীবের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কে নির্ণয় করে? ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গ্রেহাম কেবল এই "শঙ্করপশু প্রদর্শনী প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। (১৮)

এইরূপে আজিও কতপ্রকার জৈবিক পরিবর্ত্তন কতস্থানে সংঘটিত হইতেছে, তাহা কে অবধারণ করিতে পারে?

---

(১৮) Vide Dr. Greham's Own Experiments of Animals"

জীবতত্ত্ব।

(অবতার তত্ত্বের সামঞ্জস্যে।)

সৃষ্টিতত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধে সৃষ্টিসম্বন্ধে যে যে ব্যক্তি যে যে মত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তৎসহ আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত মতাদিরও আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে আর্য্যমুনিঋষিগণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্যগণ বাহাদুরী লইতেছেন, কত শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেই সমস্ত নানাবিধ মতাদি পাঠ করিয়া, মনোমধ্যে কি প্রকার যুক্তি উপস্থিত হয় এবং কোন যুক্তিই বা সমধিক বিশ্বাস্য বলিয়া অনুমিত হয়, তাহাই দেখা যাউক।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ যে জলময় ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং বিশ্বাস্য। এই জলপ্লাবন বিষয় অনুধাবন করিলে, কয়েকটী বস্তুর সত্ত্বাস্বত্ব আপনা হইতে মনোমধ্যে উদিত হয়। কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে ইহা জানা আবশ্যক যে, সেই স্বীকৃত বস্তুর সহিত তাহার আধারের অস্তিত্ব ও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিতে হয়। কেননা, আধার না থাকিলে, আধেয় থাকে না। সুতরাং জলের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই বাধ্য হইয়া জলের আধার মৃত্তিকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তবে জলের নিম্নে অনতিদূরে না হউক বহুদূরে মৃত্তিকা ছিল। এখন তবে পাইলাম, জল ও মৃত্তিকা। এই দুইটী স্বীকার করিলে, আর একটী কথা স্বীকার করিতে হয়, জলের উপরে আকাশ ছিল। আকাশ ছাড়িয়া দিয়া, কেবল জলময় বর্ত্তুলবৎ জগতের কল্পনাও হইতে পারে না। অতএব এটীও স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। আকাশ কি? আকাশ শূন্যময়! আকাশে আছে কি?—মেঘ। (ইংরাজ বলিবেন,—ইথর, নেবুলা ইত্যাদি) অন্যে যাহা বলে বলুক, আমরা বলি, মেঘ। সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে কি পর্জ্জন্যদেবের অত্যধিক বর্ষণে জগৎ জলময় হইয়াছিল, কি স্বভাববশে বা বিধাতার ইচ্ছায় জগৎ জলময় হইয়াছিল, সে তর্ক এখানে

নহে। কেননা, যদি জলোচ্ছ্বাসই জলপ্লাবনের হেতু হয়, তবে চন্দ্র সূর্য্যের আবশ্যক,—তাহাদিগের আকর্ষণ থাকা আবশ্যক, কিন্তু সে সময় কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অস্তিত্ব কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক আর কি পৌরাণিক কেহই স্বীকার করেন না; অতএব জলোচ্ছ্বাসই জলপ্লাবনের হেতু ইহা কেহ স্বীকার করিবে না। বরং অত্যধিক বৃষ্টিই ইহার হেতু বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। (১)

আকাশ থাকিলেই মেঘ থাকিবে। নতুবা মহাসমুদ্র সমুত্থিত বাষ্পরাশি থাকিবে কোথা? (২) মেঘ ছিল। আকাশে মেঘ থাকিবে কিসের বলে। মেঘকে সঞ্চারিত করিবে কে?—ঊর্দ্ধে উঠাইয়া মিলাইবে কে? অতএব বায়ু ছিল। পঞ্চভূতের চারিটী ছিল, ছিল না কেবল একটী। ক্ষিতি, অপ, মরুৎ ও ব্যোম এই ভূতচতুষ্টয় ছিল, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কেবল একের অভাবে সব অসম্পূর্ণ। এক তেজের অভাবে সবই সমভাব। উন্নতি নাই, বিকাশ নাই, সবই সমভাব। জল হইতে স্থল পৃথক হয় না,—জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটে না,—জলময় জগৎ ধনধান্যপরিপূর্ণ, মনুষ্যাদি জীবের কোলাহল পরিপূর্ণ সুরম্য সৌধমালালঙ্কৃত হইতে অবসর পায় না। চন্দ্রসূর্য্য তখন পৃথিবীর বহুদূরে;—অনন্তপথে থাকিয়া, অবিচ্ছিন্ন গতিতে পরিভ্রাম্যমান। ক্রমে চন্দ্রসূর্য্য সমসূত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীতে ছায়াপাত করিল। জগৎ যেন হাসিয়া উঠিল। সে সময় সেই দিব্যভাব কেহ দেখে নাই। অনন্তকালব্যাপী ঘনান্ধকারে সহসা প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মি সম্পাত কতদূর মধুময়, তাহা কল্পনা করিলেও অসীম সুখ। লোকে সামান্য দণ্ডমেয় অন্ধকার উপভোগ করিয়া, আলোকপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়,—অন্ধকারের পর গৃহমধ্যে আলোক দর্শনে মনের মধ্যে আপনা হইতেই একটু যেন আনন্দ হয়। সেই আনন্দের তুলনায় অনন্ত-*

(১) বাইবেল দেখ। তাহাতে ৪১ দিন অবিচ্ছেদ বৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাইবে।

(২) ভরসা করি, চন্দ্র সূর্য্যের উত্তাপ না থাকিলে, বাষ্প জন্মিতে পারে না। ইহা কেহ মনে করিবেন না। বাষ্প না থাকিলে, Evolntion হয় না। ক্রমে বুঝাইব।

কালব্যাপী অন্ধকারের পর আলোকদর্শন কতদূর সুখের, তাহার ইয়ত্তা কি?

চন্দ্রসূর্য্যের ছায়াপাত মাত্রেই, আবার নূতন কার্য্য আরম্ভ হইল। মাধ্যাকর্ষণবলে জল হইতে স্থলভাগ পৃথগীভূত হইতে লাগিল। বিন্দু বিন্দু কণাকণা পরিমাণে জলভাগ হইতে স্থলভাগ উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। জল থাকিলেই তাহাতে জলচর জীবের সত্ত্বা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। (৩) জলই জগৎব্যাপী। জলরাশিতে আপনা হইতেই জলচর জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাপ ব্যতীত তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই, তাহাদিগের রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে নাই।

শরীর রক্ষার্থ তাপ ও আলোক বিশেষ প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত আলোক বা তাপ না পাইলে, জীবের শরীরযন্ত্রের কোন কোন অংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। (৪) জীবজন্তু ত দূরের কথা, বৃক্ষাদির পর্য্যন্ত আলোক ভোগের স্পৃহা বলবতী দেখা যায়। (৫) প্রমাণস্বরূপ কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষ টবে রাখিয়া, উহা জানালার নিকটে রাখিবেন। অল্পদিন পরে দেখিবেন, জানালার দিকের শাখাগুলি অধিকতর সতেজ ও তাহার অগ্রভাগ জানালার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্যদিক কথঞ্চিৎ বিশুষ্ক ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

আলোক পাইয়া, সেই ক্ষুদ্র জলচর হইতে রূপান্তরিত হইয়া, মৎস্যরূপে পরিণত হইল। স্বভাব তাপ, বাসস্থান প্রভৃতির তারতম্যে সেই মৎস্যের মধ্যেই আবার আকারগত, বর্ণগত এবং স্বভাবগত নানাবিধ বৈলক্ষণ্য

(৩) এই বিষয়টী শুনিয়া, আমার এক বন্ধু একটী পরিষ্কার বোতল জলপূর্ণ করিয়া, অতি সতর্কতার সহিত ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রায় একমাস পরে দেখা গেল, তন্মধ্যে ৪০টী শ্বেতবর্ণ মশক ও দশ বারটী ক্ষুদ্র পোকা খেলা করিতেছে। ছিপি খুলিবামাত্র মশক কয়টী উড়িয়া গেল। পরীক্ষার্থ মুখ খুলিয়া বোতলটী নিয়মিত রৌদ্রে রাখিবার ব্যবস্থা করা গেল। প্রায় একমাসের মধ্যে কয়েকটী পোকা মরিয়া গেল, দুইটী প্রায় পূর্ব্বাপেক্ষা আকার দ্বিগুণ এবং বর্ণ রূপান্তরিত হইয়া, ধূসর হইতে কৃষ্ণবর্ণ হইল। অধিকদিন রাখিলে, আরও কত পরিবর্ত্তন হইত কে জানে?

(৪) Vide Tyler's "Early of mankind,"

(৫) Vide Newton's "Emession theory of light,"

ঘটিতে আরম্ভ হইল। (৬) এদিকে স্বভাবক্রমে স্থলভাগ জলভাগ হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, স্থানে স্থানে বৃক্ষ-লতা পরিশূন্য কর্দ্দমময় দ্বীপে পরিণত হইল এবং তাপ প্রভাবে কালে উহা কঠিন হইয়া, নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা, বৃক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঔষধি জন্মিতে লাগিল। (৭) এদিকে স্বভাব যন্ত্রে পেষিত হইয়া, মৎস্য হইতে পদযুক্ত জীবের আবির্ভাব হইল। জল-ভাগের মধ্যে মধ্যে বিশুষ্ক হওয়ায় তাহাদিগের দ্রুত গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল এবং বারম্বার বক্ষঃস্থলে দ্বীপের মৃত্তিকায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, কঠিন হইতে লাগিল। এদিকে মৎস্যগণের ঐ দ্বীপ অতিক্রম ও তরু-লতা ভক্ষণ করিবার বলবতী স্পৃহা জন্মিল, সুতরাং চেষ্টার ক্রটী হইল না। ইহা স্বীকার্য্য যে, শরীরের যে অংশের কার্য্য অধিক, তাহা ক্রমশঃ স্ফুর্ত্তিযুক্ত ও দৃঢ় হয় এবং অনাবশ্যকীয় অংশ আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়। ইহা প্রকৃতির একটী বিধি। বহুকালের চেষ্টায় মৎস্যদিগের আকার রূপান্তরিত হইয়াই উহা পদযুক্ত জীবে পরিণত হইল। (৮) তখন তাহারা ইচ্ছামত জলে ও স্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। (৯) যাহারা উল্লম্ফনে দ্বীপ সকল অতিক্রম করিতে বাসনা করিয়াছিল, তাহারা বহুকাল ধরিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া শেষে কতক অংশে উড়িবার ক্ষমতা পাইল এবং কালের সংঘর্ষণে পরিশেষে পক্ষীরূপে পরিণত হইল। (১০) যাঁহারা

---

(৬) সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, গভীর জলে বৃহৎ মৎস্য জন্মে, কর্দ্দমে আঁষহীন মৎস্য জন্মে, বালুকায় বেলিয়া, ভ্যাদা প্রভৃতি ক্ষুদ্র অতি ভীরু মৎস্য জন্মে। লবণাক্ত জলের মৎস্য শ্বেত ও কৃষ্ণ, স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ জলের মৎস্য লোহিত আভাযুক্ত, শৈবালয়ে জলমধ্যে শৃঙ্গযুক্ত দীর্ঘকণ্টক ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকৃতিগত পার্থক্যের ইহাই মুখ্য হেতু বলিয়া বিবেচনা হয়।

(৭) ইহার প্রমাণ ১৩শ পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৮) পৌরাণিকের কূর্ম্ম অবতারের আবির্ভাব এই সময়ে।

(৯) আজিও শৈল, সঙ্কোচ, বাঙোচ প্রভৃতি মৎস্য রাত্রিকালে স্থলে বিচরণ করে। ইহারা নদীতীরস্থ ক্ষেত্রে উঠিয়া শরিষা প্রভৃতির ফুল খায়, ইহা কৃষকদিগের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

(১০) সমুদ্রে উড্ডীনশীল পক্ষী সমুদ্রযাত্রীর নয়নে অবশ্য পতিত হইয়া থাকিবে।

কণ্টকং কণ্টকেনৈব পাদবিদ্ধং সমুদ্ধরেৎ।

উভচররূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা উদরপূর্ত্তির বহুসংখ্যক দ্রব্য ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত হইয়া জল প্রবেশ বা সন্তরণ স্থগিত করিল! ভূভাগে আহার করিয়া ভূভাগেই বৃক্ষের মূলে, কোটরে বা মৃত্তিকার গহ্বরে বসতি করিতে লাগিল। এদিকে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে তাহাদিগের দৈহিক যন্ত্রাদি ক্রমে ক্রমে জলচরোপযোগী হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভূভাগ বিচরণোপযোগী হইল। সূর্য্যোত্তাপ ও শীত রক্ষার্থ গাত্র রোমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। লতাপাতা চর্ব্বনের জন্য তদুপযোগী তিক্ষ্ণধার দন্তশ্রেণী উদ্ভূত হইল। চতুষ্পাদ বৃহৎ গর্ভ জন্তু তখন ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিল। (১১) এদিকে নৈসর্গিক আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃক্ষলতার সঞ্চার হইতে লাগিল। ভূভাগ ক্রমেই প্রসর হইতে লাগিল এবং এইরূপে স্থানপর্য্যায়ে জীবগণ সেই সেই স্থানের স্বভাব অনুরূপ সঞ্জাত ও উন্নত হইতে লাগিল। বৃক্ষের বৃহদাবয়ব হেতু তাহার ফলপুষ্পও উচ্চস্থানে জন্মিতে লাগিল। অতএব সেই সমস্ত ফল আহরণার্থ জন্তুগণের সমধিক চেষ্টা আকৃষ্ট হইল। বহুকালব্যাপী ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐ সমস্ত জন্তুদিগের অবয়বগত বৈলক্ষণ্য এরূপে সাধিত হইল, যদ্বারা বৃক্ষারোহণ তাহাদিগের পক্ষে অতি সহজ হইয়া আসিল। (১২) পূর্ব্বে ইহা-দিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, আলস্য বোধ হইলে সেই দণ্ডেই কোন নিভৃত স্থান অনুসন্ধান করিয়া সেই সময়ের মত সেই স্থানে কাটাইত। নিদ্রাভঙ্গে আর সেস্থানের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিত না, কিন্তু কালে ইহারা একে একে দুই, দুই দুই চার, এইরূপ মিলিত হইয়া এক একটি দল সৃজন করিল। ইহাতে কতকগুলি অসুবিধা একবারে দেখা গেল। প্রথম আহার। একস্থানেই সমস্ত সম্প্রদায়ের উদর পূর্ণ হয়, এমন আহার্য্য পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় শয়ন। একস্থানে সকলেই শয়ন করিতে গেলে, সকল-

---

(১১) পৌরাণিকের বরাহ অবতারে আবির্ভাব কাল।

(১২) এই অভিনব জন্তুই (বানর) দর্ব্বিনের মতে মানুষের আদি পুরুষ! যদি বানরই মনুষ্যের আদি পুরুষ হইল, তবে সর্ব্বপ্রথম মৎস্য বা তাহারও প্রথম ক্ষুদ্র কীটই বা কেন মনুষ্যের আদি পুরুষ অবিধা প্রাপ্ত হইল না, তাহা আমরা বুঝি না।

গুলির সংকুলান হয়, এমন নিভৃত স্থান পাওয়া যায় না। (১৩) তখন ইহারা (বানরেরা) এক প্রকাণ্ড গড় এবং লতাপাতা দিয়া নিরাপদ গৃহ নির্ম্মাণ করিল। নদীর তীরভূমে সুপক্ক ফল রোপণ করিয়া "সকের বাগান" প্রস্তুত করিল। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, তাহা তাহারা বুদ্ধিবলে জানিয়াছিল কি দেখিয়া শিখিয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই। তবে ইহারা বুদ্ধিবলে যে ইহা অনুসন্ধান করিতে পারে না, ততটা মূর্খ ইহারা নহে। বানুরে বুদ্ধিতেও ইহা নির্দ্ধারিত করা সহজ। বিলাতি পাক্ষিক সমালোচক বলেন, পশুরা গ্রহ-নক্ষত্রাদির পূজা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। (১৪)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্বভাবের বিধি অনুসারে অনাবশ্যকীয়ের ধ্বংস ও আবশ্যকীয়ের স্বতঃই উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বিধান বলেই বানরের দৈহিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে বৃক্ষে আরোহণ জন্য হস্তপদের দীর্ঘত্ত বৃহৎ বৃহৎ সূচীতীক্ষ্ণ নখর ছিল, এখন ফলমূল একস্থানে অনায়াসে লভ্য, সুতরাং বৃক্ষারোহণে তাদৃশ আবশ্যকতা রহিল না। সেই জন্য ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন হইল। লাঙ্গুলেরও অনাবশ্যকতা হেতু ক্রমে ক্ষুদ্র এবং সর্ব্বশেষে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। গৃহমধ্যে বাসহেতু দীর্ঘ ঘন রোমাবলীরও অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল, এবং ক্রমশঃ তাহা বিরল হইয়া আসিল। বানরমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া যে অভিনব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, তাহা আধুনিক চিপেবা ও বোরোজাতিয় মনুষ্যদিগের সহিত সামান্য মাত্র প্রভেদ ! (১৫)

পূর্ব্বে বানর জাতি অতি নিরীহ ছিল। বিশেষ কোন গুরুতর কারণ ব্যতীত বিবাদ বিসম্বাদ করিত না। সকলে পেটের দায়ে—আহারান্বেষণে বিব্রত থাকিত। এখন প্রকৃতির অগ্রহে ফলমূলের অভাব নাই। কাজেই এখন আনন্দে নৃত্য, কুন্দন, ধাবন, প্রতিধাবন, এবং পূর্ণ উদরে মনের অহঙ্কারে, দেহের বলে, সামান্য কারণে কীলোকিলি, চড়াচড়ি, লাঠালাঠি

(১৩) পাঠক ! স্মরণ রাখিবেন, কৃষি, সমাজনীতি, সকলের এই সূত্র ! জীবের "স্বাবলম্বনেরও" এই সূত্রপাত। Vide Bain's "Socialty of snimals"

(১৪) Vide Fortnightly Review 1869.

(১৫) এই সময়ে বামন অবতারের আবির্ভাব।

আরম্ভ করিল। এই হইতে দৈহিক উন্নতির সূত্রপাত হইয়া, ক্রমে দীর্ঘাবয়ব এবং বলিষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। (১৬) এই হইতেই কাল-প্রভাবে বিচক্ষণ মানবের সৃষ্টি হইয়া, কালসহকারে ধরণী পূর্ণ হইল। এ দিকের ইতিহাস বিস্তৃত, তাহা সময়ান্তরে বিবৃত হইবে। সে ইতিহাসের বিবরণ আমাদিগের পুরাণে। পুরাণজ্ঞগণ যদি তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ সকল তত্ত্ব তাঁহার আয়ত্ত, তবে আর এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মৎস্যাদি জলচর সুসভ্য মনুষ্যে পরিগণিত হইতে কতদিন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা ধারণায় আনিবার ক্ষমতা নাই। অঙ্কশাস্ত্রেরও তাদৃশ গভীরতা নাই, তাহা গণনা বিদ্যার অতীত। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, সামান্য দিনে হয় নাই এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, সে সময় যেরূপ পরিবর্ত্তন যতদিনে হইয়াছিল, এখন সেই পরিবর্ত্তন হইলে, তদপেক্ষা অধিক সময় লাগিত। কেননা, তখন জরা ছিল না, নিত্য নূতন রোগের নামকরণ করিবার কেহ ছিল না, আয়ুর্ব্বেদ, মেটরিয়ামেডিকা, এনাটমি, তখন এসব কিছুই ছিল না। মৃত্যুসংখ্যাও কম ছিল। প্রাণী যত, তদপেক্ষা স্থান অধিক ছিল। দুষ্ট বায়ুর নষ্টামি তখন চলিত না, জীব তখন দীর্ঘজীবি ছিল। অতি প্রাচীন-কালে, সত্যযুগাদিতে যে ইচ্ছামৃত্যুর কথা দেখা যায়, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, তৎকালে পীড়াদির নামমাত্র ছিল না বলিয়া, তাহার প্রমাণ স্বরূপ স্বগর্ব্ব উক্তি, ইচ্ছামৃত্যু। (১৭) কালে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইল, যেমন পৃথিবী প্রাণীপূর্ণ হইল, অমনি রোগ দেখা দিল। শরীর যাহার যত দৃঢ়, সে রোগের আঘাত তত সহ্য করিতে পারিবে। শরীর দৃঢ় থাকিলে—সামর্থ থাকিলে, রোগে বড় একটা কিছু করিতে পারে না। তাই ত্রেতাযুগে নিয়ম

(১৬) এই সময়ের অবতার পরশুরাম। পরশুরাম চরিত্র স্থানান্তরে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

(১৭) See the ever memorable Essay "On the principle of population" by the Rev, Malthus, vol I. p 63 17, He says, "Civilised populations have been known under favourable conditions, as in the Unitedstates to double their numbers iu twenty five years,

ছিল, মজ্জাগত প্রাণ, পরে আরও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। জরামৃত্যু ত দূরের কথা, আহার না পাইয়াই হয় ত মরিতে হইবে, তাই নিয়ম ছিল, অন্নগত প্রাণ। আর এখন!—দ্বিসহস্র ঊননবতি সংখ্যক ব্যাধি সবলে মনুষ্যকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। বৎসরে তিনবার দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, অনাবৃষ্টি, অতি রৌদ্র, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যের জীবনধারোনোপায় ধান্যাদির উপর আড়ে হাত লাগিয়াছে, এখন কি আর কোন বাঁধাবাঁধি চলে? যেমন দেহ হউক, যেমন সজ্জা হউক, শতবৎসরের মধ্যে রোগের আকর্ষণে তাহাকে আকৃষ্ট হইতে হইবে। শত বৎসরের মধ্যে তাহার জীবন-প্রদীপ নিবিবেই নিবিবে। তাই এখন একটা নিয়ম পুঁথি পত্রে দেখি, কলিতে প্রাণীর আয়ু একশত বিশ বৎসর। আবার হালে একটা কথা উঠিয়াছে, পিতার পরমায়ু পুত্রে পায় না। এখন প্রায়ই দেখি, শতকরা অকালমৃত্যুর সংখ্যা সত্তর জন। এই অকালমৃত্যুর গড় বয়স পঁয়ত্রিশ। ইহাদিগের সন্তানগণ যদি পিতার বয়স না পাইল, তাহা হইলে, ইহাও নিশ্চয় যে, অতি সামান্য দিনের মধ্যেই পৃথিবী বিশেষতঃ বঙ্গদেশ মনুষ্যশূন্য হইবে।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কতকগুলি আঘাত সহ্য করিয়া,—ক্রমবিকাশের আবর্ত্তনে কি প্রকারে আবর্ত্তিত হইয়া, জীব মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে যে যে বিষয় বিবৃত হইল, তাহা সাধারণের বিশ্বাস্য কি না, সে বিচার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। অন্ততঃ আমরা সৃষ্টি ও জীবতত্ত্ব আলোচনায় যেটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই যথাযথ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে এই যুক্তির সহিত পৌরাণিক জীবসৃষ্টির কতদূর ঐক্যতা আছে, তাহাই একবার আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

সচরাচর সকলেই জ্ঞাত আছেন,—অশীতিলক্ষ যোনী ভ্রমণ না করিলে, সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করা যায় না। এই কথাটী একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, ইহাও ক্রমবিকাশ ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের একটী প্রধান সূত্র। এই অশীতিলক্ষ যোনী ভ্রমণের আবার যে যে সময়ে যে যে যোনীর উল্লেখ আছে, তাহা আরও চমৎকার। সেই সংখ্যা ক্রমে পূর্ব্ববর্ণিত কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশুপক্ষী প্রভৃতি

ক্রমোন্নত যোনী ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উন্নতি এবং সর্ব্বশেষে সুদুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ স্বতঃসিদ্ধ।

এক একটী জীবনের আয়ু হিসাব করিয়া, যদি অশীতি লক্ষ যোনীর পরিমাণ স্থির করা যায়, তাহা হইলেও কতকাল ধরিয়া এই সৃষ্টিকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা যায় না।

পৌরাণিকের দশ অবতারের আবির্ভাবকাল ও তৎসাময়িক ঘটনাবলী আলোচনা করিলেও, আমাদের পূর্ব্বোক্ত মত দৃঢ় হইতে পারে। তৎসহ পৌরাণিকগণেরও তৃপ্তি সম্পাদিত ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া, অনুমিত হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের সহিত অবতার তত্ত্বের সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহাই দেখা যাউক।

হিন্দুর প্রথম অবতার মৎস্য। এই মৎস্য অবতারের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশের পূর্ব্বে একটী কথা উত্থাপিত হইতে পারে যে, ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য কি? ভরসা করি, ইহার উত্তর হিন্দুর অজ্ঞাত নাই। সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃত ও দুক্রিয়ার বিনাশ ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ প্রধানতঃ এই কার্য্যত্রয়ের সাধনোদ্দেশে ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করেন। (১০) এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সর্ব্বপ্রথমে ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া, উক্ত কার্য্যত্রয় নির্ব্বাহ করিতে আবির্ভূত হইলেন। ইহা কি সঙ্গত? সাধু মনুষ্যের পরিত্রাণ দুক্রিয়াসক্ত মনুষ্যের দণ্ড ও ধর্ম্মরক্ষার্থ একটী মৎস্যের আবির্ভাব, কে ইহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিবেন? মৎস্যের ভাষা কি, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ব কি না, এ সকল বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, মৎস্যরূপী ভগবানের আবির্ভাব হয় কল্পনামাত্র, বা তাহার অভ্যন্তরে কোন গুহ্যরহস্য প্রচ্ছন্ন আছে।

এখন সে রহস্যটী কি? তাহার উত্তর, জীব কালবশে যখন যে যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিশ্লেষণে এবং সংযোজনে আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়া, জীব যখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তৎকালিক জীবগণের ও তাহাদিগের অসাধারণ আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ভগবান অবিকল সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত

(১৮) ভগবদুক্তি যথা,—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

কার্য্যত্রয় সংসাধন করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, অনেকটা বুঝিতে পারা গেল। জানা গেল, অবতারতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিকাশ ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

জীব যখন যে অবস্থায় উপনীত হয়, ভগবান তখন তদনুরূপ অবয়বই ধারণ করেন। জগৎ জলময় ছিল, জলচর মৎস্য ভিন্ন অন্য কোন জীবন্ত প্রাণীর সত্বা সংসারের কোনস্থানে বর্ত্তমান ছিল না, ভগবানের প্রথম অবতার তখন মৎস্য। তৎপরে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইয়া, মৎস্য হইতে তখন পদবিশিষ্ট শীততাপ সহিষ্ণু কঠিনগাত্র জীব ধরাতলে দর্শন দিল, ভগবানের দ্বিতীয় অবতার তখন কূর্ম্ম। কালের অসামান্য পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইয়া, কত সহস্র সহস্র যোনী পরিভ্রমণ করতঃ উন্নতি হইয়া, জীব যখন অরণ্যচারী লতাগুল্মভোজী দীর্ঘ তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত রোমশ জীবে পরিণত হইল, ভগবানের তৃতীয় অবতার তখন বরাহ। তৎপরে আবার সেই মহাপরিবর্ত্তন চলিল। কতকাল কাটিয়া গেল, কত যুগযুগান্তর অতীত হইল, পশুজন্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহ জন্ম,—মনুষ্যের পূর্ব্বকাল, সেই সংঘাত স্থানের অবতার নৃসিংহ। জীবের উন্নতি অতি দ্রুত চলিয়াছে, নরসিংহ অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ সিংহ। এদিকে পশুরাজ সিংহ বুদ্ধিবৃত্তি সকলই মনুষ্য তুল্য আকৃতি গতি বৈলক্ষণ্য ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইয়া, অর্দ্ধাংশ নরাকার অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, সেই উভয়ের মধ্যবর্ত্তিকালের অবতার নৃসিংহ। তৎপরে ক্রমে মানবে পরিণত হইলে, তখন ভগবানের পঞ্চমাবতার বামন। ক্রমে নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রাবয়ব মানব বলবান হইল, কিন্তু অসভ্যতা ঘুচিল না। সমাজ হইল, আসঙ্গলিপ্সা জন্মিল, কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—সর্ব্ববিষয়ে পুষ্ট হইল না। সেই বনে বাস, অনায়াসলব্ধ বন্যপশু ও বন্য ফলমূল আহার,—সেই অসভ্য যুগে ভগবানের ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ক্রমে সমাজের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। আসঙ্গলিপ্সা বলবতী হইল, সমাজের সৃষ্টি—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামাজিক বন্ধন সকল দ্বারা মানবগণ বন্দী হইতে লাগিলেন, নৈতিক উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ধরায় এতদিনে শান্তি দেখা দিল। সকলের প্রাধান্যে অসুবিধা বুঝিয়া, একজনের হস্তে সকলের রক্ষাভার নিয়োজিত হইল, রাজাপ্রজা সম্বন্ধের মূলভিত্তি দৃঢ় হইল, তখন ভগবানের সপ্তম অবতার সৌম্যমূর্ত্তি রাম।

এখন বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইল। অন্ধভক্তি দূর করিয়া, যুক্তি সংশ্লিষ্ট ভক্তিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইল। হৃদয়ের বিশ্বাস টলিয়া, তথায় যুক্তি ও প্রমাণ-লব্ধ বিষয়ের আধিপত্য বৃদ্ধি হইল, তখন অবতার হইলেন **বলরাম।** এদিকে বিজ্ঞানের চর্চা, অন্যদিকে কৃষির উন্নতি। এতদিন সামান্য পরিশ্রমে প্রভূত ধনধান্য লাভ হইত, ভারত তখন ভারত সন্তানের নিকটে রত্ন প্রসবিনী ছিলেন। কাননে কাননে সন্তানগণের আহার্য্য ফলমূল থরে থরে সজ্জিত থাকিত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, তখন জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত না, সকলেই সানন্দে সুস্থশরীরে কালাতিপাত করিত। ভারত সন্তানের জন্য জননী বসুমতী তখন মুক্তহস্তা ছিলেন। "অভাব" শব্দাদি তখন অভিধানে স্থান পায় না। বলরামের আবির্ভাবকালে ধরা জীবভারে পীড়িতা হইয়া আসিল। বনের ফল ফুরাইল, বৃক্ষের স্বাভাবিক মূল ফুরাইল, চারিদিকে "অভাব অভাব" বলিয়া চীৎকার উঠিল। এ অভাব যায় কিসে? জীবের প্রাণ থাকে কিসে? তাই ভগবানের অবতার বলরাম বিধিমত প্রকারে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিলেন। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, ধরণী সেই রত্নপ্রসবিনীই আছেন, বসুন্ধরা সন্তানগণের প্রতি পূর্ব্ববৎ সদয়ই আছেন, খনন করিয়া সংগ্রহ কর। চেষ্টাকে দৃঢ় করিয়া শ্রম কর, আবার সকলই হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে বলরাম হইতেই কৃষিযুগের সূত্রপাত।

তর্কযুক্তিরই প্রাবল্য হইল। লোকে কোন কথাই যুক্তি ভিন্ন বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। বিনা তর্কে কোন কথা কেহ স্বীকার করে না। সকলেই তার্কিক, ঘোরতর তর্কবাগীশ। আবালবৃদ্ধবনিতা তর্ক লইয়া বিব্রত। ঐহিক, পারত্রিক, পারলৌকিক এসব বিষয় ত আছেই, তদ্ভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়েরও অসার তর্কে ধরণী টলটলায়মান। কেহ বুঝাইবার নাই, কেহ নিবারণ করিবার নাই, কেহ পরাভূত করিবার নাই। চারিদিকেই হাহাকার, চারিদিকেই আস্ফালন,—"তর্কং দেহি!—তর্কং দেহি!"

এই মহাতর্কের নিবারণার্থ, উৎকৃষ্ট যুক্তি দ্বারা লোকের সেই মহাতর্কের উচ্ছ্বাস প্রশমিত করিবার জন্য ভগবানের নবম অবতার বুদ্ধ।

আর যখন ধরণী ঘোর নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ হইবে, নিবারণ করিবার কেহ থাকিবে না, যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে, এমন কেহ থাকিবে না, তখন সেই ঘোর অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিবার

জন্ম সে পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতং। ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় ভগবানের দশম অবতার হইবে কল্কি। সে কাল এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। কতদিন পরে কোন্ যুগে যে কল্কিদেবের আবির্ভাব হইবে, তাহা ভাবিবার এ সময় নহে। তবে বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচারগত, আহারগত এবং পরিচ্ছদগত যেরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, জাতীয়তা বন্ধন যেরূপ দিন দিন শিথিল হইতেছে, তাহাতে কল্কির আবির্ভাব অধিকদূর নহে। (১৯)

পাঠকগণ দেখিলেন, পৌরাণিকের অবতারতত্ত্বের মূলেও প্রচ্ছন্নভাবে এই জীবতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণেরা যে তত্ত্ব নিরূপণে বহুকাল ব্যয় করিয়াছেন, বহুকষ্টে সুদীর্ঘকালের অক্লান্ত শ্রমে যে তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, আমাদিগের আর্য্যঋষিগণ কেমন কৌশলে কতস্থানে কত প্রকারে তাহা বিন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিতাম, কেবল স্থানাভাবে ও অনাবশ্যকতা হেতু বিরত রহিলাম। ভরসা করি, পাঠকগণ ইহাই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

---

(১৯) যদ্‌যদ্ভাব গতো জীবস্তত্তদ্ভাব গতো হরিঃ।
অবতীর্ণ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তিব জনৈমহঃ॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবো হি কচ্ছপে কূর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ড যুক্তে জীবে বরাহ ভগবান হরিঃ
নৃসিংহ মধ্যভাবোহি বামন ক্ষুদ্র মানবে।
ভার্গবো হলভ্যবর্গেষু সভ্যো দাশরথীস্তথা॥
লাঙ্গলী কৃষিযুগে চ * * *।
তর্ক নিষ্ঠনরে বুদ্ধ নাস্তিকে কল্কিরেব চ॥

সংসার-তত্ত্ব।

প্রথম প্রবন্ধ।

বিবাহ।

যখন আমরা এই অনন্তবিস্তীর্ণ যাদঃসমাকীর্ণ সংসারসমুদ্রে ভাসমান হইয়া অত্যুচ্চ বিচিমালা দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকি—যখন পরস্পর বিরোধী চিন্তাবান্ যুগপৎ সমুদ্ভুত হইয়া আমাদিগের সিরিশকুসুম-কোমল হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে,—সংসারের প্রখর তাড়নে বিতাড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণিক শান্তির জন্য প্রাণ যখন ত্রাহি ত্রাহি করে,—হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় শোকবহ্নি যখন হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রধুমিত ও পরিশেষে প্রজ্জলিত হইয়া হৃদয়কন্দর শ্মশানদৃশ্যে সমানীত করে,—তখন কোন্ আলোকিক শক্তি—আমাদিগের সেই সেই যন্ত্রণার অবসান করে ? কোন্ শান্তি-স্রোতস্বতীর অমৃতধারা আমাদিগের শোকতপ্ত হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া শ্মশানে কুঞ্জবাটিকা নির্ম্মাণ করে ? কোন্ অমানুষী দিব্যজ্যোতি আমা-দিগের বিষাদ অমাবস্যার অমাসমাচ্ছন্ন অন্তরাকাশকে শারদীয় পূর্ণিমার পূর্ণকলায় জ্যোতির্ম্ময় করে ? বিধাতার কোন্‌শক্তি বলে জীব শোকে ক্লীষ্ট হয় না,—বিষাদে বিশীর্ণ হয় না, ভীষণ যন্ত্রণায় জীবনত্যাগ করে না ?

বিধাতার সেই আলোকিক দিব্য শান্তির কেন্দ্রিভূতা—মায়া! সংসারকে মায়াশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত রাখিয়াছে,—মনুষ্যকে সংসারব্রতে ব্রতি করিতেছে, বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে, কেবল একমাত্র রমণী। যিনি পুরুষের তুচ্ছ উপভোগের জন্যই রমণীর সৃষ্টি বলিয়া রমণীর অবমাননা করেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। যাঁহারা স্ত্রী কেবল ঐশ্বরিক চিন্তা বা মুক্তিপথের

কণ্টকতরু বিবেচনায় চিরকৌমার্য্যব্রত ধারণে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহারা ততোধিক ভ্রান্ত। আর যে সমস্ত ব্যক্তি একবার সংহার-প্রেমের আস্বাদন কণামাত্রও উপভোগ করিয়া, স্ত্রীপুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়াও তাহাদিগকে অকুলে ভাসাইয়া পরিণত বয়সে মনের উদাসে তীর্থযাত্রা বা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় মহাভ্রান্ত ভ্রমান্ধজীব এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। (১)

সংসারক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রী পরস্পরের অবলম্বন। বিধাতার ইচ্ছাও তাহাই স্বামীস্ত্রী উভয়ে উভয়ের অবলম্বন হইয়া নির্ব্বিবাদে সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন,—সাংসারিক বিমলানন্দ উপভোগ করিবেন,—পুত্র কন্যা জ্ঞাতি স্বজনের সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে সুখের পথ প্রশস্ত করিবেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সময়ানুসারে পুত্রকন্যা সমুৎপাদন করতঃ ধরায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবেন ইহাই বিধাতার ইচ্ছা। এক পক্ষে বিধতার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এবং সামাজিক উন্নতির সুবিধানার্থ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানবমাত্রেরই আবশ্যক।

বিবাহের অন্যতম আবশ্যকতা, দৈহিক উন্নতির জন্য। অপরিণত বয়সে বিবাহও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়পরিচালন যেমন দৈহিক উন্নতির একমাত্র অন্তরায়, পুষ্ট ও পরিণত বৃত্তির প্রতিরোধও তাদৃশ অহিতকর। কেন না সমধিক সম্বর্দ্ধিত বৃর্ত্তির সাময়িক সংযমন বা আজন্ম দমন হেতু সেই বর্দ্ধিত ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম থাকিয়াও যথেষ্ট কার্য্যভাবে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং তাহার সহিত অন্যান্য বৃত্তির যে সম্বন্ধ, ইহার অন্তর্দ্ধান হেতু সেই সকল মনোবৃত্তি ও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্ষতি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে পরিণত বয়সে ইন্দ্রিয়সেবা দোষাবহ না হইয়া বরং দৈহিক উন্নতির পথই সুগম করে। ইহাও বিবাহের আবশ্যকতার একটি প্রধানতম কারণ।

(১) যদি কেহ মনে করেন,—পাশ্চাত্যশিক্ষায় বিকৃতমস্তক গ্রন্থকার নারী পূজা প্রভৃতি প্রবর্ত্তক কোনং মতাবলম্বী, সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে স্ত্রীজাতির প্রতি পাত্র ও সম্বন্ধ বিশেষে যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন আমাদিগের হিন্দুমাত্রেরই বিশিষ্ট বিধি। অন্ততঃ সে বিধি অশ্রদ্ধের হইলেও সমাজের প্রতি দৃষ্টীপাত করিলেই সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন।

কতদিন হইতে হিন্দু সমাজে বৈবাহিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, বৈবাহিক প্রথা চিরপ্রচলিত প্রথা নহে। পূর্ব্বকালে স্বামীস্ত্রীর বন্ধন না থাকাই বরং অধিকতর বিশ্বাস্য। পুরাকালে পুরুষ ও স্ত্রী মনোনিত হইলেই কামপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিত এবং পরক্ষণেই তাহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিত না। রমণী গর্ভবতী হইলেই নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া গর্ভিনীর আহারাদির সংস্থান করিয়া দিত এবং সাময়িক শুশ্রূষা করিত। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিকটেই অবস্থান করিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিত। বৃদ্ধ মাতার সেবা শুশ্রূষার ভার পুত্রের উপর থাকিলেও সকল স্থানে সন্তান সে নিয়ম প্রতিপালন করিত না। বিবাহ বন্ধনই সমাজের মূল, সুতরাং বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সামাজিক বন্ধন ছিল না, অথবা থাকিলেও তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ভগবান শ্বেতকেতু বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তনের নেতা। তৎসম্বন্ধে যে প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সমাজসৃষ্টির কালাবধারণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

একদা ভগবান শ্বেতকেতু মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করতঃ মাতৃমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময় তথায় এক তপস্বী সমাগত হইয়া শ্বেতকেতুর মাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তোমার অলৌকিক লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় দিব্যলাবণ্যসম্পন্না যুবতী একান্ত দুর্ল্লভ। আমার প্রার্থনা, তুমি প্রসন্না হও। লাবণ্যময়ি! বারেক মাত্র আমাকে ভজনা কর।" লাবণ্যময়ী পরম ধার্ম্মিকা, তিনি এই উগ্রতপা তপস্বীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতিজ্ঞাপক ইঙ্গিতে তপস্বীকে আশান্বিত করিয়া পুত্রকে কহিলেন, "বৎস! কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর। আমি সত্বরই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।" শ্বেতকেতু তৎকালে সে গমনে বাধা দিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায় অবলম্বিত হইলে এই মহদনিষ্টকর প্রথা সমূলে নির্ম্মূল করা যাইতে পারে। তিনি ক্রোধবশে আরও প্রতিজ্ঞা

করিলেন, "আমি যেরূপে পারি, এই পশ্বাচারের প্রতিবিধান করিবই করিব।" এই হইতেই সমাজ এবং বৈবাহিক প্রথার সৃষ্টি।

বৈবাহিক প্রথা সৃষ্ট হইলেও তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। এমন কি আজিও ইহার বিধি বিশেষ পরিশোধন যোগ্য রহিয়া গিয়াছে। মন্বাদি ঋষিগণের সমকালেও বিবাহ প্রথার তাদৃক সংস্করণ হয় নাই। ইহার প্রমাণ মনুসংগৃহীত সংহিতা। তখনও একপ্রকার নিয়মে বিবাহ হইত না, এই জন্যই মনুসংহিতায় অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (২) ক্রমে এই অনিষ্টকর প্রথার অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৈবাহিক প্রণালী এখন অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজবর্গ যখন প্রভূত বলশালী ছিলেন, তখন আসুর পদ্ধতি বিধিমত প্রকারে অনুসৃত হইত। নির্জ্জিত রাজার কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া তাঁহার পাণীগ্রহণ করাই ক্ষত্রিয় বীরগণ সমধিক শ্লাঘা ও বীরত্বের নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই জন্যই তৎকালে আসুর পদ্ধতি অনুসারে অনেকস্থলে বিবাহ প্রথা অনুসৃত হইত। পুরাকালের রাজকুমার ও রাজকুমারীরা প্রায়ই গান্ধর্ব্ব প্রথানুসারে বিবাহ করিতেন। প্রাচীন কাব্যাদিতে ইহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্ম বিবাহ পূর্ব্বে আর্য্যঋষীগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। পৈশাচিকাদি বিবাহ নিরক্ষর পার্ব্বতীয়গণের মধ্যে অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়।

পরন্তু বিবাহের আবশ্যকতা না বুঝেন, এমন লোক অতি বিরল। বিবাহে প্রবৃত্তি নাই, এমন ব্যক্তিও নিতান্ত দুর্লভ। কি তুষতণ্ডুলজ্ঞ সুদীর্ঘ শিখাধারী মুণ্ডিতকেশ চতুষ্পাঠীর ছাত্র, কামিজকোটাবৃতাঙ্গ কুঞ্চিতকেশ ভারতোদ্ধারব্রতধারী কালেজের ছাত্র; কি দিনপ্রাত অচল মুষ্টীমেয় তণ্ডুল-ভিখারী ভিক্ষুক—কি নাসাকর্ণহীন পরমুখাপেক্ষী পরবিত্তভোজী জড়পিণ্ড সকলেই বিবাহ নামের উপাসক। বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ ও পণ সম্বন্ধে যে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কত কত হতভাগ্য কন্যার বিবাহ দিয়া পথের ভিখরী হইতেছেন। সে সকল কথার এ স্থান নহে।

যৌবন কালই বিবাহের উপযুক্ত। ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির অনুমোদিত বালকবালিকা যৌবন-সীমায় উপনীত হইলে পিতামাতার কর্ত্তব্য,

(১) ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ ইত্যাদি।

তাহাদিগকে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রির সহিত বিবাহ দেওয়া। অদ্যাবধি আমাদিগের সমাজে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিলে, গৌরী দানের ফল লাভ হয়, নবমবর্ষীয়া কন্যা পাত্রস্থ করিলে, রোহিণী দানের ফল লাভ হয়, ইত্যাকার বাল্যবিবাহ প্রতিপাদক কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। যে সময় এ বিধি প্রচলিত হয়, সে সময় মুসলমান নবাবগণ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অত্যাচারে সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতীকন্যাকে নিরাপদে রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বিপদের কথঞ্চিৎ প্রতিবিধানের জন্য পিতা কন্যার বিবাহ দিয়া, কিয়দংশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার স্বামীর প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। ধর্ম্মে পতিত হইবারও কোন আশঙ্কা থাকিত না। কেননা, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা কন্যা কুলত্যাগিনী হইলে, কন্যার পিতা তজ্জন্য পতিত হয়েন না।

পূর্ব্বকালে কন্যা বা পুত্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে বিবাহ হইত না, ইহার শত শত প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যৌবনই বিবাহের প্রশস্ত সময়।

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য, সন্তান উৎপাদন। সর্ব্বজন পরিচিত "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" প্রভৃতি বচনে তাহা স্পষ্টিকৃত হইয়াছে। যখন সন্তান উৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য হইল, তখন সেই উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ যখন স্বামী স্ত্রীর সন্তান উৎপাদন ও গর্ভধারণের ক্ষমতা জন্মে, সেই সময়ে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

অনেক পিতামাতা বালকবালিকার বিবাহ দিয়া, পুত্র কন্যার দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির পথে কণ্টক অর্পণ করেন। বালকের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে অসাময়িক ইন্দ্রিয়পরিচালনে নিজের দেহ নষ্ট ও সংসারে মৃত্যুরসংখ্যা বৃদ্ধি করে। আবার কন্যারও অসাময়িক অভিগমন হেতু, তাহার অপরিপুষ্ট দেহ ক্লিষ্ট হইয়া, দৈহিক সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করে এবং অসাময়িক গর্ভধারণ হেতু,—কেবল শোকতাপে দগ্ধ ও জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, সমস্ত জীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত করে। মনের স্ফুর্ত্তি থাকে না, দেহের লাবণ্য থাকে না, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না। বালিকা বয়সেই বৃদ্ধা হইয়া,—কুড়ি বয়সে বুড়ী সাজিয়া, বালকস্বামীর সহিত সংসার-বাজারে জীবহত্যার ব্যবসা আরম্ভ করে।

পরিহাসং গুরুস্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

অসাময়িক গর্ব্ভে, অপরিপুষ্ট বীর্য্যে সন্তান জন্মিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও হয় ভূমিষ্ঠমাত্রেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় অথবা কয়েকদিন রোগের ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, অকালে যমদ্বারে উপনীত হইয়া থাকে।

পাঠকগণের অনেকেই বিদ্যালয়গামী সংসারানভিজ্ঞ অজাতশত্রু বালকের পার্শ্বে একাদশ বর্ষীয়া যুবতী দেখিয়া থাকিবেন। আবার একাদশ বর্ষীয়া বালিকার ক্রোড়ে হয় ত মৃত্যুর কালিমাব্যাপ্ত রোগগ্রস্থ শিশুও দেখিয়া থাকিবেন। হয় ত পাঠকগণের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্টও হইতে পারেন। এ সকল ব্যাপার দর্শন করিলেই মনোমধ্যে দুঃখের সঞ্চার হয়। মনে হয়, এই জন্যই ভারতে এত দুর্ভিক্ষ, এত দারিদ্র্য, এত মৃত্যুসংখ্যা এবং এতাধিক দৌর্ব্বল্য।

বাল্যবিবাহের আর একটী বিষময় ফল এইস্থলে বিবৃত না করিয়া, থাকা যায় না। বালক যুবাবয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে, তাহার গৃহ পুত্র কন্যায় পরিপূর্ণ হইল। জীবিত থাকুক বা না থাকুক, স্ত্রী সেই অসাময়িক গর্ভধারণ হেতু বয়ঃপ্রাপ্তা হইতে না হইতেই বৃদ্ধা হইলেন। যুবকের শরীর দুর্ব্বল, অপরিণত, তথাপি মনে তাহার ভোগলালসা অদ্যাপি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। যৌবনের ভোগলালসা মনোমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া সুখের ছবি দেখাইতেছে, যুবকের গৃহে সে সুখ কোথায়? রুগ্না স্ত্রী সর্ব্বদাই অসুস্থা। তাহার আহারে রুচি নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, স্বামীসম্ভাষণে বা ভোগ বিলাসে ইচ্ছা নাই। পুত্র কন্যার লালনপালন,—নিজের শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা আর মৃতসন্তানের জন্য শোক প্রকাশ করিতেই সময় কাটিয়া যায়। তিনি স্বামীসম্ভাষণ করিবেন কখন? হাস্য পরিহাসে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? যৌবনকালের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্ফূর্ত্তি তাহার দেহে বা মনে নাই। তিনি যৌবনের সেই তরঙ্গ সদা সহাস্যভাব, বিলাসবাসনা কোথায় পাইবেন? স্বামীর পরিতৃপ্তির উপাদান তাঁহার নাই। তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত, শোকসন্তপ্ত। স্বামী তখন অন্য উপায় দেখিলেন। হয় বারাঙ্গনা গৃহে আপন পাপবাসনা চরিতার্থ করিতে নিজের সর্ব্বনাশ করিলেন, অথবা অন্য কোন অকথ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া, নিজের বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য,—নিজের কলুষিত পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার

জন্য তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলেন। আজ কাল অধিকাংশ গৃহেই এইরূপ ব্যাপার পরিদৃষ্ট হইতেছে। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব হইবে না।

বাল্যবিবাহের যেমন বিষময় ফল, অসাময়িক বিবাহও তদ্রূপ অহিতকর। বর্ত্তমান সময়ে অসাময়িক বিবাহ ও বহুবিবাহ অনেকাংশে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তথাপি আজিও এই অহিতকর বিধি হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। পিতামাতাকে উচ্চ পণ গ্রহণ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধের হস্তে বালিকাকন্যা সমর্পণ করিতে আজিও আমরা দেখিতেছি। ইহার বিষময় ফলও আমরা দিব্য ভোগ করিতেছি। পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার কর্ত্তৃত্বভার পিতামাতার প্রতিই নির্ভর করে, সুতরাং তাহারা স্ব স্ব পুত্র-কন্যাগণকে যেরূপ পাত্র বা পাত্রির সহিত বিবাহ দিবেন, তাহারা অবনত মস্তকে তাহাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য। স্বেচ্ছানুসারে স্বামী স্ত্রী মনোনীত করিবার ক্ষমতা হিন্দুবালকবালিকার নাই। আবার তাহারা যে বয়সে পরিণত হয়, স্বামী স্ত্রী নির্ব্বাচনে যেটুকু বুদ্ধির আবশ্যক, তাহাদিগের বয়সে সে বুদ্ধি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই অর্থলোলুপ পিতামাতা অর্থের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব কন্যাকে জন্মের মত অকূলে ভাসাইয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অসাময়িক বিবাহের বিষময় ফল দর্শন করিয়াও—বিশেষ প্রকারে ফলভোগ করিয়াও হিন্দু পিতামাতা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন না।

আমরা একদা এক নবপরিণিত বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি এ বয়সে কি জন্য বিবাহ করিলেন?" তদুত্তরে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "সেবাশুশ্রূষার জন্য। আমার উৎকট কাশীর পীড়া, সর্ব্বদাই অসুখ কেহ দেখিবার নাই, তাই বিবাহ করিলাম। সময়ে শুশ্রূষা করিবে, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবে, মৃত্যু হইলে ভদ্রাসনে প্রদীপ দিবে।" বৃদ্ধের উত্তরে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। সেই সময় মনে হইয়াছিল, বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তাহার ভদ্রাসনে বিধবাযুবতী অবশ্যই কোন না কোন প্রকার "প্রদীপ" নিশ্চয়ই দিবে।

বৃদ্ধ অশীতিপর অহিফেনের মাত্রা চড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া হুঁকা হস্তে ঝিমাইতেছেন, বাতরোগে হস্তপদাদিতে মাংসাধিক্য হইয়াছে। লাবণ্য-

বয়ী যুবতীপত্নি পদতলে বসিয়া স্বামীর পদসেবা করিতেছে। নির্ব্বাপিত কলিকায় ঘন ঘন অগ্নিসংযোগ করিয়া দিতেছে। অহিফেনসেবী স্বামীর সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই, পত্নিও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বামীসেবায় কাটাইলেন। বঙ্গরমণীর আর কিছু থাকুক না থাকুক, স্বামীভক্তি ও সতীত্ব রক্ষায় তাঁহারা জগতের শীর্ষস্থানীয়া। হিন্দুরমণী ভিন্ন এ ব্রত পালন করিতে পারেন, যৌবনসুলভ বিলাসলালসা—তৃণতাচ্ছিল্যে তুচ্ছ করত যৌবনে যোগিনী সাজিয়া বৃদ্ধ স্বামীর চরণারবিন্দ সার করেন, পতিসেবায় জীবন অতিবাহিত করেন, এতদূর ধৈর্য্যগুণ আর কোন জাতীয় রমণীর নাই। ইংরাজ, তুরকী, ফরাসী, জর্ম্মানি, জগতের যে কোন জাতীয়া যুবতী এরূপ জরাগ্রস্ত স্বামীর সেবা দূরে থাকুক, কোন কালে কুলের ধ্বজা উড়াইয়া স্বামীকে স্বামীর সত্ব হইতে ইস্তফা করিতেন। অন্যান্য দেশে শাক মাছের দরে হাটেবাজারে স্বামী বিক্রয় হয়। হিন্দুরমণীর স্বামী ঈশ্বর হইতেও উচ্চ।—রমণীর স্বামীই একমাত্র গতি। স্বামী সেবাই মুক্তি-লাভের সেতু।

অযৌক্তিক বিবাহ হিন্দুসমাজে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। মুসলমান-দিগের মধ্যেই ইহার ভূরী প্রচলন। বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে পাত্র অপেক্ষা কন্যার বয়স অধিক হইত। এক্ষণে আর তাদৃশ রীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু ইহার বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিলে অনায়াসেই প্রতীত হইবে।

বিবাহের বয়স দেশকাল পাত্র বিবেচনায় পাত্রের পঞ্চবিংশতি ও পাত্রীর ষোড়শ বর্ষই যুক্তি সঙ্গত। অনেকে পাত্রীর ঋতুর পরই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আজ কাল একাদশ বর্ষীয়া বালিকাকেও ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। পরন্তু তাহাদিগের গর্ব্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে, আদ্য ঋতুর পর ছয় সাত মাস পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকে। ইহার কারণ স্বামীর অস্বাভাবিক কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সময়ের পূর্ব্বে কোন যন্ত্রকে অভীষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত করিলে সে যন্ত্রের কার্য্যকারিতাশক্তি অতি অল্পদিনেই যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সে জন্যই বলিতেছিলাম, পাত্রীর ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম কালেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ সময়েই তাহার দৈহিক

শক্তি উপযুক্ত এবং শরীরযন্ত্রাদি এমনভাবে পরিণত হয় যে, তাহাতে তাহার গর্ভধারণের ক্ষমতা জন্মে। যখন সন্তান উৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য, তখন ঋতুমতী ও গর্ভধারণের উপযুক্ত পাত্রীই বিবাহ করা কর্ত্তব্য। (৩)

কোন কোন স্ত্রীলোকের আদ্য ঋতু ও মাসিক ঋতু পর্য্যায় যথানিয়মে হইয়াও কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। যাহাদিগের শরীর রুগ্ন এবং অঙ্গ বিকল, তাহাদিগের অনেক যন্ত্রের পরিণতি না হওয়ায় ঐরূপ হইয়া থাকে। এরূপ পাত্রী বিবাহ করিয়া, অনেকে বিশেষ বিব্রত হন এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন। (৪)

আবার কোন কোন স্থলে পাত্রী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সময়োচিত পরিণত হইতে না হইতে ঋতুমতী এবং অল্প বয়সেই গর্ভবতী হয়। সামর্থ্য, দাঢ্য এবং দৈহিক যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি হেতুই এইরূপ হইয়া থাকে। (৫) দুঃখের বিষয়, এইরূপ স্ত্রীলোকের

(৩) The main Function of the ovary is to supply the female generative eliments and to expel it. when ready form prignation in to the gallopian tube along which it passes in to the uterns, * * * In the human periodical discharge of the ovale in all probablety takes place in conection with muestruation,

Piafayer vol 1. Page 14,

(৪) Thus wo may conclude that at each m nstruation a grofian vessicle assumes a marked pre-pondrance over the rest, arives spontaneously at maturety and generally bursts at an indetarmiaate moment of this period inorder to expel the ovum it contains. but nevertheless in certain cases this vesicle may also remain stationary or be totally absorbed. Barner,

"Diseases of wemen" page 184.

(৫) The early menstruation depends upon evry ovulation is farther proved by the occational occovercnee of evry early pregnency,

M. Baker, page 192,

যৌবন অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। অসাময়িক উন্নতি যেমন অনিষ্টকর, অবনতিও তদ্রূপ অনিষ্টজনক। সমস্ত কার্য্যই যে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় সাপেক্ষ, তাহা বিবেচনা করিলেই এ সমস্ত বিষয় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিধাতার এমনি আশ্চর্য্য কৌশল যে, সমস্ত কার্য্যই এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বভাববশে সংসাধিত হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম অনিষ্টজনক।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এবং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় বিবাহের বয়স পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে নির্ব্বাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শরীর রুগ্ন কি ব্যাধিগ্রস্থ হইলে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের আরও অধিককাল অবিবাহিতা থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতবর্ষে সে নিয়ম প্রতিপালিত হইবার নহে। যেখানে পঞ্চবিংশতি কোটী মানবের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা অঙ্গুলীমেয়, তথায় এ নিয়ম কে প্রতিপালন করিবে? কেইবা নিজের বর্ত্তমান সুখের পথে কাঁটা দিয়া, ভবিষ্যসুখের জন্য ভবিষ্যপথ চাহিয়া থাকিবে? তবে কথঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই গ্রন্থকারের পক্ষে যথেষ্ট হইল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

যৌবনের কর্ত্তব্য কি?

বালকের ষোড়শ ও বালিকার ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই যৌবন সঞ্চার হয়। পূর্ব্বকালে ইহারও অধিক বয়সে বালক বালিকার দেহে যৌবন সঞ্চারের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু অধুনা সময়ের আবর্ত্তনেই হউক বা মনুষ্যসাধ্য চেষ্টাতেই হউক, যৌবনকাল ক্রমঃশই নিম্নগামী হইতেছে। যৌবন সঞ্চারের আনুসঙ্গিক কতকগুলি পরিবর্ত্তন, যাহাতে অনায়াসেই যৌবনাগমের প্রভুত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। বালকের দেহে যৌবনের সূত্রপাত হইলেই স্বর গম্ভীর হয়, বাল্যচাপল্য ক্রমশঃই হ্রাস হইতে থাকে, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, দেহ পরিণত হইতে থাকে,

শ্মশ্রুভেদ হয় এবং মানসিক ভাবের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে বালকের দেহে বীর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ এবং কীট পূর্ণ হইতে ষোড়শ কি ততোধিক বর্ষকাল ব্যয়িত হয়।

পরিপুষ্ট বীর্য্যই অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগী। ঘৃণিত ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তিই ইহার উদ্দেশ্য নহে। বিধাতা সৃষ্টিরক্ষার জন্যই পুরুষ শরীরে বীর্য্য ও স্ত্রীদেহে শোণিতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অনেক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পর হইয়া, অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনে অল্প বয়সেই স্বীয় দৈহিক অবনতি এবং তৎসহ ভবিষ্য সন্তানজনমের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। ইহার প্রমাণ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। ইন্দ্রিয়পর যুবকগণের পরিণামে যে কতদূর মনস্তাপ ও কি প্রকার ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন।

বাল্যকালে বালকবালিকা কুসংসর্গে পড়িয়া, স্ব স্ব চরিত্র দূষিত করিয়া ফেলে। বালকগণ বীর্য্য পরিপুষ্ট না হইতে এমন কি বীর্য্য সঞ্চার হইবার পূর্ব্ব হইতেই অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকে। আবার এই সমস্ত বালকের প্রলোভনে পতিত হইয়া, অনেক বালিকাও স্বীয় অপরিণত শরীরযন্ত্রাদি অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

অসাময়িক ইন্দ্রিয় পরিচালনে কতপ্রকার উৎকট রোগ জন্মে, তাহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দিব। এস্থলে কেবল কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

বালকগণ অসময়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে গিয়া, স্বীয় দৈহিক উন্নতির পথে কণ্টকার্পণ করেন। অসময়ে দেহের উন্নতির সূত্রপাতেই অপরিপক্ব বীর্য্য ব্যয়িত হইতে থাকিলে, তাহার জীবনীশক্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইতে থাকে। মনের স্ফূর্ত্তি একবারে নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উপযুক্ত সময়ে শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর কৃশ ও লাবণ্য নষ্ট হইতে থাকে। মনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। দেহের সহিত মনের এতাদৃশ নৈকট্য সম্বন্ধ যে, একের স্বভাবে অপরও তাদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শরীরের অসচ্ছন্দতা হেতু মনের শান্তিও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। আবার জনমানবের সৃষ্টি, যে জন্য, ইন্দ্রিয় পরিচালন আবশ্যক, অসময়ে

সেই ইন্দ্রিয়ের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত কার্য্যকালে কেবল মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় মাত্র। বাল্যকালে অযথা ইন্দ্রিয়পরিচালনে অপরিপক্ক বীর্য্য ব্যয়িত হওয়ায় এবং অপরিপক্ক যন্ত্র অধিকতর কার্য্যকারিতা শক্তিসম্পন্ন করিয়া, বলপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান হেতু, তাহা এ জীবনে আর পরিপক্ক ও দৃঢ় হইতে পায় না, সেইজন্য যৌবনকালেই জরাগ্রস্থ হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়।

বাল্যকালে অযথা বীর্য্যপতনের আর একটী প্রধান দোষ—তন্দ্রাস্খলন বা আত্মস্খলন। কুক্রিয়াশক্ত বালকের চিত্তে উত্তরোত্তর তদচরিত দুষ্ক্রিয়ার চিত্র পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইয়া, হৃদয় যেন সেই অসার চিন্তামগ্ন হয়, নিদ্রিতাবস্থায় সেই জঘন্য আপনা হইতেই বীর্য্য স্খলিত হয়। এই রোগের বিষময় ফল বর্ণনাতীত! ডাক্তার গ্রেহাম বলেন, স্বাভাবিক অপেক্ষা আত্মস্খলনে দ্বিগুণ বীর্য্য নির্গত হয়, (১) সুতরাং এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি শরীরের কতদূর অনিষ্টকর, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বাল্যকালে সংসর্গদোষে এতাদৃশ কুক্রিয়াশক্ত হইলে, বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ঘটে। ইহাতে মানসিকশক্তি ক্রমশই দুর্ব্বল ও চিত্তের গতি এতদূর বিপথগামী হয় যে, কোন দুরূহ বিষয় চিন্তা করিবার ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র, কি কোন কুট প্রশ্নের সমাধানের জন্য যে পরিমাণ চিন্তার প্রয়োজন, তাহার অভাব হওয়ায় বালকের ভবিষ্যজীবনে উন্নতির আশা থাকে না। বিদ্যা উপার্জ্জন না হইলে, বালকের ভবিষ্য উন্নতির আশা কোথায়! নির্ব্বুদ্ধিতা ও সংসর্গদোষে বালকগণ এইরূপে নিজের সর্ব্বনাশ করে এবং পিতামাতার আশা-তরুর মূলে কুঠারাঘাত করে।

অসাময়িক ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিলে, আরও নানাবিধ উৎকট পীড়া জন্মে। হাঁপকাস, যক্ষ্মা, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রতারল্য, দৃষ্টিহীনতা ও দুর্ব্বলতা তন্মধ্যে প্রধান। এ সকলের বিশেষ বিবরণ অন্য প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে।

বাল্যকালে কুসংসর্গে পড়িয়া, বালিকারাও স্বীয় স্বীয় জীবন বিষময় করে। বিশেষ যেস্থানে বালিকাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার তাদৃশ কোন নিয়ম নাই, তথায় ইহার অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুসমাজে

(১) Vide Dr. Greyham' "Diseases of youths" শৃঙ্গারতিলকে উল্লেখ আছে, আত্মস্খলনে স্বাভাবিক অপেক্ষা চতুর্গুণ বীর্য্য স্খলিত হইয়া থাকে।

বালিকার প্রতি হতাদর যেন অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ইহারা সংসারের যেন আবর্জ্জনা। কেহ যত্ন করিবার নাই, শিক্ষা দিবার নাই। প্রায়ই দেখিতে পাই, পঞ্চম বর্ষ হইতে নবম কি তাহারও অধিক বয়স্কা বালিকারা সংসারে কোন সংশ্রবই রাখে না। দিবারাত্রি যদৃচ্ছা খেলিয়া বেড়ায়। কেবল আহার ও শয়ন কালে তাহারা গৃহে আসিয়া দেখা দিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে বালিকারা দুষ্ট বালকগণের প্রলোভনে পতিত হইয়া দুষ্কার্য্যের সূত্রপাত করে। যে কার্য্য তাহারা প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার ফলাফল বিচারের ক্ষমতা তাহাদিগের নাই।

বালিকা অল্প বয়সে কুসংসর্গ করিলে তাহার শরীর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে পায় না। দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে। বয়সের বৃদ্ধির সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইবার যেরূপ নৈসর্গিক বিধান আছে, ইহা-দিগের শরীরে তাহার বিপরীত ভাবই দৃষ্টিগোচর হয়। অসম্পূর্ণ স্ত্রীযন্ত্রে অসাময়িক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার বৃদ্ধি ও পরিণতিতে দারুণ ব্যাঘাত জন্মে। এমন শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক বালিকা অযথা কুসংসর্গ করিয়া যৌবনকালে ঋতুমতী হয় না। ঋতুমতী হইলেও তাহার বয়সানুরূপ স্ত্রীযন্ত্রের সম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। উদরে একপ্রকার ব্যথা আপনা হইতে সঞ্জাত হইয়া বহুকালস্থায়ী হয়। কোন কোন বালিকা আবার ঋতুমতী হইয়া অত্যধিক শোণিতপাত হেতু নানাবিধ পীড়ায় পীড়িত হয়। কেহ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও যৌবনসুলভ মানসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয় না। প্রফুল্লতা, ভোগবাসনা, একেবারে থাকে না। গৃহ কার্য্য বা অন্য কোন বিশেষ কার্য্যে শ্রদ্ধা বা যত্ন থাকে না। সর্ব্বদা বিশুষ্ক মুখে—বিষাদ-প্রতিমা সাজিয়া নানাবিধ দুশ্চিন্তায় সময় অতিবাহিত করে। এরূপ জঘন্ত জীবনভার বহন করা কতদূর কষ্টসাধ্য, তাহা মনে করিলেও কষ্ট হয়।

সন্তানপালন প্রকারান্তরে পিতামাতার প্রতিই নির্ভর করে। কিন্তু পুত্র সন্তানের প্রতি যেরূপ যত্ন ও স্নেহ থাকে, কন্যা সন্তানের প্রতি হিন্দু পিতামাতার তাদৃশ কোন লক্ষণই থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কন্যা সন্তানের এতাদৃশ মনোবিকার ও দৈহিক অবনতির কারণই কেবল পিতামাতার তাচ্ছিল্যের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পিতামাতার জানা আবশ্যক,

কন্যা ও পুত্র উভয়ই এক কার্য্য সাধনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্র নির্ব্বিশেষে কন্যা প্রতিপালনের জন্য পিতামাতা ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

যৌবনকালের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা বড় বিষম সমস্যা। যে শিক্ষকের শিক্ষাগুণে ছাত্র যৌবনের প্রলোভন তৃণতাচ্ছিল্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে, সে শিক্ষক প্রকৃতই নিপুণ শিক্ষক বটে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

যৌবনকালে কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, কি মানসিক বৃত্তিসমূহ—সকলই স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়। মনোবৃত্তির তখন পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব শক্তি, উন্নতির চরম সীমায় অধিরোহণ করিয়া প্রত্যেক বৃত্তিই যুবকহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এদিকে কামক্রোধাদি ঋতুবর্গও যৌবনকালে বর্দ্ধিত ও যথেষ্ট প্রবল হইয়া যুবকের হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করে। সকল দিক হইতেই সর্ব্ববিষয় পূর্ণতা হেতু যুবকের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা। তবে যে যুবক শিক্ষা ও বুদ্ধি বলে এই বৃত্তিসমূহের কার্য্য কারিত্ব শক্তি সমালোচন করত প্রত্যেকের পরিণাম জ্ঞাত হইতে পারেন, এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন, অর্থাৎ এই সু ও কু-প্রবৃত্তিসমূহের যথাসামঞ্জস্য করিতে সমর্থ হন, সেই যুবকেরই জীবন সুখের। কালে এই সংসার দুঃখময় সকলের পক্ষে বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা নন্দনকানন। তিনি নিরোগী ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্ত্রীপুত্রপরিজন পরিবৃত হইয়া সুখের সংসারে পরমসুখে সুখী হইতে পারেন।

যখন যে বৃত্তি মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয়, মনোবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির ঐক্যতা হেতু প্রবৃত্তি তখন সেই দিকেই ধাবিত হয়। যৌবনকালে সমস্ত মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিযুক্ত হওয়ায় যুবকের প্রকৃতি বারম্বার নানাবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করে। সেই জন্য যুবক-যুবতীর মনে কোন স্থায়ীভাব অধিককাল স্থায়ী হয় না। যুবতীর মনোগতি কখন প্রশান্ত, কখন চঞ্চল, কখন ক্রোধ কখন ঈর্ষা, কখন বিরতি, কখন স্ফূর্ত্তি, আবার কখন বা বৈরাগ্য বা নিবৃত্তি ভাব অবলম্বন করে। কামক্রোধাদির এইরূপ আঘাত সংযম করিতে অসমর্থ হইয়াই যুবকযুবতীবিশেষে সময়ে চরিত্র দূষিত করিয়া ফেলেন।

বিনাশকালে জন্তুনাং জায়তে বুদ্ধিবিক্রিয়া।

পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তনের আঘাত সহ্য করা বড় কষ্টসাধ্য। বালক সংসারের কিছুই জানে না, কোন প্রবৃত্তির অত্যাচার বা আবির্ভাব বুঝে না, সমস্ত বৃত্তিরই তখন সংযত ভাব। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে মাত্র। তখন সে বুদ্ধি সরল নীতিশিক্ষা ভিন্ন সংসারশিক্ষার উপযোগী নহে। বালক বিদ্যালয়ের ছাত্র, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরাশির সঙ্গেই তাহার পরিচয়। বালিকাও কিছু জানে না। স্বভাবসুলভ চাপল্য আর বাল্যক্রীড়াই তাহার অভ্যস্ত। আর নীতির মধ্যে সেঁজুতি, পুণ্যপুকুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রত সংসারের সহিত তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কোন সংস্রবই নাই। এই সময়ের পরই ক্রমশঃ তাবৎ বৃত্তির আবির্ভাব ও পরিণতি। এ বৃত্তির সংঘাত সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ করা কি সকলের পক্ষে সম্ভবে? সামান্য শিক্ষায় এ আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে না।

সংসারজ্ঞানশূন্য বালকবালিকার মহৎপরিবর্ত্তন যৌবনে। সেই সদা-হাস্যময় ভাব—চাপল্য একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সহসা গাম্ভীর্য্য ভাব। সেই সামান্য কথায় হাসি নাই,—বালক-বালিকা এখন যুবক-যুবতী। বুঝিতে পারিতেছে, এত হাসির কোন কারণ নাই। বালক বাল্যকালে জানে কেবল বিদ্যা আর গৃহ। যৌবনে তাহার সম্মুখে বিস্তৃত সংসার। বালক চিনে কেবল আত্মীয় স্বজন,—এখন সে সংসারকে চিনিতে অগ্রসর। বালক বিদ্যালয়ে শিখিতেছিল অ উ অস,—এখন শিখিল প্রেম খ্যাতি যশ। বালকের বিশ্বাস ছিল, পিতামাতা আত্মীয় পরিজন আমার সকলই আছে, এখন দেখিল আছে সব, তবুও যেন কেহ নাই। বালিকা আগে জানিত, পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা; এখন দেখিতেছে—প্রেম-ব্রতের গভীর তরঙ্গ। আগে মাতার ক্রোড়ে বসিয়া—মাতার স্নেহ আদর পাইয়া পরিতুষ্ট হইত; এখন তাহার হৃদয় যেন পরের স্নেহ-আদরের জন্য লালায়িত। বালকের হৃদয়ে ছিল,—ব্যাকরণ, জ্যামিতি, সাহিত্য; এখন যুবকের হৃদয়ে হইল,—ভালবাসা, প্রণয়, দয়া, স্নেহ। আগে বালক হিতোপদেশের পশুচরিত্র পাঠে আমোদিত; এখন আর তাহা ভাল লাগে না, মেঘদূতের যক্ষ-চরিত্র, শকুন্তলার শকুন্তলা-চরিত্র হৃদয়ের সঙ্গে মিলে ভাল। আগে হৃদয়ের গতি ছিল, প্রাণের বাসনা ছিল, সৎ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইব, বড় উপাধি পাইব, এখন সে সব ঘুরিয়া গিয়া বাসনা হইয়াছে, কিরূপে পরকে আত্মসমর্পণ

বেশ্যাসংশক্তমনসো বরা দুখমবাপ্নয়ু।

করিব, কি করিলে পরকে ভালবাসিব, দয়া করিব—স্নেহ পাইব। বালক বালিকার হৃদয় এত দিন ছিল সংসারে কুয়াসাসমাচ্ছন্ন, এখন হইয়াছে তথায় নন্দনকানন। কত প্রেমের ফুল ফুটিয়াছে,—আশা-কেয়ারীতে কত প্রণয়ফুল ফুটিবে ফুটিবে করিতেছে, হৃদয়-মরুভূমে এখন দয়ার নির্ঝর বসিয়াছে,—আশার প্রলোভন পদে পদে যুবক-যুবতীকে কত মোহিণীমন্ত্র ফুকিতেছে, বৃত্তিসমূহ সময়ে সময়ে হৃদয়ক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে, এত প্রলোভন—এত আকর্ষণ সহ্য করিয়া অভিষ্টপথে জীবনের গতি পরিচালিত করা কি সামান্য কথা? যে সমস্ত প্রলোভনে মহামহা যোগী ঋষিগণও বহুকালার্জ্জিত তপস্যায় জলাঞ্জলী দিতে বাধ্য হইয়াছেন,—কত মহামহা পণ্ডিত কত শত শত শিক্ষায় শিক্ষিত শেষ বয়সে এই প্রলোভনে পতিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধিবলে সংসারচক্র অনুকুল গতিতে পরিচালিত করিয়া নিজেই আবার এই প্রলোভনচক্রে পেষিত হইয়াছেন, তখন সংসার-জ্ঞানশূন্য—সংসারপথের নবীন পথিক এত বাধা বিপত্তি কি সহ্য করিতে পারেন? এত প্রলোভনে সকল বন্ধন কি ছেদন করিতে পারেন? এ সকল প্রলোভনের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড় বিষম কথা। যাঁহারা সংসারের জটিল পন্থা পরিহার করিয়া যুবাবয়সের অসার প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন, সংসারই তাঁহার স্বর্গ। তিনি এই সংসারে থাকিয়াই স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন, তৎপক্ষে সন্দেহমাত্র নাই।

পিতামাতার দৃষ্টি সন্তানের প্রতি থাকিলে এবং তাহাদিগকে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করিলে প্রায়ই চরিত্রগত দোষ পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে সন্তানের চরিত্রগত দোষের প্রাধন কারণই অভিভাবকের তাচ্ছিল্য। তাঁহারা সন্তানকে কিরূপে শিক্ষা দিতে হয় বা বালিকা কন্যাকে কোন্ কোন্ নীতি ও কোন্ কোন্ কার্য্য শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহা হয়ত জ্ঞাত নহেন, অথবা জানিয়াও তাচ্ছিল্য বা আলস্যবশত সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহেন। পিতামাতার জানা আবশ্যক যে, সন্তানই ভবিষ্য আশার অঙ্কুর। বৃদ্ধবয়সে পিতামাতার আশাভরসার স্থল কেবল সন্তান। অতএব তাহাদিগকে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করিলে কেবল সন্তানই যে সুখী হইবে তাহা নহে, পিতামাতাও তাহাতে সুখী হইতে পারিবেন।

যথাদানং বৃথা ভোজ্যং বৃথালাপং পরিত্যজেৎ

বঙ্গীয় পিতা কেবল সন্তানকে আহার, পরিচ্ছদ ও শিক্ষালয়ে প্রেরণ করিয়াই সন্তানের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য যথেষ্ট সম্পাদন করিলেন বলিয়া মনে করেন। মাতা পুত্রকন্যাকে গর্ভে ধারণ ও পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত লালন পালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন্। তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক যে, আমরণ কাল তাঁহাদিগের শিক্ষাস্রোত সন্তানের প্রতি সমবেগে প্রবাহিত হইবে। এ সব কথা প্রবন্ধান্তরে বিবৃত হইবে।

যৌবনে অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা কামপ্রবৃত্তি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যুবকযুবতি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়াই মহদানিষ্ট সাধন করেন। অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা কামপ্রবৃত্তি দমনই যৌবনকালে প্রধান পুরুষত্ব এবং অনুষ্ঠেয়।

যৌবনকালই সংসারশিক্ষার উপযোগী। সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কালও যৌবন। অতএব দারপরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে সংসারশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সংসার-শিক্ষা কি?

মাতাপিতার প্রতি ব্যবহার, আত্মীয়স্বজনের প্রতি ব্যবহার, কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাপিত হইলে, সংসারে কষ্ট থাকে না, পরিবারবর্গের প্রতি ব্যবহার, দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার, অর্থ ব্যবহার, পরিমিত ব্যয়, ধর্ম্মালোচনা, সংসারনীতি, সাংসারিকের আবশ্যকীয় ব্যবহারবিজ্ঞান, পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধান ও কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি শিক্ষার নামই সংসারশিক্ষা। উপরোক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া সুখ পাইয়া থাকেন। নতুবা অনভিজ্ঞ যুবক অপরিণামদর্শিতায় দারপরিগ্রহ করিয়া, অচিরে পুত্রকন্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েন এবং আজীবন দুঃখের বোঝা বহিয়াই কাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে সংসারশিক্ষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ না করিয়া, সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, সে অপরিসীম দুঃখ একান্তই অপরিহার্য্য। অতএব সংসারশিক্ষাসম্বন্ধীয় কয়েকটী সূত্রমাত্র এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

পিতামাতার প্রতি ব্যবহার বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করা আবশ্যক। তবে যৌবনে সেই শিক্ষার সমাধান। পিতামাতা স্বর্গ হইতেও উচ্চ এবং পূজনীয়। যাঁহাদের অপরিসীম কৃপাবলেই সুদুর্ল্লভ মানবজীবন লাভ, যাঁহাদিগের অসীম ভালবাসায় সেই শোণিতপিণ্ড শিশু হইতে

এই যৌবন সীমায় পদার্পণ, যাঁহাদিগের কৃপায় এই অস্ফুটবাকশিশুর বেদবিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ, তাঁহাদিগের ন্যায় পূজনীয় আর কে আছেন? মনুষ্যের কর্ত্তব্য, পিতামাতা যাহাতে সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারেন, আহার্য্য ও পরিধেয় সম্বন্ধে অথবা সাধ্যায়ত্ত বাসনা যাহাতে অপূর্ণ না থাকে, সন্তানের তাহাই কর্ত্তব্য। পিতামাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, সন্তান সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। পিতামাতার আজ্ঞা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, যে মূঢ় তাঁহাদিগের স্নেহ-প্রবণহৃদয়ে আঘাত করে, যে নরাধম মাতাপিতার সেবাশুশ্রূষায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। পিতৃভক্তির দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদর্শনার্থই ভগবানের অবতার রামচন্দ্রের আবির্ভাব। পিতৃমাতৃভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ সর্ব্বজাতীয় কাব্যেইতিহাসেই বিদ্যমান আছে। সন্তানের পরম দেবতা পিতামাতা।

সংসার পরিচালন বড় বিষম কথা। অভিজ্ঞ কর্ত্তা ও গৃহিণী না হইলে, সুন্দররূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। সংসার করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। আয়-অনুসারে ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি না করিলে, হয়ত কিছুদিন পরে সংসারে অন্নাভাব ঘটিবে অথবা অতিকষ্টে "পেটের উপর বাণিজ্য" করিয়া অর্থ জমান হইবে। মিতব্যয় শিক্ষা ও আয়ব্যয় হিসাব করতঃ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সংসার পরিচালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যেকেরই নিয়মিত কিছু কিছু সঞ্চয় আবশ্যক। সঞ্চয়ী না হইলে, এমন সময় আসিতে পারে যে, অর্থাভাবে সংসারের নানাবিধ দুর্নিমিত্ত সংঘটিত হইয়া উঠে। অনেক স্থানে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অতি সামান্য দিনের মধ্যেই অতি ধনাঢ্য পরিবারও মুষ্টিভিখারী হইয়া পড়েন। কেবল অপরিমিত ব্যয়ই ইহার একমাত্র কারণ। মিতব্যয় অবলম্বন করিলে, এইরূপ হইত না। নিয়মিতরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, মিত-ব্যয় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

কলহ সংসারভঙ্গের একটী প্রধান কারণ। যে সংসারে মূর্ত্তিমান কলহ বিরাজ করে, সে সংসারে সুখের প্রত্যাশা নাই। শান্তি তথা হইতে দূরে পলায়ন করেন। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি, কলহে লক্ষ্মীদেবী চঞ্চলা হয়েন। প্রকৃত প্রস্তাবে যে সংসারে কলহ না থাকে, যে গৃহ বালকবালিকার

সুধামাখা হাসি, যুবকযুবতীর প্রেমালাপ, বৃদ্ধবৃদ্ধার ধর্ম্মকথা ও দাসদাসীর প্রভুভক্তির নিদর্শনও সদা প্রফুল্লভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেই স্থানে সেই পরিবারেই লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন। সেই সংসারই শান্তির শান্তিময়ী নিকেতন।

পরিবারবর্গ কর্ত্তা ও গৃহিণীর প্রতি সর্ব্বদাই ভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বকার্য্যে আদর্শ জ্ঞান করিয়া, অনুকরণ করিবে। কর্ত্তাগৃহিণীর বিনানুমতিতে তাহারা কোন কার্য্য করিবে না। এই কার্য্যগুলি পরিবারবর্গ কর্ত্তাগৃহিণীর ভয়ে বা তাড়নায় যে অনুষ্ঠান করিবে, তাহা নহে। তাঁহাদিগের স্নেহে মোহিত হইয়া, ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, মনের আনন্দে পরিবারবর্গ তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিবে।

দাসদাসীর প্রতি কু-ব্যবহার মহা অনিষ্টজনক। প্রভুর তাড়নায় প্রভু সমক্ষে দাসদাসী নীরবে কার্য্য করুক, কিন্তু প্রভুর চক্ষুর অন্তরাল হইলেই, তাহারা আর কার্য্য করিবে না। বসিয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইবে। আর তাহারা যদি প্রভুর গুণে মুগ্ধ হইয়া,—সদ্ব্যবহারে সুখী হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে, প্রভুর সাক্ষাতাপেক্ষা অসাক্ষাতে বরং অধিকতর পরিশ্রম করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। প্রভুকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, আপনার কার্য্যজ্ঞানে প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যাঁহারা না বুঝিয়া দাসদাসীকে তাড়না করেন, তাঁহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মালোচনাও সংসারীর কর্ত্তব্য। কেননা, ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, মনের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সংসারে যতই কেন বিঘ্ন সংঘটিত হউক, মনে হয় বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আছেন, তিনিই এ বিপদে ত্রাণ করিবেন। বিপদকালে ভগবানের নাম মুখে আনিলেও, অনেক শান্তি পাওয়া যায়। আর যিনি ধর্ম্মকে মস্তকে রাখিয়া, সংসারে সংসারী হয়েন, ধর্ম্মত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া,—সংসারের বিঘ্ননাশ করিয়া, আশ্রিতকে সুখী করিতে থাকেন। সংসারে অনেক অধর্ম্ম, সংসার করিতে অনেক অধর্ম্ম-কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়, ক্ষণিক সুখের জন্য সংসারীব্যক্তি অনেক মহানিষ্টকর কার্য্য সাধন

করেন এবং পরিণামে সেজন্য মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপথে বিচরণ করিলে, কোন বিপদ তাঁহাকে সহসা ক্লিষ্ট করিতে পারে না।

ব্যবহারবিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান থাকাও সংসারীব্যক্তির আবশ্যক। বিষয়বৈভবসংক্রান্ত অনেক বিবাদ বিসম্বাদ আছে, যাহাতে ব্যবহারোজীবির পরামর্শ না লইলে, উপায়ন্তর থাকে না। এমত স্থলে আবশ্যকীয় ব্যবহার শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে, সামান্য আবশ্যকহেতু ব্যবহারোজীবির নিকট গমন করিয়া, অর্থব্যয় ও তোষামোদ করিতে হয় না।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সামান্য কারণে, এমন কি মাথা ধরিলে, কি অজীর্ণ হইলেই চিকিৎসকের সাহায্যলাভ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অনেক অর্থ অনর্থক ব্যয় হইয়া যায়, কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যায় সামান্য জ্ঞান থাকিলেও তিনি স্বয়ংই সামান্য সামান্য পীড়ায় চিকিৎসা করিতে পারেন, ইহাতে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে। এমন কি স্বাস্থ্যবিদ্যায় জ্ঞান থাকিলে, তিনি পীড়ার পূর্ব্বে সতর্ক হইয়া, পরিবারবর্গের কেহ পীড়িত না হয়, সে উপায়ও করিতে পারেন। গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারিলে, সে পরিবারের পীড়িত হইবার আশঙ্কা থাকে না। ইহাও সামান্য সুখের বিষয় নহে।

কর্ত্তৃত্ব করা বড় দক্ষতার কার্য্য। সুদক্ষ কর্ণধার যেমন সামান্য নৌকাও সমুদ্রপারে লইয়া যাইতে পারেন, উপযুক্ত কর্ত্তাও তদ্রূপ সামান্য আয়ে সুন্দররূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সংসারের উন্নতি ও অবনতি কর্ত্তার দক্ষতার উপর নির্ভর করে। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বেও দিয়াছি। পরন্তু সংসার শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, কর্ত্তৃত্ব-করিবার অধিকার জন্মে না। সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে যে সংসারের পরিচালন ভার ন্যস্ত হয়, সেই সংসারই অচিরে দুঃখকষ্টের সমুদ্রে পড়িয়া, বড়ই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সংসার সুখের করিতে হইলে, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা আবশ্যক। আবার পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সংসারশিক্ষা আবশ্যক। সাংসারিক সুখ সকলেরই প্রার্থনীয় হইলেও শিক্ষাভাবে প্রায়ই তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবল শরীর, সুস্থ পুত্রকন্যা, আজ্ঞাকারী ভৃত্য, বশীভূত পরিবার, সংসারে তুল্যাংশে সুখদুঃখভাগিনী প্রেমময়ী জায়া, সংসারের ইহারাই

মদ্যপে সৌহৃদং নাস্তি দ্যূতকারে এবং নহি

সুখের আস্পদ। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যুবক যদি এই গুলির সংস্থান করিতে পারেন, এই সমস্ত গুণে গুণবান হইতে পারেন, এই সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই এই সংসার তাঁহার সুখের হইবে। এই সংসারেই তিনি পরম সুখ প্রাপ্ত হইবেন।

সুখ দুঃখ সুকৃতি বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলেও তাহার অনুষ্ঠান মানবের সাধ্যায়ত্ব। পুরুষত্ব অদৃষ্টের প্রিয়তম সন্তান। পুরুষত্ব থাকিলে, চেষ্টা থাকিলে, ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহ থাকিলে, অদৃষ্টদেবী তৎপ্রতি অবশ্যই প্রসন্না হইবেন। উদ্যোগী পুরুষকেই ভাগ্যলক্ষ্মী আশ্রয় করেন, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। অতএব যৌবনে পূর্ব্বোক্তরূপ দৈহিক ও পারিবারিক উন্নতি সাধিত হইলে, তিনি অবশ্যই সুখ পাইবেন।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

ইন্দ্রিয় পারিচালন।

(ঋতু, গর্ভ ও গর্ভিণীর পীড়া।)

যথেষ্ট ইন্দ্রিয়পরিচালনের বিষময়ফল পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপ নিয়মে ইন্দ্রিয়পরিচালন করিলে শারীরিক ক্ষতি না হইয়া বরং উন্নতি হয়, তাহাই লিখিত হইতেছে। বীর্য্য উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্ট হইলে সকল ব্যক্তি যদি প্রতিদিন বারেক স্ত্রীসঙ্গ করেন, তাহা হইলেও তাদৃশ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার অধিক হইলেই শরীরের ক্ষতি করে। রমনেচ্ছা মাত্রেই বীর্য্য মস্তিষ্ক হইতে ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া বীর্য্যাধারে আসিয়া অবস্থিতি করে। প্রতিবারে এক আউন্স মাত্র বীর্য্যস্খলিত হইলে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না। শরীরের সামর্থ অনুসারে ইন্দ্রিয় পরিচালনের সময় নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। এমন কি, বৎসরের একদিন মাত্র ইন্দ্রিয় পরিচালনও শরীরানুসারে ব্যবস্থিত হইতে পারে।

প্রকারান্তরে বলিতে গেলে বিবাহের উদ্দেশ্যই সন্তান উ[illegible] ...মুণীন্দ্র সম্মত।

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি সাধবঃ।

কি উপায়ে সন্তান উৎপাদিত হইয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

কথাটা হাসির বটে। সন্তান জনম এক প্রকার বিধাতার—স্বভাবের বিধানানুসারে হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সে বিষয়ে নূতন করিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? পাঠক! কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। কালধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে সকলেরই পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, এবং হইতেছে সেই পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া কুলক্রমাগত বিধির অনুসরণ করিলে যে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝেন। একটি সামান্য উদাহরণও দিতেছি। অধিকদিনের কথা ছাড়িয়া দিই, পিতামহের সময়ে সামান্যমাত্র চাষে যে ভূমিতে প্রচুর ধান্য জন্মিত, এখন আমাদের সময়ে সেই ভূমিতে প্রচুর চাষ ও সার দিয়াও সে পরিমাণে ধান্য পাই না কেন? কালধর্ম্মবশে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই? স্বভাবের পরিবর্ত্তন জন্যইত? এখন এমন কোন কার্য্য করা উচিত যে, পূর্ব্বে যে গুণে যে ভূমিতে সেই পরিমাণে ধান্য জন্মিত, এখন, সেই ভূমি সেইরূপ অবস্থাপন্ন করা। এইজন্য বলিতেছি, সন্তান উৎপাদন স্বভাবের নিয়মানুসারে হইতেছে বটে, তবুও সে সম্বন্ধে দুই একটি বক্তব্য আছে। (১)

পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রীর শোণিতে সন্তানের জন্ম, একথা সকলেই জানেন। তবে এই সকল বর্ত্তমানেও কিজন্য যে লোকবিশেষের সন্তান হয় না, তাহার কারণ হয়ত সকলে জানেন না। পুরুষের বীর্য্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে। সেই কীট এত ক্ষুদ্র যে, অনুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা অতি সামান্য মাত্র বায়ুর প্রবাহে নষ্ট হয়। এই কীটই পরিণামে সন্তানরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বল্পকীটবীর্য্যে সন্তান হয় না, হইলেও হয় সন্তান ভূমিষ্ঠমাত্রে মরিয়া যায়, অথবা যদিও দু এক দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে জীবনের সেই সামান্য সময় নানা প্রকার পীড়া ভোগ করে। যাহার বীর্য্যে যত অধিক পরিমাণে কীট অবস্থান করে, তাহার সন্তান তত অধিক বলিষ্ঠ এবং নিরোগী হয়। স্বল্প ও তরলবীর্য্য সন্তান সমুৎপাদনের একমাত্র অন্তরায়। যাঁহারা বাল্যকাল [illegible]ত্যধিক অভিগমন করেন, তাঁহাদিগের সন্তান কথনই সুস্থ ও সবল

সা উঠে না সংসারে তুলাংশে

(১) [illegible]cribed by David Hnme,

মদ্যপে সৌহৃদং সমণী ভাদেকরী খেলা।

হয় না। এমন কি, অনেকের একবারে পুরুষত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার অন্য প্রস্তাবে বিবৃত হইবে। (২)

কীটই সন্তানোৎপাদনের প্রধান সাধন, সুতরাং কীট যাহাতে বিনা বায়ুসংস্পর্শে জীবকোষে প্রবিষ্ট হয়, সেই উপায়ই একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা সামান্য বায়ুর সংস্পর্শে কীটগুলি আহত হইতে হইতেও যদি জীবকোষে গমন করে, তাহা হইলে সেই বীর্য্যে সন্তানোৎপাদন হইবে না।

পূর্ণযৌবনা রমণীই গর্ভধারণের উপযুক্ত। যুবতীর নাভীর নিম্নে একটী পদ্মাকৃতি চর্ম্মপেটিকা মূল নাড়ীর সহিত গ্রথিত আছে। সেই পদ্মাকৃতি চর্ম্মপেটীকা এরূপভাবে কুঞ্চিত থাকে যে, তাহা দেখিতে একটী বর্ত্তুলের ন্যায়। সেই বর্ত্তুলই কালক্রমে গর্ভস্থ সন্তানের আবাসস্থান হইয়া থাকে। চর্ম্মপেটীকা যে মূল নাড়ীতে আবদ্ধ আছে, সেই মূল নাড়ীপথে বিন্দু বিন্দু-শোণিত সঞ্চার এবং সেই বর্ত্তুলকে পূর্ণ করিয়া তাহার অবয়ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এইরূপ সেই পেটীকা পূর্ণ হইলে তাহার একপার্শ্ব হইতে তিন অঙ্গুলী পরিধি বিশিষ্ট একটি নল যোনীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর ও যোনীমুখ হইতে ছয় বা সাত অঙ্গুলী দূরে আসিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয়। পূর্ণ ত্রিশদিনে সেই নলমুখ ফাটিয়া গিয়া চর্ম্ম পেটীকার মধ্যস্থিত শোণিত তিন দিন ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে, ইহাকেই ঋতু বলে। * ঋতুর সেই দিনত্রয় স্বামীসঙ্গ একান্ত নিষিদ্ধ। কেন না, সেই দিনত্রয় জীব-কোষ শোণিতে পূর্ণ থাকায় এবং নলপথে শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ায়, জীবকোষ ত দূরের কথা, নলপথে বীর্য্যও প্রবিষ্ট হইতে পারে না; কেবল নলের দুর্ব্বলচর্ম্মে অযথা আঘাত করে। ঋতুকালে জরায়ু এতদূর দুর্ব্বল ও

---

(২) এসম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক Malthus On population, "অথবা" The Elements of at Social Science" নামক পুস্তক দেখুন।

* এই যে ঋতুর লক্ষণ ও সময় লিখিত হইল, তাহা সুস্থ অবস্থায়। নতুবা কখন কখন কোন কোন স্ত্রীলোকের ২৫ দিন ২৬ দিন অন্তরও ঋতু হইয়া থাকে। আবার কাহারও বা ৫ বা ৬ দিন শোণিত নির্গত হয়।

সন্তান উৎপাদনের এখন যে বিধি লিখিত হইতেছে, তাহা আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। অন্যান্য শাস্ত্রের মত স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

অবসন্ন থাকে যে, সামান্য বীর্য্যের আঘাতে তাহা ছিদ্র হইয়া যাইতে পারে। যদি কোন গতিকে জীবকোষ ছিদ্র হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবনে সেই অকর্ম্মণ্য জীবকোষ কখনই জীবধারণে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য ঋতুর দিনত্রয় পুরুষসঙ্গ একেবারে নিষিদ্ধ। ঋতুকালে রমণীর শরীর রসস্থ হয়, এই জন্যই সে দিনত্রয় অশুচি, অস্নাত এবং উষ্ণ ও রূক্ষ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋতুর দিনত্রয় পরে রমণীর অশুচিভাব অপগত এবং শোণিতস্রাবও রুদ্ধ হইয়া জরায়ু বীর্য্যবেগ ধারণে সমর্থ হয়। এই জন্য শাস্ত্রানুসারে ঋতুস্নান দিনে পতিসঙ্গ করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ঋতুই সন্তান ধারণের উপযোগিতা প্রদর্শন করে। যাহাদিগের ঋতু রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রায়ই গর্ভবতী হয়েন না। গর্ভ ধারণের ক্ষমতা তাঁহাদিগের নাই।

যোনিমুখ হইতে ষঠ বা সপ্তম অঙ্গুলী দূরে পূর্ব্ববর্ণিত নল অবস্থিতি করে। সেই নলের মুখ অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। এই অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে রমণ করিলে সেই কীটপূর্ণ বীর্য্য অনায়াসে নলপথে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই নির্দ্দিষ্ট দিনের অতিরিক্ত হইলে সে বীর্য্য জীবকোষে গমন করিতে পারে না। অষ্টাদশ দিবস পরে সেই নলমুখ ক্রমশঃ রুদ্ধ এবং অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রমণকালে বীর্য্য এরূপভাবে স্খলিত হওয়া উচিত যে, তাহা অনায়াসে জীবকোষে সরলভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইহার অন্যথায় সন্তানজননের বিষয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। জননেন্দ্রিয় জরায়ু নলের অব্যবহিত দূরে এরূপ ভাবে অবস্থান করিয়া বীর্য্য ত্যাগ করিবে যে, তাহা নলমুখের সহিত সমসূত্রে অবস্থান করত সবলে সমস্ত বীর্য্য অনায়াসে জীবকোষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলেই সন্তানলাভ পক্ষে সন্দেহ থাকে না।

জরায়ু নলের এমন ধর্ম্ম যে, তাহাতে সামান্য আঘাত লাগিলেই নলমুখ বন্ধ হইয়া থাকে। যদি বীর্য্য তাহার গাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলেই নল মুখ বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে রমিত হইলেও বীর্য্যস্খলনের বৈপরীতে গর্ভ হইতে পায় না। এজন্য রমণকালে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত কার্য্য ঘৃণিত হইলেও, সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য ইহাতে নির্ভর করিতেছে, এই জন্য ইহাতে সকলের সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পুত্রলাভার্থে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা এ সকলের সম্যক জ্ঞানে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে, সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ নিতান্তই অসম্ভব বরং সেই বিষয়ক চেষ্টাও নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। পূর্ব্বে এই বিষয়ে গুরু স্বয়ং শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, বেদ, বেদান্তাদি পাঠ শেষ হইলে, ছাত্র পরিশেষে "রতিশাস্ত্র" অধ্যয়ন করিয়া, সংসারী হইতেন, কিন্তু এখন সে দিনকাল গিয়াছে। ইংরাজরাজত্বে সে সকল শাস্ত্র লুপ্তপ্রায়। ইংরাজীতে এ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে, অনেক কেলেঙ্কারী হইতেছে, কিন্তু ইংরাজলীলাক্ষেত্র ভারতে সে সকল কথা মুখ ফুটিয়া বলে কে?

গর্ভস্থ সন্তান।—নলপথে বীর্য্য জীবকোষে প্রবিষ্ট হইলেই, নলমুখ রুদ্ধ হইয়া এবং ক্রমশঃ তাহা সঙ্কুচিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জরায়ু মধ্যে বীর্য্য প্রবিষ্ট হইয়া, সপ্তাহকাল কোন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না। ইহাই বীর্য্যের পরীক্ষা। বীর্য্য জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বীর্য্য পোষণের এ সময় নয়—এ পরীক্ষা যদি বীর্য্য বায়ুস্পৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে কীটসমুহ এই উষ্ণতায় নষ্ট হইয়া যায়, আর যদি বীর্য্য কীটশূন্য হয়, তবে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় সুতরাং সেই বীর্য্য যথানিয়মে জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও, তদ্দ্বারা কোন ফল হইল না। পাঠক! স্মরণ করুন, সন্তান উৎপাদনে এত বাধা!

সপ্তাহকাল পরে জরায়ু শোণিত দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া, বীর্য্যকে ক্রমশঃ সন্তানে পরিণত করিবার সূত্রপাত করিতে লাগিল এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ক্রমে তাহা জীবে পরিণত ও নয়মাস নয়দিনে তাহা ভূমিষ্ঠ হইয়া, জগতের জীবসংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

অনেকের বিশ্বাস যে, গর্ভিণী দশমাস দশদিনে সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু এক্ষণে বহুপরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইতেছে যে, প্রসূতী নয়মাস নয়দিনে সন্তান-প্রসব করেন।

গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কেননা, সামান্য মাত্র ব্যতিক্রমে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। গর্ভিণী পাঁচমাস পর্য্যন্ত পতিসঙ্গ করিতে

পারেন এবং পাঁচমাস পর্য্যন্ত অন্য কোন বিষয়েও তাদৃশ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ষষ্ঠ মাস হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হয়। উচ্চস্থানে সবলে আরোহণ বা উচ্চস্থান হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে পতন, অধিকক্ষণ নিশ্বাস রোধ, পতিসঙ্গ, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি বিশেষ নিষিদ্ধ। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় এই সমস্ত অযথা অত্যাচার এবং পতিসঙ্গ গর্ভপাতের একমাত্র কারণ। পতিরও এ বিষয়ে দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য।

যুবক শিক্ষিত এবং বক্ষ্যমাণ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইলে, তিনি অনায়াসে যে দিনে, যে মুহূর্ত্তে গর্ভসঞ্চার হয়, বলিয়া দিতে পারেন। সংসার করিতে এই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কেননা এই বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে, সংসারের অনেক উপকার সাধন করা যায়।

যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যেদিন সন্তান প্রথম জন্মগ্রহণ করিবে,—তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারেন, এবং ইহাও বলিতে পারেন যে, এই গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। ইহার বিবরণ ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ঋতুর চতুর্থ দিনে যুবক প্রশান্তচিত্তে স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। কোন মতে মনোমালিন্য বা চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে। যুবকযুবতীর চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অপ্রশান্ত মনে পতিসঙ্গ করিলে, সন্তান প্রায়ই বিকৃতস্বভাব প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য বলিতেছি, যুবকযুবতীর মন প্রফুল্ল থাকিলে, সেই সঙ্গমজাত সন্তান সচ্চরিত্র, বলিষ্ঠ এবং সরলস্বভাব হয়। রমণকালে যুবক যুবতীর মন দুঃখিত থাকিলে, সন্তান নির্ব্বোধ, মূক ও সর্ব্বদা বিষণ্ণভাবে অবস্থান করে। যুবক যুবতীর মন ক্রুদ্ধ থাকিলে, সন্তান অতি ক্রোধী ও খিটখিটে হয়। মনে অন্য রমণী বা পুরুষের প্রতি আসক্ত ইচ্ছা থাকিলে, সন্তান লম্পট, ধূর্ত্ত ও অসচ্চরিত্র বা কুলটা হয়। অধিক কি, যুবক যুবতীর মনোভাব তখন যেরূপ থাকিবে, সন্তানও তদ্রূপ স্বভাবসম্পন্ন হইবে, তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে যুবকযুবতী যাহাতে প্রফুল্ল থাকেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। *

* ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম বিবরণ এই রূপকে মণ্ডিত। একথা সকলেই জানেন, আপনি মনে মনে মিলাইয়া লইবেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, পতিসঙ্গকালে ভীত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত এবং হৃদয়ে ঘৃণাভাব থাকিলে, সন্তান প্রায়ই বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

চতুর্থ দিবসে গর্ভ হইলে, সন্তান, পঞ্চম দিবসে কন্যা, এইরূপ যুগ্মদিবসে পুত্র ও অযুগ্ম দিবসে গর্ভ হইলে, কন্যা জন্মিয়া থাকে। ঋতু যত নিকট গর্ভ হইবে, সন্তান তত সবল, মেধাসম্পন্ন ও দীর্ঘাবয়ব হইবে।

মাতার বীর্য্য (শোণিত) সমধিক হইলে, পুত্র এবং পিতার বীর্য্য সমধিক তেজস্মান হইলে, কন্যা জন্মে ‡ উপরতিকালে মাতার দেহ বক্র থাকিলে, সন্তান জন্মে না, জন্মিলেও সন্তান কুব্জ ও পঙ্গু প্রভৃতি হইতে পারে। গর্ভধারণকালে মাতা নির্ব্বাক, মুদ্রিতচক্ষু এবং হৃদয়ে প্রেমভাব না হইয়া, ঘৃণা বা ভয়ের ভাব থাকিলে, সন্তান অন্ধ ও খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ হয়।

সেই উপবতে গর্ভধারণ করিয়াও যদি রমণীর কামাশক্তি দমিত না হয় এবং কামলিপ্সা বলবতী থাকে, তাহা হইলে কন্যা কুলটা হয় এবং পুরুষের লিপ্সা বলবতী ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে, সন্তান লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়।

যদ্যপি পিতা কর্ত্তৃক সন্তান সঞ্জাত হইলে, সে সন্তান বায়ুরোগগ্রস্থ হয়। এই জন্যই প্রবাদ আছে, "মদ্যপায়ীর সন্তান তদ্রূপই হইবে।"

পিতামাতার মধ্যে কাহারও অনিচ্ছায় রমিত ও তাহাতে সন্তান সঞ্জাত হইলে, সে সন্তান চিররুগ্ন, দুর্ব্বল ও মূর্খ হয়। তাহার বুদ্ধি নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। কোন কার্য্যে তাহার উৎসাহ থাকে না, জড়বৎ ক্ষুণ্নমনে অবস্থান করে। জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালন হেতু কেবল যে সন্তান সমুৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা নহে। ইহাতে জীবনশক্তি অপগত হইয়া, মানবকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। স্মৃতি, বুদ্ধি, ধারণা প্রভৃতি অপগত হইয়া, সেই রিপুপরতন্ত্র ব্যক্তিকে এককালে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। কোন গুরুতর বিষয়ের ধারণা তাহার মস্তিষ্কে আইসে না। এই জন্য মানবের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। *

---

‡ Symtoms of Pregnency By, Dr, J, B. Dods, Page, 180 Bhap, IX,

* Vide "The low of Population" or the "Elements of Social Science" Page 257,

---

১। শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহ বিশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিবে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ও শরীরের বল পরীক্ষা করিয়া, ইন্দ্রিয়পরিচালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

২। দুর্ব্বল, যাহাদিগের শরীরের পরিমাণ এক মণ কুড়ি সের—অভাবে এক মণ দশ সেরের কম, যাহারা পীড়িত, মানসিক গতির স্থিরতা নাই, যাহাদিগের সাংসারিক অবস্থাহীন, যে নিজে নিষ্কর্ম্ম, তাহার ইন্দ্রিয়পরিচালন সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

৩। শাকান্নভোজী, পরিশ্রমী, মানসিক সামান্য পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি সপ্তাহে বারৈক মাত্র, মাংস দুগ্ধ ও গোধূমভোজী বলিষ্ঠ ব্যক্তি সপ্তাহে বারত্রয় এবং প্রভুত ধনশালী, ঘৃত, মাংস প্রভৃতি সারবান (শ্বেতসারবিশিষ্ট) খাদ্যভোজী ব্যায়ামকারী, অন্য সাংসারিক পরিশ্রম পরিশূন্য ব্যক্তি সপ্তাহে পাঁচবার জননেন্দ্রিয়ের পরিচালন করিতে পারেন। ইহার অত্যধিকে আয়ুক্ষয় করে, পীড়া জন্মে এবং সাংসারিক নানাবিধ বিপৎপাত হইয়া থাকে।

৪। অস্বাভাবিক অভিগমনের ফল বিষময়। স্বাভাবিক অবস্থায় দ্বিগুণ পরিমাণে ইহা শরীরের ক্ষয়কারী, অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই অস্বাভাবিক ভাবের অভিনব বালকগণ ও অনূঢ়া বা বিধবা যুবতীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক বালকবালিকা এই শরীরক্ষয়কারী কার্য্যের অযথা অনুসরণ করিয়া পরিণামে সন্তপ্ত হয়। বিদ্যালয়গামী বালকগণ এই কুৎসিত আচরণ সাধন করিয়া, নিজে অকর্ম্মণ্য ও পিতামাতার সকল আশা চিরদিনের জন্য নৈরাশ্যে পরিণত করেন। এই অসদাচারে মানসিক বৃত্তি—যাহার পরিচালনই বিদ্যালাভের একমাত্র উপায়, সেই মানসিক বৃত্তি অকর্ম্মণ্য হওয়ায়, বালকের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। বাল্যকালেই হৃদয়ে কামভাব হইলে, তাহাকে যে কি ঘোর যন্ত্রণা-উপভোগ করিতে হয়, তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

অনূঢ়া যুবতী বা বৈধব্যদশাগ্রস্থ যুবতী অনেকস্থানে অসদভিপ্রায়ে অসঙ্গত কার্য্য সাধন করেন। ইহা কি নিবারণের উপায় বঙ্গদেশে আছে কি না এবং হইতে পারে কি না, তাহার বিচার এস্থলে করিব না, করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না, তাহাও বলিব না। তবে এইমাত্র বলি, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণই তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর। যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, হৃদয় কামভাবে উত্তেজিত হইতে না পারে, তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুশাস্ত্র বিধবাগণের প্রতি যেরূপ আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। মৎস্যমাংসাদি গুরুপাক তেজোবিবর্দ্ধক দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া দেহ ধারণোপযোগী এক বেলা সামান্য উপকরণের সহিত অন্নভোজন, হৃদয়ে সাত্বিক ভাব সমুদিত না হয় এজন্য সর্ব্বদা গুরুজন সমক্ষে অবস্থান এবং ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য। তাম্বুলাদির পরিবর্ত্তে তেজোবিনাশক হরিতকী সেবন প্রভৃতির অনুষ্ঠানই বিধবার একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা যুবতী হইয়াও অনূঢ়া অবস্থায় কালাতি-বাহন করেন, তাঁহাদিগেরও বিধবাজনোচিত আহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন, "অনূঢ়া কি জন্য বিধবার ন্যায় আহার ব্যবহার করিবে।" তাহার উত্তর আমরা দিব না, হিন্দুসমাজ তাহার উত্তর দিবেন। হিন্দু সমাজপতিগণ ইহার দায়ী। আমরা কেবল এই অনিষ্ট নিবারণের যে উপায়, তাহাই লিখিলাম মাত্র।

হৃদয়ে ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি ও তৎসাধনে বিরতীও অনিষ্টকর। বীর্য্যবেগ ধারণ—বীর্য্য পতনের অব্যবহিত বাধা নিতান্ত কষ্টকর এবং নানাবিধ পীড়া উৎপাদক। ডাক্তার অরিষ্টটিল্ বলেন, "হৃদয়ে কুভাব উদিত হইলে তাহার পরিতৃপ্ত সাধন করিয়া তৎপরে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।" আমরাও ইহার অনুমোদন করি।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা সাধিত হইলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। তন্মধ্যে প্রমেহ, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, পাথ্রী বহুমূত্র ও কোষবৃদ্ধিই প্রধান। ইহা ভিন্ন আরও অনেক ব্যাধি ইহার আনুসঙ্গি আছে। এমত স্থলে বীর্য্যবেগ ধারণ কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

আপনা হইতে নীচ জাতিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠা, কুরূপা, পীড়িতা এবং ঐন্দ্রিকপীড়াগ্রস্থা রমণী নিতান্তই পরিত্যজ্য! হিন্দুশাস্ত্রে এই কয়েকটির যে কোনটি অভিগমনে আয়ুহীন ও মনোবৃত্তির বিকৃতভাব এবং জীবন শক্তির হ্রাস হওয়ায় ইহা মহাপাতক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ! এই কয়েকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অস্বাভাবিক অভিগমনের বিষময় ফল একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইন্দ্রিয় পরিচালন করা একান্ত বিধেয়। এতল্লিখিত বিষয় সমুহের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু ও নীরোগ

শরীরে পুত্রকন্যার সহিত সুখভোগে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন। সংসার তাঁহার সুখের হইবে, সংসারে তিনি স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

মহামতি মীল বলেন, "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দশ হইতে পনেরটি সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার অধিক হইলে সে সন্তান জগতের কোন উপকারে আইসে না।"

কতকগুলি স্ত্রীলোকের জরায়ু "রাক্ষসীজরায়ু" নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ এই জরায়ুর এতাদৃশ ভাব যে, তাহাতে কোন কীটপূর্ণ সতেজ বীর্য্য স্থান প্রাপ্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। এই কারণেই এই প্রকার জরায়ুর নাম রাক্ষসীজরায়ু হইয়াছে। ইহাতে কখনই সন্তান জন্মে না। এইরূপ জরায়ু যে রমণীর, পুত্রমুখ দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে না। রাক্ষসীজরায়ু যাহার, তাহার লক্ষণ বলিষ্ঠ শরীর, জানু ও উরুদ্বয় মাংসল এবং দৃঢ়, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, ভোজন অপরিমিত এবং অত্যন্ত কামাতুরা। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত রমণীরও সন্তান হইতে পারে।

রমণীকে কোন ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক ব্রত লইতে হইবে, তাহাতে এমন নিয়ম থাকিবে যে, মাসের মধ্যে তিনি দুই দিন উপবাসী এবং দুই দিন ফলমূল (দুগ্ধ ভিন্ন) মাত্র আহার করিয়া থাকিবেন। ঋতুর দিনত্রয় দুগ্ধপক্ক যবচুর্ণ মাত্র আহার করিবেন।

পুরুষ—ঐ ব্রত গ্রহণ কালে স্ত্রীসহবাস একবারেই করিতে পাইবেন না। রাত্রি জাগরণ ও অত্যধিক পরিশ্রম করিবেন না, পুষ্টিকর খাদ্য আহার ও সর্ব্বদা আনন্দে অতিবাহন করিবেন। এইরূপে ব্রত উদযাপিত হইবার পরেই যে ঋতু হইবে সেই ঋতুতে স্বামীসঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হইবে সন্দেহ নাই। রমণী প্রশান্ত মনে স্বামীসম্ভাষণ এবং কামভাবে নিরীক্ষণ করিবেন। হাব ভাবাদি যাহাতে কামঋপু সমুত্তেজিত হয়, সেই সকল কার্য্য পরস্পরেই অনুশরণ কবিবেন। রমণী সরল শরীরে সমান থাকিবেন। এইরূপ নিয়মের অনুশরণ করিলে বন্ধ্যা অবশ্যই পুত্রবতী হইবেন, ইহাতে কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা থাকিবে না।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

প্রসূতি।

পূর্ব্ব প্রকার গর্ভরক্ষা হইয়া নয় মাস নয় দিন পূর্ণ হইলেই প্রসূতি প্রসব করিয়া থাকেন। গর্ভের স্থায়ীকাল নয় মাস নয় দিনই নির্দ্দিষ্ট, তবে সাত মাস হইতে উর্দ্ধ দশ মাস সময় পর্য্যন্ত প্রসব হইলেও সন্তান জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

গৃহস্বামী গর্ভিণীকে আসন্না প্রসবা দেখিলেই সূতিকাগার নির্ম্মাণ করাই-বেন। সূতিকাগার নিম্ন প্রকার হইবে। সূতিকাগৃহ লম্বে পনের ও প্রস্থে ছয় হাত হইবে। এমন স্থানে সূতিকাগার নির্ম্মিত হইবে, যেখানে উত্তম রূপ বায়ু প্রবেশ ও নির্গত হইতে পারে। সূতিকাগৃহ সমতল ও উচ্চ হওয়া আবশ্যক। সূতিকাগার শীত ও শিশির হইতে দূরে রাখিতে হইবে এবং যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। গৃহ-স্বামী এই সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

যদি কেহ নরকচিত্র দেখিতে চাও, তবে হিন্দুর সূতিকাগারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। চতুর্দ্দিকে ভস্মরাশি বিক্ষিপ্ত—পুরীষ শোণিতের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, প্রসূতি সেই শোণিতসাগরে ভাসমানা! সর্ব্বাঙ্গ শোণিতরাগে রঞ্জিত! এমন নরকভোগ—এমন নাতিপ্রশস্ত অন্ধকার গৃহে বাস, কোন পাপে প্রসূতি এ যন্ত্রণাভোগ করেন তাহা কে বলিতে পারে। গৃহস্থ গৃহের যে অংশটি অপরিচ্ছন্ন অকর্ম্মণ্য—সেই স্থানটিই সূতিকাগার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন, ফলও তদ্রূপ হয়। আজ শিশুর উদরের পীড়া, কাল শিশু স্তনপান করিল না, পরশ্ব জ্বর, তারপর ভূতপ্রেতের উপদ্রব ত আছেই! এ সকল বাধা এ সমস্ত পীড়া—এ সমস্ত যন্ত্রণা যদি কুসুমকোমল শিশুর সহ্য হইল, তবেই তাহার জীবন কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হয়। এসেটিক বিস্তারচাস বলেন, "বঙ্গের এক অষ্টমাংশ সন্তান সূতিকাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" সূতিকা-গারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী যে কিরূপ বিষময় ফল প্রাপ্ত হন, তাহা কি আর দেখাইতে হইবে?

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া

দিবে, পরে একটি জোলাপ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রসূতি সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবেন, লঘু অথচ বলকারক আহার্য্য ব্যবহার করিবেন। স্নান ও রসস্থ দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ. সপ্তাহকাল স্নান করিবেন না। একাদশ ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ দিবস পরে প্রসূতি সূতিকাগার হইতে বাহির হইবেন। সেইদিন নিজে ও সন্তানকে উর্ত্তমরূপে সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইবেন।

এই হইতে পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত শিশুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্নান, ভোজন, শয়ন ও পরিচালন প্রভৃতি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাহার শরীর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও দিব্য-লাবণ্যসম্পন্ন হয়।

শিশুর কথা কহিবার ক্ষমতা হইলে প্রসূতি সৎকথা শিখাইবেন। বাল্য-কালে অধিকাংশ সন্তানই অন্যান্য দুষ্ট বালকদিগের সহিত সংসর্গ করিয়া চরিত্র দূষিত করিয়া ফেলে। যাহাতে সেই সমস্ত দুষ্ট বালকের সংসর্গে পড়িয়া সন্তান দুষ্ট এবং দুশ্চরিত্র না হয়, মাতা তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তান কুম্ভকারের কর্দ্দমের ন্যায়, তাহাকে যে ভাবে গঠন করিবে, সন্তান সেই ভাবেই গঠিত হইবে। সন্তানের দুশ্চরিত্রতা বা স্বাস্থ্যহীনতার জন্য পিতা মাতাই একমাত্র দায়ী। বলা বাহুল্য যে, সন্তান পিতা মাতার তাচ্ছিল্যেই দুষ্ট দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে।

তৎপরেই শিক্ষা।—হিন্দু শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ষষ্ঠ বর্ষই বিদ্যা শিক্ষার সময়। পিতা মাতা অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সন্তানকে নীতি শিক্ষাও দিবেন। কেন না নীতি বিষয়ে জ্ঞান না জন্মিলে তাহার সংসার সুখের হইতে পারে না। সংসার নীতি, সংসার-বিজ্ঞান (Social Science) প্রকৃতরূপে শিক্ষা না করিলে সংসারে অনেক অভাব পরিলক্ষিত হইবে। সন্তান যেন সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হন। মানসিক শিক্ষা মানসিক উন্নতির সহিত যেন শারীরিক উন্নতিও সম্পাদিত হয়। সংসার শিক্ষার সহিত বিদ্যালয়ে গণিত, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতির শিক্ষা যেমন আবশ্যক; সেইরূপ পিতৃভক্তি, গুরুজন সেবা, আত্মীয় স্বজনের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি চরিত্রের উৎকর্ষসম্পাদক যে যে নীতি আবশ্যক, পিতা যত্ন সহকারে সেই সমস্ত সন্তানকে শিক্ষা দিবেন।

পুত্র কন্যা সমভাবে শিক্ষা ও সমভাবে প্রতিপালন করাই পিতা মাতার কর্ত্তব্য। (১) কেননা, পুত্র ও কন্যা উভয়কেই তুল্যরূপে শিক্ষিত ও তাহাদিগের জীবনে সুখসৌভাগ্যের সংস্থান করিবার জন্য পিতামাতাই শাস্ত্রানুসারে আবদ্ধ।

সন্তান উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইলে, তাহার বিবাহদান পিতার কর্ত্তব্য। কিন্তু সে সময়ে পিতার বিবেচনা করা উচিত যে, পুত্রকন্যার ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান তাঁহার পুত্রের সাধ্যায়ত্ত কি না। পিতার উপযুক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেই যে তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদিত হইল তাহা নহে, সংসারের উন্নতি ও অবনতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া, যদি সংসারের অনিষ্ট হয়, নিজের নিরক্ষর উপায় বিহীন সন্তানের বিবাহ দিয়া, সংসারে দরিদ্রের ভার যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে, সে কার্য্য করা কোন অংশেই কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে সংসার সুখের হয়, পুত্র কন্যাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, পিতা পুত্রের বিবাহ দিবেন।

আবার আর একটী সংসারের সূত্রপাত হইল। আবার আর একটী সংসার সংসারী হইয়া, সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিল। এইরূপ সংসারশ্রেণী সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে। কত সংসার সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য নব উৎসাহে সংসারসাগরে দেহতরী ভাসাইতেছে, কিন্তু জানে না যে, এই তরণী অনুকূল পবনভরে সুখপারে নীত হইতে পারে, আবার ভীষণ প্রভঞ্জনে অশান্তি উর্ম্মিমালায় আঘাতিত হইয়া, সংসারসাগরে ডুবিলেও ডুবিতে পারে, তবে পাঠক! যদি অনুকূল পবনভরে সংসার পারে যাইতে চাও, তবে এই লিখিত বিষয়গুলির অনুসরণ কর, সংসার সুখের হইবে।

---

(১) এই উক্তি মহামতি জন ষ্টুয়ার্ট মীলের। এ সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রকারের উক্তি ;—

কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।

দেয়া বিদুষেবরায় ধনরত্ন সমন্বিতম্॥

পঞ্চম প্রবন্ধ।

স্ত্রীব্যাধি।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি একটু বিশদরূপে বলা আবশ্যক।

ঋতু।—ডিম্বকোষ ও জরায়ুর প্রধান কার্য্য ঋতু। যৌবনকালে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এই দুই আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয় উত্তম-রূপে ক্রিয়াক্ষম থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের ক্রিয়া ক্রমাগত না হইয়া সময় বিশেষে হইয়া থাকে।

নিরাময় অবস্থায় যুবতীদিগের জরায়ু হইতে যে শোণিত নিঃসৃত হয়, তাহাকেই ঋতু বলে। যে স্ত্রীর মাসান্তে যথানিয়মে শোণিত নির্গত হয়, তাহারা গর্ভবতী হইবার উপযুক্ত। আজ কাল একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকারও ঋতু হইতে দেখা যায়, কিন্তু জানা আবশ্যক যে, যাহার যত শীঘ্র ঋতু হয়, তাহার তত শীঘ্রই ঋতু রুদ্ধ হইয়া, সন্তান জন্মিবার আশা সমূলে উৎপাটীত করে। ইহাতে ঋতুমতীর শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইয়া যায়। অত্যধিক শোণিতস্রাবের জন্য এবং অত্যধিক ডিম্ব বিনির্গত হওয়ায় গর্ভ-ধারণের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্দ্ধ পোয়া হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। এই শোণিত নিতান্ত তরল ও সামান্য আমিষগন্ধযুক্ত।

ঋতু হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, দৌর্ব্বল্য, চক্ষুর চতুর্দ্দিকের বিবর্ণতা, উরু ও কটীতে যাতনা বোধ, স্তনাগ্রে ব্যথা বিবেচনা হয়। শোণিত নির্গত হইয়া গেলে, উপরোক্ত যন্ত্রণার লাঘব হইতে থাকে।

প্রথম রজোযোগের অব্যবহিত কাল পরেই, শারীরিক ও মানসিক কতকগুলি বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীর পুষ্ট, গঠন সুগোল ও শোভাযুক্ত, নিতম্বদেশ প্রসারিত, স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত এবং সমস্ত অবয়ব সুদৃশ্য ও লাবণ্যযুক্ত হয়। মানসিক পরিবর্ত্তনও যথাযথ রূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাল্যচাপল্য পরিহার পূর্ব্বক সংসার কার্য্যে মনোনিবেশ, সর্ব্বদা বিনীত ও গম্ভীরভাবে অবস্থান, বর্ত্তমান অবস্থান্তরের উপযোগী সুখসম্ভোগ

লালসা তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া থাকে। ঋতুর কারণ অনেকে অনেকরূপ ব্যাখ্যা করেন। ঋতুর চরম কারণ তাঁহারা দুই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বলেন, গর্ভাবস্থায় যে শোণিত দ্বারা ভ্রূণ নির্ম্মিত ও পুষ্ট হইত, গর্ভাভাবে সেই শোণিত অনাবশ্যক হইয়া যাওয়ায়, উহা মাসান্তে এক একবার বহির্গত হইয়া, গর্ভাশয়কে ধৌত করতঃ উহা গর্ভধারণের উপযোগী করে। এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গর্ভধারণের ক্ষমতা বিজ্ঞাপিত করাই ঋতুর প্রধান উদ্দেশ্য।

ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া।—(menstrual disorder) যথা,—রজোরোধ, রজকৃচ্ছ, অত্যধিক রজঃনিঃস্বরণ এই তিনটী প্রধান। ইহাদিগের চিকিৎসা ও কারণ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

রজোরোধ।—(Ammenorrhea) ইহা দুই প্রকার। ১ম, যৌবন অবস্থায় পদার্পণ করিলেও, ঋতু হয় না। ২য়, ঋতু হইয়া, কিছুদিন পরে আবার বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন স্ত্রীলোক এই পীড়ায় পীড়িত হইলেও, দৈহিক কোন অবনতির লক্ষণ জানিতে পারা যায় না, আবার কোন কোন স্ত্রীলোক অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কৃশ হইয়া যায়। ঋতুকালে অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে, ইহাদিগের শরীরে ঋতু লক্ষণ দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদিগের ঋতুর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় অথচ শোণিত স্রাব হয় না, তাহাদিগের চিকিৎসা সহজ। ঋতুর লক্ষণ জানিতে পারিলেই পীড়িতার নাভী পর্য্যন্ত ডুবাইয়া, গরম জলের টবে বসাইয়া রাখিবে। তল-পেটে কম্বল বা ফ্লালেনের পটি লাগাইবে। পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিতে দিবে। উলট কম্বলের শিকড়ের ছাল অর্দ্ধরতি, তুঁতে সিকি রতি একত্রে মিশাইয়া, প্রতিদিন তিনবার করিয়া ব্যবহার করাইবে। এই ঔষধ পরীক্ষিত। আর যাহাদিগের শরীরে ঋতুর কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন তাহার আর অব্যাহতি নাই।

মানসিক কষ্ট, হিম সেবন, শারীরিক কোন গুরুতর পীড়া স্ত্রীদেহে সঞ্চারিত হইলে, ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। উষ্ণ পানীয়, রেচক ও স্বেদ বৃদ্ধিকর ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রজকৃচ্ছ।—(Dysmenourhea) সচরাচর ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্কা বিধবা বন্ধ্যাদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। ডিম্বকোবের

শিথিলতা এই রোগের প্রধান কারণ। * ঋতুর বিরাম সময় পুষ্টিকর আহার ও প্রশস্ত স্থানে ভ্রমণ এবং লৌহঘটিত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

অত্যধিক রজোনিঃস্বরণ।—(Menorrhagia) এই রোগে অত্যধিক শোণিত নির্গত হইয়া, ঋতুমতীকে বড়ই ক্ষীণ করিয়া তুলে। কোন কোন স্ত্রীলোকের মাসে দুইবার ঋতু হয়। পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ অত্যন্ত স্তনপান করান, অতিরিক্ত স্বামীসঙ্গ এবং আকস্মিক মনস্তাপ এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগ সঞ্চারিত হইবামাত্র, এক রতি অহিফেন সেবন করাইয়া, উত্তম ফললাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এ দেশীয় বাঘ ভেরাণ্ডার ক্ষীর তুলায় করিয়া, জরায়ুর নিম্নে (Cervix-Uteri) স্থাপন করিলে ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

জীবসৃষ্টি।—স্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গে কয়েকটী নৈসর্গীক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া, একটী স্বতন্ত্র নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া, এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কয়েকটী কল্পনা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এক শ্রেণীর উক্তি,—স্ত্রীলোকের ডিম্বেই কেবল জীবের সৃষ্টি হয়। পুরুষের শুক্র কেবল ঐ ডিম্বের রচিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। পিথাগোরস ও এরিষ্টটিল এই মতের সমর্থন করেন। (১) আর এক শ্রেণীর উক্তি,—শুক্র দ্বারা নূতন জীবের সজীব অংশ উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-লোকের শোণিত কেবল ভৌতিক দেহের পরিপোষণ করে মাত্র। (২) আর এক শ্রেণীর মত,—স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমকালে উভয়ের বীর্য্য স্খলিত হইয়া, একত্রে মিশ্রিত হয় এবং এক সময়ে জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ভ্রূণের সঞ্চার ও পরিবর্দ্ধন করে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে যাহা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস যোগ্য, তাহাও লিখিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের ডিম্বাধারের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কোষ (Grafian Vesicle) আছে। সংসর্গের পর ঐ কোষের কয়েকটী পরিবর্ত্তন হয়। ঐ ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব বহির্গত হইয়া, ডিম্বকোষকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ডিম্ববাহক প্রণালী দিয়া,

* (Vide) Dr, Tyler's "Book of medicine, Page 255,

(১) Vide Aristale's guide of genaretion of men,

(২) Mr, Gelean and Mr, Horpie's Lecture on genretive organs,

জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ ডিম্ব মধ্যে ভবিষ্যজীব অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এদিকে পুরুষের অণ্ডকোষস্থ শুক্রোৎপাদক গ্রন্থিতে যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহা শুক্রাধারে (Vesicutoe seminalis) থাকিয়া শৃঙ্গার কালে স্ত্রীর যোনী মধ্যে কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ শুক্র হইতে এক বা ততোধিক কীট (Spermatoza) জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করতঃ ডিম্ববাহক প্রণালী দিয়া পূর্ব্বক্ত ডিম্বকে জরায়ু মধ্যে সিক্ত করে। সেই ডিম্বই ২৮০ দিবস জরায়ু মধ্যে অবস্থিতি করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং পরে ভুমিষ্ঠ হয়।

এই অভিনব মতের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য আছে। হিন্দু চিরদিন জানিয়া আসিতেছে, পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর শোণিতে সন্তানের জন্ম। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই সামধিক বিশ্বাস্য।

গর্ভ সঞ্চার।—গর্ভ সঞ্চার হইবামাত্র জরায়ুতে যে একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা সর্ব্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হইয়াছে। ডিম্ব নিষেকের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে শোণিত সংগ্রহ হইতে থাকে এবং জীব পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। বিধাতার এমনই অত্যাশ্চর্য্য কৌশল যে, ডিম্ব জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই এই অলৌকিক পরিবর্ত্তন স্বতঃই আরম্ভ হয়।

নিষিক্তডিম্ব জরায়ু মধ্যে থাকিয়া যতই পরিপুষ্ট হইতে থাকে, ততই জরায়ুর আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে জরায়ুর স্বাভাবিক পরিমাণ যদি অর্দ্ধ ছটাক হয়, তাহা হইলে প্রসব কালে উহার পরিমাণ ১২ কি ১৩ ছটাক হইয়া থাকে। এক হইতে পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত জীবের শরীরের ভীত্তি গঠিত হয়। পঞ্চম মাস হইতে শরীর সমাধা হইয়া গ্রীবা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৪র্থ মাস পর্য্যন্ত ভ্রূণ সহ জরায়ু বস্তিকোটরেই অবস্থিতি করে, ৬ষ্ঠ মাস হইতে নাভি পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। ৭ম মাসে উদর গোলাকার হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। এবং ৮ম ও ৯ম মাসে আর অধিক প্রশস্ত না হইয়া কেবল অবয়ব গোল হইতে থাকে এবং পরিশেষে জীব ভুমীষ্ট হয়।

গর্ভের লক্ষণ।—কয়েকটি কারণ দর্শনে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না জানা যায়। তাহার কয়েকটি লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সাধারণতঃ এই কয়েকটি লক্ষণ দেখিলেই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন। ঋতু বন্ধ দেখিয়াই উহা গর্ভ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ঋতু বন্ধ।—ঋতু বন্ধ হইয়া একমাস কাল পরেই সচরাচর লোকে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলে ভ্রমে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কোন কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়াও দুই তিন মাস পর্য্যন্ত ঋতুমতী হয়। কোন কোন স্ত্রীলোক তিন মাসের কি তাহারও অল্প বয়স্ক শিশুর স্তনপান করাইতে করাইতে গর্ব্ভবতী হয়। একবার প্রসবের পর দ্বিতীয় বার ঋতুমতী হইবার অবসর থাকে না, সুতরাং ঋতু বন্ধ হইয়াছে বলিয়া গর্ব্ভসঞ্চারের অনুমান নিশ্চয় নহে।

বমনেচ্ছা।—গর্ব্ভ সঞ্চার হইবার পাঁচ কি ছয় সপ্তাহ পর হইতেই বমনেচ্ছা হইয়া থাকে। এই বমনেচ্ছা তৃতীয় মাসে নিবৃত্তি পায়! কখন কখন প্রসব না হইলে আর বমন নিবারণ হয় না, জরায়ুর অন্যান্য পীড়াতেও বমনেচ্ছা হইয়া থাকে, সুতরাং কেবল মাত্র বমনও গর্ব্ভসঞ্চারের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

স্তনবৃদ্ধি ও দুগ্ধ সঞ্চার।—গর্ভের দুই তিন মাস পরেই স্তন যুগল সুদৃঢ় ও স্থূল হইতে থাকে। স্তনের উপরিভাগস্থ বর্ত্তুলবৎ চুচুক সুড় সুড় করে এবং পঞ্চম মাসের স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়। যে সমস্ত স্ত্রীর পীড়ার কারণে ঋতু বন্ধ হয় তাহাদিগের স্তনের এ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না।

গর্ভ হইলে স্ত্রীলোকের কামেচ্ছা বলবতী হয়। যোনীমুখে একপ্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত আটাবৎ পদার্থ সর্ব্বদাই অনুভুত হয়। আবার কখন কখন যোনীমুখ দৃঢ় এবং আলোহিত বর্ণ ধারণ করে। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও পাতা সামান্য ফুলা ফুলা বিবেচনা হয়। এই সমস্ত কারণ এবং লক্ষণ দর্শনে অভিজ্ঞব্যক্তি গর্ব্ভ সঞ্চারের বিষয় অনায়াসেই পরিজ্ঞাত হয়েন।

গর্ভিণীর পীড়া।—গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী নানাবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া থাকেন। এই সময় দুই একটি এমন দুশ্চিকিৎসা রোগ সংক্রামিত হয় যে, তাহাতে জীবন রক্ষা ও গর্ব্ভস্থ সন্তান রক্ষা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। এজন্য কয়েকটি প্রধান রোগের কারণ ও চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

বমন।—এই বমনের আধিক্যে গর্ব্ভিণীর শ্বাসক্রিয়া অনেকক্ষণ রুদ্ধ

থাকিলে গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হইতে পারে। বমনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ও উদরের সঞ্চালনে সন্তান আঘাত প্রাপ্ত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিয়া গর্ভিণী মৃত্যু মুখে নিপতিতা হয়েন, অথবা গর্ভস্থ সন্তান অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ব্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ বৈকল্যও হইতে পারে। অতএব অধিক বমন যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে অতি মৃদুবিরেচক ব্যবহার করাইবে। পরে আড়াই গ্রেন বিসমথ ও পেপ্‌সিনের বটিকা প্রত্যহ তিনবার করিয়া ব্যবহার করাইবে। দুগ্ধ রুটী, মাংসের যুষ ও সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ খাইতে দিবে। অর্দ্ধ গ্রেন পরিমাণে অহিফেন বটিকা সেবন করাইলেও উপকার হইতে দেখা যায়।

ভেদ ও আমাশয়।—ইহা সত্বর নিবারণ না করিলে গর্ব্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। অতএব রোগের সূত্রপাতেই মিশ্রির সহিত বিস্‌মথ, লডেনম, ক্লোরোডাইন প্রভৃতি অল্পমাত্রায়। ২।১ বার ব্যবহার করাইলে আশু নিবৃত্ত হইবে। ডাইলিউট সল্‌ফিউরিক এসিড ১৫ ফোটা, টিংচর ওপিয়াই ২০ ফোটা প্রতি দিন ৩।৪ বার সেবন করাইলে ভেদ নিবারণ হইয়া থাকে।

আমাশয় হইলে ১০ গ্রেন ডোবার্স পাউডার, ১ গ্রেন ইপিকা অর্দ্ধ গ্রেন কোলেমেল মিলাইয়া প্রতিদিন ৩।৪ বার সেবন করাইবে। পথ্য জলসাগু। পুরাতন হইলে ঘোলভাত, পুরাতন তেঁতুলের অম্ল, দধি, বেলের সরবৎ ইত্যাদি ব্যবস্থা। এই পথ্য গুলিও এক একটি প্রধান মুষ্টিযোগ।

মূর্চ্ছা।—দুর্ব্বল কোমলাঙ্গী বা অল্প বয়স্কা যুবতী গর্ভবতী হইলে তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। এ মূর্চ্ছা কখন কখন ৩।৪ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। মূর্চ্ছা হইলেই নাসিকার নিকটে কর্পূরের শিশি ধরিবে এবং মুখে ও চক্ষুতে শীতল জলের ছিটা দিবে। তাহা হইলেই ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইবে। মূর্চ্ছার অবসানে অল্পমাত্রায় টিংচর বেলেডোনা, একোনাইট কি ডিজিটেলিস্‌ ব্যবহার করাইবে।

অনিদ্রা।—দুই এক গর্ভবতী প্রসবের ভয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন! গর্ব্ভবতীর সুনিদ্রা না হইলে গর্ব্ভস্থ সন্তানের শারীরিক উন্নতি হয় না; সুতরাং সময় সময় গর্ভপাত, সন্তানের অঙ্গ

বৈকল্য এবং অতি রুগ্নতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। অতএব গর্ব্ভিণী যাহাতে সুনিদ্রা উপভোগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। ৩০ গ্রেণ হাইডেট্ অব্ ক্লোরেন, ১০ গ্রেণ ব্রোমাইড অটাসিয়ম, সিরপ্ বা জলের সঙ্গে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করাইলে সুনিদ্রা হইবে। ২ গ্রেণ অহিফেণ সেবন করাইলেও উল্লিখিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বন্ধ্যাত্ব।—কারণ ভেদে বন্ধ্যাত্ব দুই প্রকার। প্রথম ক্রিয়াত্মক ২য় যান্ত্রিক। প্রথমটির প্রতিকার সহজ সাধ্য, কিন্তু দ্বিতয়টির প্রতিকার একপ্রকায় অসম্ভব। ডিম্বকোষের অভাব, সঙ্কুচিত কি ছিদ্রযুক্ত জরায়ু, শুষ্ক শোণিতবাহি নল, ডিম্বকোষের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল গুলির অভাব থাকিলে গর্ভ্ত সঞ্চার হওয়া একান্ত অসম্ভব। জরায়ুর মধ্যস্থিত উত্তর কেন্দ্রে অন্য কোন পদার্থ জন্মিলে সে বন্ধ্যাত্ব প্রতিকারও একান্ত অসম্ভব। জরায়ূর এমন অনেক অবস্থান্তর ঘটে, যাহাতে সন্তান জন্মিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি যোণীর অব্যবহিত পশ্চাৎস্থিত অস্থিদ্বয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যোণীগহ্বরের আয়াতন হ্রাস করিয়া ফেলে, কি যদি যোণীগহ্বরের পশ্চাতস্থিত যোণীকীলকে টিউমার ফিতের ন্যায় চর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যোণীমুখ ক্ষুদ্র করে, তাহা হইলে এই উভয়বিধ রোগ অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করা যাইতে পারে।

আর একটি বিষয়ে অনেক স্ত্রীলোক প্রকৃত বন্ধ্যা না হইয়াও সন্তান মুখ দর্শনে অসমর্থ হয়েন। অযৌক্তিক বিবাহে প্রায়ই এই মহদনিষ্ট সংঘটীত হইয়া থাকে। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর সামর্থ, শারীর যন্ত্রের স্ফুর্ত্তি ও অবয়বে দীর্ঘ হইলে সন্তান জননের অন্তরায় উপস্থিত হয়।- কিন্তু সেই স্ত্রী তাঁহার তুল্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক রমিত হইলে নিশ্চয়ই গর্ভধারণ করিতে পারিতেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্য বিবাহের সময় বরকন্যার শারীরিক স্ফুর্ত্তি ও দৈহিক পরিমাণ দেখা একান্ত আবশ্যক। স্বামী স্ত্রীর অধিক সঙ্গমে সন্তান লাভ হয় না, এবং যে পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে অযথা ইন্দ্রিয়পরিচালন করেন, বাল্যকালে অস্বাভাবিক উপায়ে অত্যধিক বীর্য্য ক্ষয় করেন, সন্তানলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। কেন না পূর্ব্বে বীর্য্যের সহিত সমধিক কীট ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়ায় তৎকালে বীর্য্যের অল্পতা

ও কীট শূন্যতা হেতু যথোপযুক্তভাবে রমিত এবং বীর্য্য জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও সন্তানলাভের সম্ভাবনা থাকে না।

জরায়ুতে ছিদ্র থাকিলে, বীর্য্য জরায়ু হইতে স্খলিত হইয়া, পাকস্থলীতে পতিত হয় এবং তাহাতে বমন, হিক্কা ও অজীর্ণ প্রভৃতি হইয়া, পরিশেষে বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সন্তান হয় না। শ্বেত ও রক্তপ্রদর বন্ধ্যাত্বের একটী প্রধান কারণ। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা ইহা প্রতিকার করা সহজ সাধ্য সন্দেহ নাই।

অনেকে বাল্যকালে বা বিবাহের পূর্ব্বে অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনে বহুল পরিমাণে কীট নষ্ট করিয়া, শেষে বিবাহিত হইয়া, মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রাপ্ত হন, যুবতী ভার্য্যার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়া থাকেন। পিতামাতাও পৌত্র মুখ দর্শনে অসমর্থ হইয়া, ক্ষুণ্ণমনে কালাতিপাত করেন। ইহা নিবারণেরও উপায় আছে।

স্ত্রী কোন সাময়িক ব্রত গ্রহণ করিবেন। তাহাতে প্রতিমাসে একদিন ফল মূলাহার, একদিন হবিষ্য ও একদিন উপবাসের ব্যবস্থা থাকিবে। স্বামীও তৎকালে ইন্দ্রিয়সেবনে বিরত থাকিয়া, সর্ব্বদা পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করিবেন এবং প্রফুল্লমনে অতিবাহিত করিবেন। স্বামীর বীর্য্যের তারতম্যে ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে যে কোন ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্ত্রীসঙ্গ করিলে, তাহাতে সন্তান জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। *

গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু।—গর্ভস্থ সন্তান মাতার পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি রোগ আপনা হইতে ভ্রূণের শরীরে সংক্রমিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হইলে, উহার সঞ্চালনীশক্তি নষ্ট হয়, নাভিকুণ্ড হইতে সমুচ্চ ভগচর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়ে। গর্ভিণীর উদর শীতল ও ভারবোধ হয়। স্তনদ্বয় অকস্মাৎ নরম হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যুর কারণ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অতঃপর যেরূপে হউক, সন্তান নির্গত করিবার ব্যবস্থা করা অতি আবশ্যক। কেননা, গর্ভমধ্যে মৃত্যু ভ্রূণ অধিকদিন থাকিলে, উহা বিকৃত হইয়া, গর্ভিণীকে পর্য্যন্ত মৃত্যুমুখে নিপতিত করে। বিধাতার অনুগ্রহ ও বিধি অনুসারে

* এটী আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠক ইচ্ছা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আপনা হইতেই মৃত ভ্রূণ নির্গত হইয়া যায়। তবে যেনখানে নির্গত হইতে বিলম্ব দেখা যায়, তথায় অন্য পথ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গর্ভপাত।—দুইটী কারণে গর্ভপাত হয়। ১ম মাতৃজ কারণ, ২য় অণ্ডজ কারণ। মাতার কোন আকস্মিক বিপতপাত, অধিক স্বামীসঙ্গ, কোন সংক্রামক পীড়ায় অধিকদিন পীড়িত থাকা, দুর্ব্বলতা ও অসার চিন্তা গর্ভপাতের প্রধান কারণ। আর ডিম্বের অপরিণতি, অস্থানিক গর্ভ, শোণিতাভাব হেতু ভ্রূণের অপরিপকতা প্রভৃতিও গর্ত্তপাতের কারণ। গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে, গর্ভিণী শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন, সর্ব্বাঙ্গে সামান্য বেদনা, কটীদেশের ব্যথা,—যোনীদেশের প্রদাহ, উরু ও উরুসংঘাত স্থানের কম্পন, প্রদাহ হইতে থাকে। প্রথমে গর্ভ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। গর্ভিণীকে ২০ গ্রেহ অহিফেন কি ৪০।৫০ ফোঁটা লাডেনম তিন চারিবারে সেবন করাইবে। কঠিন শয্যায় শয়ন করাইবে এবং যোনীদেশে বরফ বা শীতল জলের পটী দিবে। ভ্রূণ যদি ইতিমধ্যে স্থানচ্যুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার নির্গমন পথ পরিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। যে হেতু স্খলিত ভ্রূণ যথাস্থানে পুনঃ স্থাপনের কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

অসার গর্ভ।—মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইয়া গর্ভ হয়, উদরে পরিধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অরুচি ও বমন হয়, স্তনযুগল দৃঢ় হয়। ইহাতে সকলেই বিবেচনা করেন, ইহা গর্ভের লক্ষণ, কিন্তু কিছুদিন পরে গর্ভিণীর গর্ভ অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হয় গর্ভিণী অকালে বিকৃত শোণিতমাত্র প্রসব করেন। ঋতুকালে শোণিতের কিয়দংশ নির্গত হইতে না পাইয়া, তাহা ডিম্ব মিশ্রিত হইয়া, জরায়ু মধ্যে স্থান গ্রহণ করে। শোণিতবাহী নল যথাসময়ে বীর্য্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বা স্বতঃই রুদ্ধমুখ হইয়া, যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পূর্ব্বোক্ত শোণিতসিক্ত ডিম্ব জরায়ু মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া, ক্রমে সঞ্চারিণী শোণিতদ্বারা পুষ্ট হইয়া, কতকগুলি বিকৃত শোণিত পিণ্ডরূপে পরিণত হয় এবং অকালে উহা নির্গত হইয়া যায়। অনেক গর্ভিণী এইরূপ অসার গর্ভে বড়ই মনস্তাপ পাইয়া থাকেন। রজোরোধের ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসা করিলেই এই পীড়া প্রশমিত হইতে পারে।

স্বেচ্ছানুসারে পুত্রকন্যা উৎপাদন।—সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত কোন

বিধির প্রতিকূল মত অবলম্বন করিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তাহা জ্ঞাত আছি। তথাপি প্রকৃত পথ অনুসরণ করিলে বোধ হয়, সাধারণে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই আবশ্যকানুসারে পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করা যাইতে পারে, ইহা আমাদিগের শাস্ত্রেও প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা, কন্যা পুত্র জন্মিবার কারণটী অবগত হইলেই, ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস হইবে। সন্তান উৎপাদনের প্রকৃত কারণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে উপায়ে সন্তান উৎপাদিত হয়, সেইরূপ প্রণালীতে ঋতু স্নানের চতুর্থাদি যুগ্মদিনে রমিত হইলে; পুত্র এবং পঞ্চমাদি অযুগ্মদিনে রমিত হইলে, কন্যা সন্তান হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে ইচ্ছানুরূপ সন্তানোৎপাদন পক্ষে বিরতও থাকা যাইতে পারে। বীর্য্য ত্যাগকালে সাবধান হইবে, সন্তান উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। যে নলপথে বীর্য্য জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে, বীর্য্য ত্যাগকালে যাহাতে উহা সেই নলপথে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা অতি সহজ। ইহা সকলেই মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

মহামতি ম্যালথস্ স্বয়ংই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ নিদর্শন করিয়াছেন। তিনি একটীমাত্র পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি এই শাস্ত্রের যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্বয়ংই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তৎপরে প্রকাশ করেন। এমত স্থলে তিনি বারদ্বয় ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গ করেন নাই, ইহা কদাচ বিশ্বাস্য নহে।

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্ত্রীসঙ্গ করিয়া, অনেকে যে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নহে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই ফল পাইবেন। স্ত্রীসঙ্গের ব্যতিক্রমই সন্তান উৎপাদনের অন্তরায় এবং উপযুক্তরূপে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে এবং স্বামী স্ত্রীর দৈহিক অবস্থা তুল্যরূপ হইলে, সন্তানোৎপাদনে যে কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না, ইহাও নিশ্চয়।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

নবপ্রসূত শিশুপালন।

নব প্রসূত শিশুপালন অত্যন্ত কঠিন। গর্ভস্থ সন্তান যখন প্রথম প্রসূত হয়, তখন উহা শোণিতপিণ্ড বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই রক্তপিণ্ডকে সুগঠিত করিতে বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক। অনেক নবপ্রসূত শিশু সূতিকাগারে বা সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়াই যে পীড়িত এবং কেহ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তাহা কেবল প্রসূতী ও ধাত্রীর অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্য ভিন্ন অন্য কারণ নাই। উপযুক্ত ধাত্রীর গুণে নবপ্রসূত শিশু শীঘ্র বর্দ্ধিত এবং নিরাপদে থাকিতে পারে। এজন্য নব-প্রসূত শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় এবং শৈশবজাত পীড়ার প্রতিকারের উপায় ধাত্রীর অবশ্যজ্ঞাতব্য। ধাত্রীরা যদিও অনেক বিষয়ে পরিপক্ক, তথাপি বর্ত্তমান কালোপযোগী চিকিৎসা তাহারা জানে না। তাহাদিগের পূর্ব্ব শিক্ষা বর্ত্তমান কালোপযোগী নহে। সুন্দরী শিক্ষিতা প্রসূতী সকল সময় তাহাদিগের চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইতে প্রস্তুত নহেন, এজন্য তাহারা যাহাতে নিরাপদে বর্ত্তমান কালোপযোগী ঔষধ ব্যবহার করিয়া, বিনাকষ্টে সুস্থ হইতে পারেন, তাহার বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠমাত্রেই ক্রন্দন করে। ইহার কারণ, গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়াই, শীতল বায়ু গাত্রসংলগ্ন হইবামাত্র, শিশুর শীত বোধ হয়, এজন্য ক্রন্দন করে। অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, উষ্ণজলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অতি সাবধানে ধৌত করিয়া দিয়া, সুকোমল বস্ত্রদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিবে। শিশুর গাত্রে যে সমস্ত মলিনতা দৃষ্ট হয়, ধৌতকালে সেগুলি তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিবে।

প্রসূতি সুস্থ হইলে, শিশুকে স্তনপান করাইবেন। প্রথমতঃ প্রসূতির স্তনে যে দুগ্ধ সঞ্চার হয়, তাহাতে এমন পদার্থ নিহিত আছে যে, তাহা পান করিলেই শিশুর বাহ্য হইবে।

নাড়ী।—ভূমিষ্ঠ মাত্র ১ কি ১৷৷০ ইঞ্চি পরিমাণে নাড়ী বাদ দিয়া কাটিয়া দিবে এবং সেই কর্ত্তিত স্থানে নেকড়া পোড়াইয়া, ভস্ম করিয়া ঐ

ভস্ম দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। প্রতিদিন দুই তিনবার ঐ ভস্ম দিলে অতি সত্বরেই উহা শুষ্ক হইয়া খসিয়া পড়িবে।

পেঁচো। অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রন্দন করে না। বাহ্য হয় না, স্তনপান করে না। অথবা হয় ত কেবল কাঁদিতে থাকে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা পেঁচো নামক ভূত বিশেষের দৃষ্টি শিশু প্রতি পতিত হইয়াছে বিবেচনা করেন। এই যুক্তি স্থির করিয়া তাঁহারা ওঝা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করেন। কোন কোন ওঝা ইহার প্রতিসেদোপযোগী মুষ্টিযোগ দ্বারা শিশুকে নিরাময় করে, কেহ বা ভণ্ডামী করিতে গিয়া শিশুর জীবন নষ্ট করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কারণ, শিশুর মস্তকের অযথা শোণিত পরিচালন হেতু বালক বড় যাতনা পায় এবং সেই জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। অথবা শ্বাস যন্ত্রের ধীর ধীর গমন নিবন্ধন নীরবে শিশু অবস্থান করে বা সবলে শ্বাস আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। শিশুর এইরূপ অবস্থান্তর হইলে মস্তকে সামান্য জল সেচন করিবে এবং কোন কৌশলে স্তন পান করাইতে চেষ্টা করিবে।

দুগ্ধ। প্রসূতীর স্তনে দুগ্ধসঞ্চার না হইলে সদ্যঃ গো দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধাংশ উষ্ণজল ও অল্প মিশ্রিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে পান করাইবে।

দুগ্ধবতী ধাত্রী। প্রসূতীর দুগ্ধে শিশু অতি সত্বর বৰ্দ্ধিত হয়, এবং জরায়ু অতি সত্বরই শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাতে উভয়েরই উপকার। কিন্তু প্রসূতীর স্তনে যদি উপযুক্ত দুগ্ধ সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে দুগ্ধবতী ধাত্রীর আবশুক। যে ধাত্রীর দুগ্ধ শিশু পান করিবে, তাহার শরীর পরীক্ষা করা আবশ্যক। উপদংশ, গণ্ডমালা, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি শোণিত-গত পীড়াযুক্ত ধাত্রীর দুগ্ধ শিশুকে কদাচ পান করিতে দিবে না। ধাত্রী প্রসূতীর সম বয়স্কা হওয়া আবশ্যক। স্তনদ্বয় দৃঢ় এবং কৃষ্ণবর্ণ শীরাযুক্ত হইলে তাহাতে উপযুক্ত দুগ্ধ আছে বুঝিবে। ধাত্রী উগ্র, ক্রোধান্বিতা বা উন্মাদরোগগ্রস্থা না হয়। ধাত্রীর সন্তান ও শিশুর বয়স এক অথবা ২।৩ মাসের ছোট বড় হইলে ক্ষতি নাই।

স্তন্যপান। অনিয়মিত স্তন্য পান করাইলে শিশুর আমাশয় ও ভেদ হইতে পারে, অতএব নিয়মিত দুগ্ধ পান করান একান্ত আবশ্যক

এক মাস বয়স পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা অন্তর, ২ মাস পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর, তৎপরে ৪ ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধপান করান আবশ্যক। শিশু ৪ মাস হইলে তাহাকে রাত্রিতে একবার দুগ্ধ পান করাইয়া পৃথক শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিবে। নিয়ম করিলে শিশু রাত্রিতে আর দুগ্ধপান করিবে না। ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে এবং প্রসূতীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া কুড়ী বৎসরের বুড়ী হইতে হইবে না।

দুগ্ধস্রাব। স্তনের দুগ্ধাধিক্য হইলে বা স্তনগ্রন্থীর ছিদ্র বিশেষে স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অপগত হইলে অনবরত দুগ্ধস্রাব হইতে থাকে। ইহা নিবারণ করিতে হইলে প্রশূতীকে সল্‌ফেট্‌ অব ম্যাগনোসিয়ার জোলাপ দিবে। স্তনে বেলেডোনা অয়েণ্টমেণ্ট মর্দ্দন করিবে।

দুগ্ধহ্রাস। অনেক প্রসূতীর স্তনে প্রচুর দুগ্ধ হয় না ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা নিবারণ করিতে হইলে, বাইন, কুচিয়া, কাঁকড়া প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল ও প্রচুর পরিমাণে গো দুগ্ধ প্রসূতীকে খাইতে দিবে। স্তনে ভেরেণ্ডা পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

থুন্‌কা। অধিক দুগ্ধ পান করাইলে স্তনের অগ্রভাগস্থ গ্রন্থী ফাটিয়া গিয়া ক্ষত হয়। ইহার প্রতিকার না করিলে দুগ্ধপান করান যায় না, সুতরাং শিশুর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। থুনকা ক্ষত হইবামাত্র মাখন ও মম মিশ্রিত প্রলেপ দিবে। অথবা গোলাপ জলে তুঁতিয়া ঘসিয়া পটি লাগাইবে।

সপ্তম প্রবন্ধ।

সন্তান পালন শিক্ষা।

সন্তানকে উপযুক্ত পরিমাণে পালন করা বড় সাধারণ কথা নহে। উপযুক্ত পিতামাতার সন্তান যে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত হইয়া সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার অশিক্ষিত পিতামাতার অযত্নে সন্তান যে প্রায়ই নষ্ট ও মূর্খ হয়, তাহার প্রমাণও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। অতএব সকল পিতামাতার সন্তানপালন ও

সন্তান শিক্ষা কিরূপে হয়, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। পিতা মাতার জানা আবশ্যক যে, যে সন্তান ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন হইবে, যাহার প্রতি তাঁহাদিগের তাবত আশা নির্ভর করিতেছে, কেবল তাঁহাদিগের অপরিণামদর্শিতা ও তাচ্ছিল্য হেতু সেই আশাভরসাস্থল সন্তান সংসারে নানাবিধ দুঃখের সৃজন করিয়া, নানাবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া হয় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করে, অথবা সংসারে মূর্খের সংখ্যায় যোগদান করিয়া দারিদ্র্যকে পরিপুষ্ট করে। সেই জন্যই আমাদিগের এ প্রস্তাব।

শিশুসন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় সূত্র পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার পর হইতেই লিখিত হইতেছে।

তিন বৎসর বয়স হইতে শিশু মাতার মুখে নীতি শিক্ষা করিবে। এ নীতি অতি সহজ, এবং কার্য্য দ্বারা প্রকাশ্য। শিশুকে এমন করিয়া গঠিত করিবেন, যে সে যেন মাতার বাধ্য হয়। কোন কার্য্য করিতে, কোন স্থানে যাইতে, কোন কিছু খাইতে, মাতার অনুমতির যেন অপেক্ষা করে। মাতা সন্তানের সম্মুখে কোন অবৈধ কার্য্য করিবেন না। শিশু সন্তান শৈশবকালে যাহা দেখে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই অনুকরণ করে। অনেক গৃহিণী কেবল কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া শিশুদিগকে কলহ শিক্ষা দেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন গৃহিণী আপন পৌত্রীকে কলহ শিখাইয়াছিলেন, সে অনুমতিপ্রাপ্তিমাত্র হাত মুখ নাড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া নানাবিধ গালি সংযুক্ত কলহের অভিনয় করিত। অনেক গৃহিণী আহ্লাদ করিয়া শিশুকে পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেন। এই সমস্ত শিক্ষা পরিণামে শিশুর চরিত্র যে কতদূর দূষিত করিয়া ফেলে তাহার আর ইয়ত্বা নাই। বাল্যকালে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অতি বিচক্ষণতার কার্য্য। শিশুকে শিক্ষা দিলেই সে কথার বাধ্য হয়। মাতার বিনানুমতিতে কোন কার্য্য করে না।

সত্য কথন।—শৈশবে বালকবালিকাদিগকে সত্য কথন শিক্ষা দিবার এক অতি সহজ উপায় আছে। কোন গর্হিত কার্য্য করিয়া বালক বালিকা যদি তাহা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ক্ষমা, এবং অসত্য বলিলে শাস্তি দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, সত্য কথন হেতু

ক্ষমা এবং মিথ্যা হেতু এই শাস্তি। তাহা হইলে বালক বালিকা শাস্তির প্রথমে মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবে না, পরিশেষে অভ্যস্থ হইলে তখন শাস্তি পাইলেও কি বিশেষ ক্ষতি হইলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে সমর্থ হইবে না। আর যদি মিথ্যা বলিয়া শাস্তি হইতে অব্যহতি পায়, তাহা হইলে বালকবালিকা কি জন্য সত্য কথা কহিবে ?

ভয় প্রদর্শন।—বালক বালিকাকে শৈশব অবস্থায় কাল্পনিক ভয় প্রদর্শন করিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন বড়ই অন্যায়। বাল্যকাল হইতে বালক বালিকারা যে ভয়ের সঙ্গে পরিচয় করে, সে ভয়ের কথা হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখে, তাহা এ জীবনে আর ভুলিতে পারে না। ভয়ও জীবনে ঘুচে না। তুচ্ছ ক্রন্দন কি বায়না নিবারণের জন্য মাতা বা পরিবারবর্গ ভয় প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক যে, ভয় না দেখাইয়া অন্য উপায়ে উক্ত ক্রন্দনাদি অনায়াসে নিবারণ করা যাইতে পারে।

শিক্ষাকাল।—ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে বিদ্যা শিক্ষার্থ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। এই সময়ে পিতামাতার সমধিক যত্ন বালক বালিকার প্রতি আকৃষ্ট না হইলে বিদ্যালয়গামী বালকের শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইয়া পিতামাতার শিক্ষাব্যয় অনর্থক হইবে। বালক যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতারা তাহার শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম এবং মানসিক উন্নতির জন্য নীতি শিক্ষা দিবেন। বালিকাকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তৎপরিবর্ত্তে সেই সময়ে তাহাকে সংসারিক গৃহঃকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী যে ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে বালক কেবল পাস করিয়া থাকেন, ছোট বড়, এ, বি, সি, ডি, সমূহ নামের পশ্চাতে শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য সদর্পে দণ্ডায়মান থাকে, পরন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষা হয় না। সংসার নীতি, ধর্ম্মনীতি, সম্বন্ধ ও বৈষয়িক নীতি যাহা সংসারে অবশ্যজ্ঞাতব্য, তাহা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার কোন সুবিধাই নাই। তজ্জন্য বালককে অন্য সময়ে উক্ত নীতি শিক্ষায় শিক্ষিত করা আবশ্যক। নতুবা সেই বহু বিদ্যালঙ্কৃত যুবক কলেজ ত্যাগ করিয়া যেন জাহাজী গোরা সাজিয়া সংসারে অবতরণ করিবেন, সংসারের

পথ মুক্ত রাখা আমাদিগের মতে আবশ্যক। আয়াসসাধ্য অবলার মনোহরণ অপেক্ষা সহজে তাহারা বারাঙ্গনা সঙ্গে অধিকতর প্রবৃত্ত বলিয়াই আজিও সংসারে শান্তি দেখিতে পাই অন্যথা ইহাদিগের জ্বালায় সংসারের—সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সংসাধিত হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। বারাঙ্গনা দ্বারা কেবল এই উপকার মাত্র বুঝিতে পারা যায়, তদ্ভিন্ন ইহাদিগের দ্বারা অন্য কোন উপকার লাভের প্রত্যাশা নাই।

বারাঙ্গনার বারাঙ্গনা বৃত্তি কেন? অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, কয়েকটি কারণে স্ত্রীলোক বাধ্য হইয়া এই দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হয়! স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত, বালবৈধব্য, অত্যধিক সাংসারিক ক্লেশ ও অত্যধিক কাম প্রবৃত্তি, প্রধানতঃ এই কারণ চতুষ্টয় হেতু স্ত্রীলোক বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করে।

স্বামী হয়ত অপরার প্রেমে উন্মত্ত,—দিবারাত্রি ভালবাসার নিকটে অবস্থান, লজ্জার কথা—যুবতী ভার্য্যা গৃহে রাখিয়া পেত্নীরূপা কোন বর্ষীয়সী বা যুবতীর গৃহে সুখের সাগরে সাঁতার দেওয়া, গৃহে আসিয়া ভার্য্যার প্রতি অযথা তিরস্কার, প্রহারাদি,—যুবতীর আর সহে কত? তাহার হৃদয় তখন নন্দনকানন!—বিলাসিতা, স্বামীপ্রেম লালসা,—যুবতীজনসুলভ প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে স্থায়ীরূপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। তাহার সে বাসনা পূর্ণ হয় কৈ? একে ত বাসনার বিপক্ষে মনের গতি পরিচালন, তাহার উপর আবার স্ত্রীজনসুলভ দ্বেষ।—তাহার অধিকৃত স্বামী অপরে ভোগ করিতেছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যাতনা অসহ্য। যুবতী সেই অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে, ইহাতেও স্বামী মহাশয়ের ক্ষান্তি নাই, তিনি সেই মর্ম্মাহতা যুবতীভার্য্যাকে অন্যায় অত্যাচারে পীড়ন করিলেন, প্রহার করিলেন, যন্ত্রণার একশেষ দিলেন। যুবতীর তখন বুদ্ধি পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাই অভাগিনী সুখের আশায়,—এই যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিবু‌র্দ্ধিতার বশবর্ত্তি হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিল।

বালবিধবা, বৃদ্ধের তরণীভার্য্যা, ইহারাও সময় সময় বুদ্ধির বিপাকে বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করে যাহারা বাল্যকালে বিধবা হয়, তাহাদিগের প্রতি হিন্দুশাস্ত্র যে শোচনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বালবিধবাগণ বড়ই যন্ত্রণা পায়। সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইল। জানে

না তাহারা সংসার, জানেনা তাহারা সমাজ, তাহাদিগের উপরই অসীম অত্যাচার। বালিকা আলুলিত কেশা, তাম্বুল, সুপরিস্কৃত শয্যা, মৎস্যমাংস আহার মাস, তৈল, অলঙ্কার ব্যবহারে বঞ্চিতা, বালিকা—কারণ খুজিয়া পায় না। সমবয়স্কা সকলেই সুপরিচ্ছন্ন বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করে, মৎস্যমাংস আহার করে, গন্ধতৈলে কেশদাম সিক্ত ও কবরী বন্ধন করে, বালিকা তবে কেন যে এ সকল হইতে বঞ্চিতা, তাহা বুঝিল না। দুই বেলা সামান্য উপকরণে অন্নমাত্র খাইতে পায় না, মাসে মাসে উপবাস,—বালিকা অতিকষ্টে সহ্য করিল। বালিকার শুষ্কমুখ দেখিয়া মাতা রোদন করেন, পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, প্রতিবেশীরা কানাকানি করে,—মুখরারা মুখ ফুটিয়া বলে, বালিকার মত হতভাগিনী আর দ্বিতীয় নাই। তখনও বালিকা বুঝে না, সে হতভাগিনী কেন। ক্রমে বয়স হইল, হৃদয়ক্ষেত্রের অঙ্কুরিত বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে ফলপুষ্পে শোভিত হইল, তখন যুবতী দেখিল, এই সুখ উপভোগ করিবার কেহ নাই। এত কষ্টে যুবতী মানসকাননে কত সুগন্ধী ফুল ফুটাইয়াছে, কত প্রেমের স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিয়াছে, স্নেহ প্রণয়ের কুঞ্জ বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, এখন এ ফুলের সুমধুর গন্ধ কাহার মনোহরণ করিবে? এ ফুলের মালা কাহার গলায় পরাবে? এ কুঞ্জে কাহাকে বসাইবে? যুবতীর তখন নয়ন জল দেখা দিল। যে বড় বুদ্ধিমতী,—যাহার শিক্ষাগুরু দক্ষ, সে হৃদয়ের পুষ্পোদ্যান হৃদয়েই শুকাইল,—নয়নের জল আর নিবিল না। মনের বৃত্তি তখন ধর্ম্মের দিকে পরিচালিত করিল। বিধবা যুবতী বিষাদপ্রতিমা সাজিয়া ব্রত নিয়ম করিয়া উৎকট ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্যাপন করিল। আর যাহার বুদ্ধির গভীরতা নাই, চিত্তবৃত্তি দমন করা যাহার ক্ষমতাতীত, সে সম্মুখে দেখিল দিব্য সুখের পথ প্রশস্ত। একজন গিয়াছে ক্ষতি কি? আর একজনকে দেখিয়া শুনিয়া মনের মত করিয়া তাহাকেই এই কুসুমদামে সাজাইব। তাহাকেই এই হৃদয় কুঞ্জে বসাইব। এই ভাবিয়া—সে নয়নের জল নিবারণ করিয়া এই মহা অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিল। আজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া—ত্রাহি ত্রাহি করিয়া—পাপের ফল ভোগ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা! যে যুবতীর শিক্ষার মূল দৃঢ়, স্বামীপদ যাহার ইহপরকালের সার বস্তু বলিয়া বিশ্বাস, স্বামীসেবা ও স্বয়ং ত্রৈলোক্য

তিনি কোন উপকারই করিতে পারিবেন না। সংসার সম্বন্ধে একজন নিরক্ষর ঘোষনন্দনের যেটুকু বহুদর্শিতা আছে, এম, এ, উপাধিধারীর তাহার শত ভাগের এক ভাগও আছে কি না সন্দেহ। সেইজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সংসার শিক্ষার সুবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বালিকাকে মাতা সংসার চিনাইবেন। সংসারে কি কি কার্য্য করিতে হয়, রন্ধন, পরিবেশন, সম্বন্ধানুসারে ব্যবহার, দাস দাসীর সহিত ব্যবহার, এ সকলই মাতা কন্যাকে শিক্ষা দিবেন। বিবাহ হইলে, স্বামীগৃহে গিয়া কিরূপে সংসারে গৃহিণী হইবে, কিরূপে স্বামীপুত্রকে সুখী করিবে, সে সব কথা কন্যাকে শিখাইয়া দিবার ভার মাতার উপর। মাতাপিতা যথানিয়মে পুত্রকন্যাকে এই সকল শিক্ষা দিবার দায়ী। প্রধানতঃ পিতা পুত্রের প্রতি এবং মাতা কন্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

সংসর্গ।—বালক যাহাতে সচ্চরিত্র বালকগণের সহিত এবং কন্যা যাহাতে সচ্চরিত্রা বালিকাগণের সহিত মিশিতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কেননা, বাল্যকালে কুসংসর্গে পড়িয়া, অনেক বালকবালিকা চরিত্র দূষিত করিয়া ফেলে। অতএব পিতামাতা সন্তানের প্রতি বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তানের উন্নতি অবনতি অনেকাংশে সংসর্গের অবস্থানুসারে নির্ভর করে। সৎসংসর্গের যেমন সুন্দর ফল, অসৎসংসর্গে তেমনই কুফল লাভ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া অতি আবশ্যক।

স্বাস্থ্যরক্ষা।—সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আহারাদি ব্যবস্থা করিবেন। দুষ্ট বালকেরা গাছে গাছে পেয়ারা, আম চুরি করিয়া খাইয়া অসুস্থ হইল, হয়ত বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গিয়া, হস্ত পদাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল. অধিকক্ষণ জলে সন্তরণ দিয়া জ্বর করিয়া বসিল,—অপরিমিত কদর্য্য আহারে উদরাময় হইল, এ সকল কেবল পিতামাতার তাচ্ছিল্যের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পুত্রের ব্যবহারের উপর পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া, প্রায়ই সন্তানের ও অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার দোষেই—তাঁহার তাচ্ছিল্যেই সন্তানের এই অবনতি এবং তাঁহার এই মনস্তাপ, তাহা একবারও বিবেচনা করেন না।

বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া, অধিকতর অর্থ ব্যয় করিলে বা সন্তানকে সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত করিলেই যে পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহিত

হইল, তাহা নহে। পিতা ছায়ার ন্যায় সন্তানের অনুবর্ত্তন করিয়া, তাহার মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। মাতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, সংসারশিক্ষায় এমন শিক্ষা দিবেন যে, বিবাহের পর কন্যার আর কোন বিষয়ে অজ্ঞতা পরিলক্ষিত না হয়। কন্যা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই, তাঁহার চিরপরিচিত গৃহের ন্যায়—তাঁহার গৃহ দ্বার তিনি দেখিয়া লইবেন। শিক্ষিতা বালিকাকে স্বামীগৃহে গিয়া আর কলাবউ সাজিয়া থাকিতে হইবে না। পিতা মাতার শিক্ষিত সন্তান সংসারী হইয়া, সংসারে প্রীতির রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকেন।

অষ্টম প্রবন্ধ।

বারাঙ্গনা।

বারাঙ্গনার নাম উচ্চারণ করিলেই, মনোমধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয়। জগতের সুখের যতগুলি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে বারাঙ্গনাই প্রধান। জগতে যতগুলি পাপস্থান আছে, বারাঙ্গনাগৃহ তন্মধ্যে প্রধান। সংসার-উদ্যানের ইহারাই বিষলতা,—সুখস্থানের ইহারাই মরিচীকা,—পাপক্ষেত্রের ইহারাই সতেজ কণ্টক, বারাঙ্গনাগৃহ পাপরাজ্যের প্রধান লীলাভূমী। জগতের যত বিঘ্ন, যত অত্যাচার, যত পাপ তৎসমস্তের ইহারাই কেন্দ্রিভূতা। ইহাদিগের দ্বারাই পাপস্রোতে ধরণী ভাসমান। ইহাদিগকে সংসার হইতে দূর করিবার কি কোন উপায় নাই?

ইহাদিগকে সংসার হইতে দূর করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত, ইহাদিগের দ্বারা সংসারের কি কোন উপকার নাই? অন্যে যাই বলুন, ইহাদিগের দ্বারা সংসার পাপস্রোতে ভাসমান হইলেও, আমরা একটু উপকার দেখিতে পাই। সমাজের যে সমস্ত উশৃঙ্খল যুবক সংসারকে পদদলিত করিতে চায়, সংসারে যে সমস্ত কণ্টক উর্ব্বরধর্ম্মক্ষেত্রে কণ্টক বীজ রোপণ করিতে প্রয়াসী, যে সমস্ত দুশ্চরিত্র যুবক স্বীয় পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনার্থ ভদ্রপরিবারের প্রতি লক্ষ্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদিগের জন্য,—তাহাদিগের প্রকৃতির দমনার্থ অনায়াসলভ্য এরূপ একটী প্রশস্ত

নাথের সেবা এক বলিয়া যে জানে, সে সেই বৃদ্ধ স্বামীর সেবায় জীবনপাত করিতে পারে। যৌবনের তাবৎ বৃত্তির তাবৎ আশাভরসা অতলজলে নিক্ষেপ করিয়া এই মহাব্রত ধারণ করে। আর যাহাদিগের শিক্ষা নাই, শিক্ষা-দিবার কেহ নাই, প্রলোভন প্রদর্শনের অনেকে আছে, তাহাদের কপালই পুড়িয়া যায়, সেই হতভাগিনীরাই এই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

নীচজাতিয়া যুবতীরা অত্যধিক সাংসারিক ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। একটু সুন্দরী যুবতী, যাহার স্বামী বা পিতা অনেক গুলি পরিবার লইয়া বিব্রত, সামান্য আয়, প্রতিদিন হয় ত অন্নের সংস্থান হয় না। সেই সমস্ত গৃহস্থের যুবতীরা প্রতিবেশিনী "তপস্বিনী" দিগের কুহকে পড়িয়া প্রথমে সামান্য অর্থের জন্য প্রতিবেশী কুচরিত্র দিগের বাসনা সিদ্ধ করে, পরিশেষে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগিনী হয়।

আর যে সমস্ত হতভাগিনীদিগের কুলগ্নে জন্ম, কামপ্রবৃত্তিরপ্রতি-কৃতিস্বরূপ হইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে,—প্রভূত ধনের অধিকারিণী, বিদ্বান শ্রীমান ও যুবক স্বামী কর্ত্তৃক নিত্য নিত্য সেবিত হইয়াও তাহা-দিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমিত হয় না। তাহারা কেবল ঐ পাপকার্য্যের জন্যই অতুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া—পবিত্র স্বামীর প্রেম তুচ্ছ করিয়া কুলের ধ্বজা উড়াইয়া থাকে। তাহাদিগের জন্য বিধাতা কোন্ নরক যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জানিতে বাসনা হয়।

এই সমস্ত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পাপিনীরা সুরূপ, বিদ্বান, ধনবান এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অতিকদা-কার ইতর লোকের সঙ্গে বা স্বীয় স্বল্পবেতনভোগী ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গ করিয়া থাকে। ইহার ভূরি প্রমাণ সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত কারণের ক্ষমা, আছে কিন্তু এই পাপের আর নিস্তার নাই, ক্ষমা নাই।

সকল সমাজেই দুই শ্রেণীর বেশ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ও গোপন। যাহারা প্রকাশ্যস্থানে নির্দ্দিষ্টগৃহে থাকিয়া প্রকাশ্যভাবে দুষ্কার্য্য সমাধা করে, পূর্ব্ব স্বামী বা পিতার কোন সংস্রব রাখে না, তাহারা সাধারণ। আর যাহারা গৃহে থাকিয়া সধবা কি বিধবা অবস্থায় দুষ্কার্য্য

সাধন করে, গোপনভাবে যাহারা পাপ-বাসনা চরিতার্থ করে, তাহারা আরও ভয়ানক। প্রকাশ্যভাবে যাহারা দুষ্কার্য্য করে তাহাদিগের প্রকৃতি সকলেই জানে এবং তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়ও হইতে পারে, কিন্তু এই বিষকুম্ভপয়োমুখ গৃহঢেঁকীদিগকে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই, জানিবার উপায় নাই, প্রভেদ করিবার উপায় নাই, চিনিবার উপায় নাই।

যে সমস্ত বিধবা স্বামী বা পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়া দুষ্কার্য্য করে, তাহাদিগের দ্বারাই অধিকতর ভ্রূণহত্যা হয়। আর যে সমস্ত হতভাগিনী স্বামী বর্ত্তমানে এই দুষ্প্রবৃত্তি চারিতার্থ করে, তাহাদিগের দ্বারা কি বিষময় ফল উপ্ত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য একটি সামান্য সত্যঘটনা নিম্নে উদাহরণ দিতেছি।

ডাক্তার হার্ট্ বলেন, ফ্রান্সে এক যুবতী যমজ সন্তান প্রসব করেন। তাহার মধ্যে একটি প্রকৃত্যানুরূপ শ্বেতবর্ণ, অপরটি অতি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। প্রসূতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে জানিতে পারা যায় যে, স্বামীসঙ্গের অল্পক্ষণ পরেই একজন কাফ্রি বলপূর্ব্বক তাঁহাতে উপরত হয়। এই উদাহরণটি বিচক্ষণতার সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার মহদনিষ্টের বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পিতামাতার বুদ্ধিবৃত্তি, আকৃতি, এবং সদ্গুণাদি সন্তানের শরীরে সঞ্চারিত হয়। যে পিতা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর, তাহার সন্তান প্রায়ই উক্ত গুণসম্পন্ন হয়। উন্মাদ বা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পিতার সন্তান তদ্ভাবাপন্ন হয়। এমত স্থলে কোন মেধাবী, বুদ্ধিমান, শ্রীমান ও ধীর, ব্যক্তির স্ত্রী যদি কামপরতন্ত্র হইয়া কোন নির্ব্বোধ, কৃষ্ণকায় অন্তজের সঙ্গ করেন এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে যে নির্ব্বোধ, কৃষ্ণাঙ্গ ও অতি কদাকার সন্তান জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যদি সন্তান হয়, তবে সে পুত্র মূর্খ ও নির্ব্বোধ হইয়া পিতামাতার কোন কার্য্যে আসিল না, কন্যা হইল যদি, তাহা হইলে কৃষ্ণাঙ্গী, অতি কদাকারা, নির্ব্বোধ কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পিতার সর্ব্বনাশ হইল। এইরূপে বংশনাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রকাশ্য বারাঙ্গনা অপেক্ষা ইহারা ভয়ানক।

নীচজাতিয়া দুশ্চরিত্রারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মিশিয়া সমাজের অনেক

হিতসাধন করিতেছে। প্রকাশ্য বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া তাহারা যে এক এক জন পুরুষের উপভোগ্যা হইয়া সমাজের বাহিরে অবস্থান করে, তাহা সমাজের উন্নতি ভিন্ন অবনতির পরিচায়ক নহে। কেবল দুঃখের বিষয়, মহাত্মা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে কতকগুলি দুশ্চরিত্র ভণ্ড নেড়া নেড়ির দল মিশিয়া ধর্ম্মটিকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা মনে হইলেই সেই পবিত্র ধর্ম্মের মনোহর বাক্যগুলি স্মৃতিপথে পতিত না হইয়া, কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জঘন্য চরিত্রের কথাই সাধারণের মনে উদিত হয়, সেই জন্যই সাধারণের তৎপ্রতি দৃষ্টি বা সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

অতঃপর প্রকাশ্য বেশ্যাদিগের আভ্যন্তরিক চিত্র প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে।

জগতে যতগুলি উপার্জ্জনের পথ আছে, বেশ্যাবৃত্তি সে সমস্তের নিম্নে। যে সতীত্বরত্ন সমাজের, ধর্ম্মের এবং ইহ-পরকালের সারবস্তু, সেই সতীত্ব বিক্রয়ের ব্যবসা যাহারা অবলম্বন করে, তুচ্ছ উদরান্নের জন্য বা দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সামান্য অর্থে যাহারা সতীত্ব বিক্রয় করে, তাহাদিগের ন্যায় হতভাগিনী জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

প্রকাশ্য বেশ্যার আবার দুইটী শ্রেণী। এক শ্রেণী স্বয়ং কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে অবস্থান করিয়া স্বেচ্ছানুসারে পাপানুষ্ঠান করে এবং সেই পাপার্জ্জিত অর্থ নিজে ভোগ করে। আর এক শ্রেণীর ঐ অর্থে কোন অধিকার থাকে না, এবং পাপকার্য্যে অনুরক্তি কি বিরক্তি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকে না। এক একজন বৃদ্ধা দুই তিনটি বা ততোধিক বালিকা ক্রয় করিয়া তাহাদিগের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে। ইহারা সেই বৃদ্ধার অভিমতে পরিচালিত এবং তাহার দ্বারাই প্রতিপালিত হয়। সে সমস্ত হতভাগিনী পীড়াগ্রস্ত হইয়া বা বিরক্তিহেতু পাপকর্ম্মে একদিন মাত্রও অবকাশ প্রার্থনা করে, বৃদ্ধা পিশাচিনী তাহাতে কথনই সম্মতি দিতে প্রস্তুত হয় না। ইহারা রুগ্না, সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্তা বেশ্যাদিগকেও বলপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য করে। এই সমস্ত পিশাচিনীদিগের হৃদয়ে দয়াধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। বালিকাদিগকেও অস্বাভাবিক উপায়ে পাপকার্য্য করাইয়া তাহার শরীর চিরদিনের মত রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াও প্রতিনিবৃত্তি হয়

না। যতদিন তাহার উত্থানশক্তি থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা পাপকার্য্য করাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা যে সমস্ত অত্যাচার করে, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে সমস্ত যুবক কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদিগের খর্পরে পতিত হয়, ইহারা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া পথের ভিখারী করিয়া ছাড়ে। কলিকাতার ধনী-সন্তানেরা এই কুহকে পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করেন। যদি কোন নূতন ব্যক্তি ইহাদিগের গৃহে গমন করে, তাহা হইলে নানা উপায়ে তাহাকে প্রলোভিত করিয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কৌশল বিস্তার করে। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই কৌশল-জাল ব্যর্থ হইলে অন্য লোক দ্বারা বলপূর্ব্বক অথবা মদ্য পান করাইয়া অচৈতন্য হইলে তাহার বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ইহাদিগের এমনই মোহিনীশক্তি যে, একবার ইহাদিগের কবলে পতিত হইলে আর উদ্ধারের উপায় থাকে না।

প্রবৃত্তির প্রতিকূলে বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করা বড় বিষম কথা। এমন ঘৃণিত কার্য্যও আর দ্বিতীয় নাই। নিত্য নূতন ব্যক্তির নিকটে লজ্জাশীলতা ত দূরের কথা, একেবারে চিরপরিচিতের ন্যায় যেন কতই ভালবাসা, কতই জানা-শুনা, কতই আত্মীয়তা ভাব প্রকাশ করা যে কতদূর নীচ অন্তঃকরণের চিহ্ন, তাহা চিন্তা করিতেও বিস্ময় জন্মে। আবার যে হতভাগ্যগণ ভদ্রতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া—লজ্জা, মান, সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনা গৃহে গমন করে, তাহাদিগের প্রবৃত্তিকে ধন্যবাদ।

বারাঙ্গনার গৃহে প্রতিনিয়ত যে কত কত বিভৎস্য রসের অবতারণা হইতেছে,—কত ভয়ানক ভয়ানক অকার্য্য দিবানিশি সাধিত হইতেছে, কত দাঙ্গাহাঙ্গামা, জাল জুয়াচুরী হইতেছে—আবার কত ভদ্রপরিবারের সর্ব্বনাশ হইতেছে,—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহাদিগের কুহকে পড়িয়া কত মাতা পুত্রের জন্য,—কত যুবতী স্বামীর জন্য দিবানিশি নয়নজলে ভাসিতেছেন কত ধনাঢ্য সন্তান অপরিমিত ধন সামান্য দিনে নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী সাজিতেছেন; তাহা কে গণনা করে?

বারাঙ্গনা গমনের ফল।—বারাঙ্গনাগমনে যে কেবল অর্থনাশ এবং মানমর্য্যাদার হানি হয়, তাহা নহে। ইহাতে কয়েকটি দুশ্চিকিৎস্য

রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বঙ্গযুবকগণ যে ক্রমশই রুগ্ন এবং দুর্ব্বল হইতেছেন, অল্পায়ু ও হীনতেজ হইতেছেন, বারাঙ্গনাগমন তাহার অন্যতম কারণ। যে সকল দুশ্চিকিৎস্য রোগে বঙ্গবাসী পীড়িত হইতেছেন, তাহাতে এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গদেশ উৎসন্ন হইবে—নিরোগী দীর্ঘজীবী কেহ থাকিবে না।

যে কয়েকটি রোগ বারাঙ্গনাগমনে স্বতঃই উৎপন্ন হয়,—উপদংশ, প্রমেহ, শুক্রতারল্য, পাথরী, বাত, মজ্জাগত জ্বর, রক্তবিকৃতি, মুষ্কবৃদ্ধি ও ঘুর্ণি তন্মধ্যে প্রধান।

উপদংশ।—এক ক্ষেত্রে অধিকতর এবং বিবিধ প্রকার বীর্য্য স্খলিত হওয়ায় এই রোগের উৎপত্তি। এইজন্যই বারাঙ্গনা ভিন্ন এক স্বামীতে যাহারা উপরত হয়, তাহাদিগকে এ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। বীর্য্যের ধর্ম্মই বিষাক্ততা। কেবল একস্থানে এক প্রকার বীর্য্য বারম্বার সংলগ্ন হইলে তাহা প্রাকৃতিক বিধানানুসারে সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু নানাবিধ ধর্ম্মাক্রান্ত বিষাক্ত বীর্য্য এক স্থানে বারম্বার সংলগ্ন হইলে এবং অত্যধিক ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইলে এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই বিষ এতাদৃশ উগ্র যে উপদংশাক্রান্ত রমণীতে উপরত হইলেই এই রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। বারাঙ্গনাদিগের যেমন স্বতঃই স্বীয় কার্য্যের ফলস্বরূপ এই রোগ জন্মে, পুরুষের তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। এই রোগে রুগ্না কোন স্ত্রীর সহিত ব্যবহার না করিলে পীড়িত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

উপদংশ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রাথমিক, দ্বৈকালিক ও সংক্রামক। যে উপদংশ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সঞ্চারিত হয়, অর্থাৎ উক্ত রোগে পীড়িতার সংসর্গে যে রোগ সংক্রমিত হয়, তাহাকে প্রাথমিক উপদংশ বলে। একবার ক্ষতাদি শুষ্ক হইয়া কিছুদিন পরে আবার যে ক্ষত হয়, তাহাকে দ্বৈকালিক উপদংশ বলে। আর যে উপদংশ পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হয়, তাহাকে সংক্রামক উপদংশ কহে।

প্রাথমিক উপদংশ।—প্রকৃত প্রাথমিক উপদংশের লক্ষণ একদিনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। প্রথমে জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে যে কোন অংশের স্থান বিশেষ রক্তাভ হয়। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে

সেই স্থানে ক্ষুদ্র একটী ব্রণ জন্মে, চতুর্থ ও পঞ্চমদিনে সেই ব্রণটি ক্ষতরূপে পরিণত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উপদংশের বিষ একবার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে আর আরোগ্য হইবার আশা থাকে না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, এই বিষ নিম্নতর সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সংক্রমিত হইতে পারে।

উপদংশের ক্ষত এত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় যে, তাহাতে মুষ্কচ্ছেদ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই ঘৃণিত পীড়ার প্রথম আক্রমণে সকলে লজ্জার জন্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন। শেষে যখন গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়, তখন অগত্যা প্রকাশ করেন। কিন্তু সে সময় পীড়ার এতদূর বৃদ্ধি যে, আরোগ্য লাভ করিতে বিশেষ সময় লাগে, সুতরাং রোগীকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

পূর্ব্বকালে সাধারণ লোকের সংস্কার ছিল যে, পারদ ব্যবহার ব্যতীত এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। এই ভ্রম বদ্ধমূল থাকায় রোগী কাঁচা পারদ ব্যবহার করিয়া জন্মের মত শরীর নষ্ট করিতেন। পারদ ব্যবহার দ্বারা এই রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু অল্প দিন পরেই সর্ব্বাঙ্গে পারদ নির্গত হয়। শরীরে ক্ষত সহজে শুষ্ক হয় না। অনেকে পারদ ব্যবহারে উপদংশ হইতে অব্যাহতি পাইয়া পরিশেষে সর্ব্বাঙ্গে পারদ নির্গত হওয়ায় সেই ক্ষতের যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। কেহ বা রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

একবারে যাহার শরীরে এই বিষ প্রবেশ করে, তাহার শরীরের শোণিত চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়।

প্রাথমিক উপদংশের সময় ক্ষত সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। পল্লীগ্রামে যে সমস্ত পারদবিহীন ঔষধ আছে, তাহাই ব্যবহার কর্ত্তব্য। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আবিষ্কৃত এবং বিশেষ প্রকারে পরীক্ষিত "আইডোফর্ম্ম" নামক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধে পারদ নাই। সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে যে, এক্ষণে উক্ত ঔষধই একমাত্র এই রোগের মহৌষধ।

দ্বৌকালিন উপদংশ।—প্রাথমিক উপদংশ সংক্রমিত মাত্রে কোন

ঔষধ দ্বারা আশু আরোগ্যলাভ করিলে উপদংশ বিষ শরীর মধ্যে থাকিয়া যায়। এই বিষের এমন ধর্ম্ম যে, শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা নষ্ট করিয়া ফেলে এবং গাত্রের যে কোন স্থানে ক্ষত হয়। অতএব প্রাথমিক উপদংশে পীড়িত হইলে, যাহাতে উপদংশের বিষ অপগত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হয়, সেই রূপ ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ উপদংশ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া কিছুদিন শোণিত-সংশোধক ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার এবং সর্ব্বদা শীত ও উষ্ণ হইতে দেহকে সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

দ্বৈকালিক উপদংশ সঞ্চারিত হইতেই স্ত্রীসংসর্গ, দিবানিদ্রা, অধিক শ্রম, রাত্রিজাগরণ বন্ধ করিবে। শোণিত-পরিশোধক ঔষধ ব্যবহার করিবে, লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করিবে, এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে।

সংক্রামক উপদংশ।—পিতা কি মাতার উপদংশ রোগ থাকিলে সন্তানের রক্তও দূষিত হয়। পিতার উপদংশবিষ-মিশ্রিত বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিলে সন্তানও উক্ত পীড়ায় পীড়িত হয়, রোগাক্রান্ত পিতামাতার সন্তান গর্ভেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যদি ভূমিষ্ঠ হয়। তাহা হইলে তাহার শরীর রুগ্ন এবং পরমায়ু অতি অল্প হয়, যতদিন সেই সন্তান জীবিত থাকে, তত দিন তাহাকে রোগ ভোগ করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে গাত্রে পারদের চিহ্ন লক্ষিত হয়। এমন কি ক্ষতশরীরেই ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় যে, ব্যাধিতে এতদূর অনিষ্ট করে, বঙ্গযুবক সামান্য কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজের ও নিজের বংশের এই ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করেন। প্রথমে সুখের আশায় বারাঙ্গনালয়ে গিয়া এই দুঃখের বোঝা মাথায় বহিয়া গৃহে আনেন।

আমাদিগের দেশের সংস্কার আছে, উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গাত্রমার্জ্জনী ব্যবহার করিলে, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে, পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিলে, এমন কি তাহার বায়ু স্পর্শ করিলে এই সংক্রামক রোগে পীড়িত হইতে হয়। গাত্রমার্জ্জনীপিষ্ট পারদবিষ গাত্রমার্জ্জনীর সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ায় তাহা ব্যবহার করিলে পারদবিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থানিক উপদংশ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সুশীল শান্ত বালক গোপনে বারাঙ্গনা

গৃহ হইতে এই রোগ কিনিয়া আনেন এবং প্রকাশ হইলে কোন নামজাদা উক্ত রোগগ্রস্তের নাম করিয়া বলেন, অমুক ব্যক্তির গাত্রমার্জ্জনী কি তথাবিধ কোন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জানা আবশ্যক যে, উহাতে শারীরিক অসুস্থতা কি গাত্রে পারদব্রণ উদ্ভূত হইতে পারে, স্থানিক ক্ষতের কোন সম্ভাবনা নাই। শেষ অনুরোধ, যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট করযোড়ে নিবেদন, আপনারা এই সর্ব্বনাশকারী রোগের বিষময় ফল একবার প্রত্যক্ষ করুন। উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্দ্দশার প্রমাণ ত অনুসন্ধান করিতে হইবে না। গ্রামে গ্রামে বংশে বংশে এইরূপ ধুরন্ধর অনেক মিলিবে। তাঁহাদিগের নিজের দৈহিক অবনতি ও সন্তানদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন, জীবনে কখন তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য নিজের,—বংশের,—দেশের সর্ব্বনাশ করিবেন না।

প্রমেহ।—প্রমেহ বড় সামান্য যন্ত্রণাপ্রদ পীড়া নহে। ইহার যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতে আমরা অনেককে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রমেহ অনেক কারণে হইয়া থাকে। অত্যধিক গরমে, বংশানুক্রমে, অত্যধিক সংসর্গে, বহুকালব্যাপী ইন্দ্রিয়পরিচালন বিরতিতে এবং উক্ত রোগগ্রস্তের সংসর্গে এই পীড়া সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। যে গুলি স্বতঃই উৎপন্ন হয় তাহার যন্ত্রণা এবং প্রতিকার অতি সহজ। আর যে গুলি সংসর্গজাত, তাহার যন্ত্রণাও অধিক এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনাও অল্প। গরম জন্য যে প্রমেহ, তাহা ধাতুর পীড়া বলিয়া অভিহিত। প্রথমতঃ এই ধাতুর পীড়ার প্রতিকার না করিলে ক্রমে উহা প্রমেহে পরিণত হইতে দেখা যায়। অতএব এই রোগের আরম্ভেই প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। ধাতুর পীড়ার লক্ষণ,—ঘন ঘন প্রস্রাব-বেগ, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা, প্রস্রাব প্রথম নির্গমনকালে এবং শেষে সামান্য পরিমাণে বীর্য্যপতন, মস্তক ঘূর্ণন, আলস্য ও কোষ্ঠবদ্ধ তন্মধ্যে প্রধান। রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে সর্ব্বদাই বীর্য্যপাত হয় এবং যন্ত্রণাও অধিক হইয়া থাকে। এই ধাতুর পীড়া অধিক দিনের পুরাতন হইলে রক্তস্রাব পর্য্যন্ত হয়। তবে ধাতুর পীড়াঘটিত অপেক্ষা প্রকৃত মেহ অধিকতর কষ্টকর এবং দুশ্চিকিৎস্য।

শুক্রতারল্য।—বারাঙ্গনাদিগের স্ত্রীযন্ত্রে এমন এক প্রকার ন্যাকার

জনক তরল পদার্থ নির্গত হয়, যাহা বারাঙ্গনাগামীর শিশ্নদেশের অগ্রভাগে সংলগ্ন হইলে অধিকতর বীর্য্যপাত হইয়া থাকে। * এ কারণ না ধরিলেও বারাঙ্গনাগামীগণের স্বপুপরতন্ত্রতায় তাঁহারা অধিকতর সংসর্গ করেন এবং অধিকতর বীর্য্যপাত হেতু প্রকৃত বীর্য্য ব্যয়িত হইয়া পরিশেষে কীটশূন্য একপ্রকার তরল বীর্য্য স্খলিত হইতে থাকে। এই শুক্র অতি তরল এবং কীটশূন্য! এই বারাঙ্গনাগামীগণের সন্তানলাভের সম্ভাবনা অল্প। এমন কি অধিকতর সংসর্গ হেতু ধ্বজভঙ্গ রোগও জন্মাইতে পারে। পাথরীও বারাঙ্গনাগমনের বিষময় ফল। উপদংশ রোগগ্রস্তগণকে পরিণামে বাতরোগে আক্রমণ করে। বাতরোগ প্রমেহ ও ধাতুর পীড়ার অনুসঙ্গী।

যে সমস্ত যুবক বারাঙ্গনাগমনে সমধিক প্রয়াসী, তাহাদিগের স্বপুপরতন্ত্রতা যে সমধিক তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহারা জ্বর সত্ত্বেও বারাঙ্গনা সংসর্গ করিয়া মজ্জাগত জ্বরে পীড়িত হয়। উপদংশাদি রোগের পরিণামস্বরূপ রক্তবিকৃতি, মুষ্কবৃদ্ধি, ঘুণী ও দুর্ব্বলতায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এতগুলি বিপদের সম্ভাবনা; সে প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টা সকলেরই ঐকান্তিক হওয়া আবশ্যক।

এই ভীষণ ব্যাধির সংস্রবে আরও যে কত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপযোগী নহে। পরন্তু ইহার অপকারিতা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

নবম প্রবন্ধ।

মাদকসেবন।

প্রধানতঃ মাদক বারাঙ্গনারই অনুসঙ্গি। বারাঙ্গনাগমনের প্রধান সুখ মাদকসেবনে। সেইজন্য বারাঙ্গনা গৃহেই ইহার স্রোত কিছু অধিক

* এই নূতন প্রণালী আমেরিকার ডাক্তার (Hampton) হম্পটন আবিষ্কার করিয়াছেন।

পরিমাণে প্রবাহিত হয়। বারাঙ্গনা-গামীগণের একটী প্রধান সংস্কার, মদ্যমাংস ভিন্ন আমোদের ফোয়ারা ছুটে না, চক্ষুলজ্জা ঘুচে না, বারাঙ্গনার সহিত তালে তালে নৃত্য করিতে—কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির সহিত প্রাণপণ চীৎকারে ইয়ারকির লহর তুলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। প্রকৃতই বোধ হয়, চক্ষুলজ্জা ও জ্ঞানের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই বারাঙ্গনাগামীরা সুরাপান করেন। তবে বারাঙ্গনা-গৃহে না গিয়াও যে কেহ সুরাপান করেন না, কি বারাঙ্গনা-গৃহে গিয়াও যে সকলে সুরাপান করেন, এমন নহে। তবে যেটি অধিক, সেই কথাই আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

মাদকসেবনে যে কয়েকটি সামাজিক ও দৈহিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, তাহাই উল্লেখ করিলে বোধকরি যথেষ্ট হইবে। আরও বক্তব্য যে, এ প্রবন্ধে কেবল সুরাই মাদক দ্রব্যের প্রধান বলিয়া তাহারই বিষয় লিখিত হইবে; পরন্তু গাঁজা, গুলি, চরস, অহিফেন, সিদ্ধি ও তামাক প্রভৃতিও মাদক দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত এবং অল্লাধিক শরীরক্ষয়কারী।

মদ্যপায়ীর সাংসারিক আকর্ষণ অল্প। স্ত্রী-পুত্র খাইতে না পাইলেও তাদৃশ চিন্তার বিষয় নহে, যতটা মদের পয়সার জন্য ভাবনা। মদের পয়সা জুটিলে সুরাপায়ীরা ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করে। যে সমস্ত হতভাগ্য সামান্য আয়ে মদ খাইতে শিখে, তাহাদিগের গৃহে মাসের অর্দ্ধেক দিন "হরি মটুকের" উৎসব হয়। একে ত মদের মত্ততায় বিষয়কার্য্য প্রায়ই হয় না, তাহার উপর মেজাজ ঠিক থাকিলে বিষয়কার্য্যদ্বারা যে সামান্য আয় হয়, তাহা মদের খরচেই কুলাইয়া উঠে না। যাহাদিগের অর্থের অপ্রতুল নাই, তাহারাই যে মদ্যপানের প্রকৃত অধিকারী, তাহা নহে। ঈশ্বর ধনের সদ্ব্যবহার করিতেই দিয়া থাকেন। অর্থের অসদ্ব্যবহার যে অবনতির একমাত্র কারণ, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মদ্যের মদ্যতায় সংসারে যে কত লোকের অকালমৃত্যুর সংঘটিত হইতেছে, কত খুন, কত ভয়ানক ভয়ানক নির্য্যাতন, কত পাশব দৃশ্য অভিনীত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গতবৎসর এক বঙ্গদেশে সুরাপান জনিত খুনের সংখ্যা, ৫৩৭ টি। সুরাপানে আত্মহত্যা ৫৬ টি। বৎসর বৎসর এই হিসাবে আত্মহত্যা ও খুন হইলে সংসারের যে কত ক্ষতি, তাহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়।

দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি।

সুরাপানে দৈহিক অবনতিও নিতান্ত কম নহে। যকৃৎ সুরার ছায়ানুবর্ত্তী। যেখানে সুরা সেইখানেই যকৃৎ। * সুরাপায়ীর মৃত্যু এই রোগেই প্রায় হইতে দেখা যায়।

জানিনা, হিন্দুসন্তান ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া কি উপকারের জন্য এই বিষ উদরস্থ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করেন। সুরাপায়ীর নেশা ছুটিবার সময় যেরূপ চিত্তবিকৃতি দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় এমন অপকর্ম্ম আর জগতে নাই। স্বেচ্ছায় মদ্যপান করিয়া কেন এ যন্ত্রণা ভোগ করেন, সামান্য ক্ষণিক আনন্দের জন্য অন্য অন্য আনন্দ নয়—অতি জঘন্য আনন্দ ভোগের জন্য কেন যে তাঁহারা নিজের শারীরিক ও বৈষয়িক উন্নতির পথ জন্মের মত রুদ্ধ করেন, তাহা ভাবিয়াও পাই না।

জগতের কোন জাতির মতে—কোন শাস্ত্রের বচনে মদ্যপানের ব্যবস্থা নাই। যদিও কোন কোন শাস্ত্রে দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ মদ্যপানের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলেও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সেই সমস্ত বচনের উদ্দেশ্য ও অর্থ কি? বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রের অর্থান্তর ঘটিত বিবাদ চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি। সেই হেতু কোন বিষয় প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে উদ্ধৃত বচনের অর্থ সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক।

আমাদিগের হিন্দুসমাজ মনুপ্রকটিত সংহিতানুসারে চালিত হইতেছে। সেই সংহিতায় সুরাপানের অবৈধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। (১) বাইবেলেও সুরাবিষপানের অযৌক্তিকতা সুন্দর প্রতিপন্ন হইয়াছে। (২) কোরাণে মদ্য পিতৃশোণিত তুল্য বলিয়া বর্ণিত

* বঙ্গের প্রধান ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুরাকে "যকৃৎ-জননী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুরাপানে মানবের মানসিক পরিবর্ত্তন কতদূর হয়, তাহার (বিষবৃক্ষের) দেবেন্দ্রচরিত্র তাহার জলন্ত প্রমাণ।

(১) সুরাং পিত্ব দ্বিজো মোহাৎ অগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিলমিলিষাৎ ততঃ॥
মনুসংহিতা ১১শ অঃ, ১১ শ্লোঃ।

(২) Wine biteth like a serpent and stingeth like an adder Solomon,s Bible X X III.

হইয়াছে। (৩) ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, "মদ্য শিক্ষাপথের পরম শত্রু। ইহার ছায়াও স্পর্শ করিবে না।" ঈসা বলিয়া ছিলেন, "সুরাবিষ জগৎকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। হে শিষ্যগণ, তোমরা ইহাকে বিষ বলিয়া জানিও।" ঈশা বলিয়াছিলেন, "হে শিষ্যগণ! যদি সংসার মাদক ও দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে বিনা আয়াসে মানবের মুক্তি লাভ হইবে।" মাইকেল কুপার বলিয়াছেন, "সংসারের পাপ কেবল মদ্য। ঈশ্বর মদ্যপায়ীর জন্যই নরক সৃজন করিয়াছেন।" (৪) মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুকালে বলিয়া ছিলেন, "বন্ধুগণ! আমি যে উৎকট রোগে প্রাণ হারাইলাম, অতিরিক্ত মদ্যপানই ইহার কারণ। আমি আজ আপনাদিগকে সতর্ক করিতেছি, আর যেন কেহ এ বিষ পান করিয়া আমার মত মৃত্যুমুখে নিপতিত না হন!"

বঙ্গের কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন মাদকসেবনের পরিণাম ফলস্বরূপ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম লইয়া আর কাজ নাই। পরন্তু মাদকসেবনের বিষময় ফল অল্পাধিক সকলেই জ্ঞাত আছেন।

আজকাল খোলাভাঁটির কৃপায় দেশে দেশে নগরে নগরে পল্লিতে পল্লিতে মদ্যপের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চারি আনা মাত্র উপার্জ্জন করে, তাহারাও চারি পয়সার মদ্যপান করিয়া সার এস্‌লি ইডেন মহারাণীকে দুই বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট আয়ের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হয় নাই সত্য, কিন্তু এদিকে বঙ্গবাসীর যে কি প্রকার ঘোরতর অবনতি হইতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। পূর্ব্বে অনেকে ইচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া মাদক সেবনে বিরত হইত। প্রথমে অত্যধিক অর্থের আবশ্যক, দ্বিতীয় সর্ব্বস্থানে উহা প্রাপ্ত হইবার উপায় ছিল না। কিন্তু এক্ষণে মদ্য অনায়াসলভ্য হইয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় খোলাভাঁটি, দুই চারি আনায় বোতল বোতল মদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,

(৩) Vide Moor's "T. of Koran" Prge I69.

(৪) Kupper's Weekly Lecture.

সুতরাং লোকের অভাব কি? গভর্ণমেণ্ট এই অধঃপতনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ইহার বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি খোলাভাঁটির ফলাফল, না বুঝিয়া এ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগের কথা নাই, কিন্তু যদি জানিয়া শুনিয়াও অর্থাগমের জন্য এ প্রথা প্রচলিত করিয়া থাকেন, তবে আমরা বুঝিব, আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই—আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আর কেহ নাই।

মদ্যপানের ফলাফল সম্যক প্রকারে বর্ণন করিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া উঠে। সেই জন্য সংক্ষেপে দুই একটি কথা প্রস্তাবনা স্বরূপ বলিয়া রাখা গেল। মাদক সেবনের অপকারিতা জ্ঞাত নহেন, এমন ব্যক্তি অতি কম। তাই বলি, যাঁহারা জানিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে এই বিষের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করুন। বঙ্গবাসীর উন্নতির ভার বঙ্গবাসীমাত্রেরই প্রতি নির্ভর করিতেছে। এ ভার ঈশ্বর কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছে। অতএব সাধারণেরই কর্ত্তব্য, মদ্যপগণকে সংশোধন করা। যাহাতে বঙ্গবাসী সতর্ক হইতে পারেন, মদ্যপগণ আর যাহাতে এ বিষের প্রলোভনে পতিত না হন,—তাহাতে বিহিত বিধানে যত্নবান হওয়া ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দশম প্রবন্ধ।

অকালমৃত্যু।

বর্ত্তমান সময়ে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অধিক দিনের কথা নহে, শত বর্ষ পূর্ব্বে অকালমৃত্যুর কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যাইত না। অতি পূর্ব্বকালে ত অকালমৃত্যুর নামও কেহ জানিত না। রামরাজার রাজত্ব কালে এক অকাল মৃত্যু লইয়া কত কাণ্ড হইয়াছিল। আর এখন যত দেখি, বৃদ্ধ বয়স কেহই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। পুত্র মাতাকে নয়ন জলে ভাসাইয়া,—বৃদ্ধ পিতার হৃদয় ঘোরতর মর্ম্মযন্ত্রণায় দগ্ধ করিয়া, পরিবারবর্গকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া যুবা পুত্র অকালেই

শমনদ্বারে উপনীত হইতেছে। গত বর্ষের স্বাস্থ্যবিবরণীর হিসাবানুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গত বৎসরের মৃত্যু সংখ্যায় গড় বয়স ৩১ বৎসর ৭ মাস। অতএব এতদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, যতগুলি মৃত্যু, তাহার সকল গুলিই অকালে। কালপ্রাপ্ত হইয়া অতি অল্প লোকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, অকালমৃত্যুর কারণ কি এবং ইহা নিবারণের কোন উপায় আছে কি না।

অনুসন্ধান করিলে অকালমৃত্যুর যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ পৈত্রিক দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলপিতার সন্তান কখনই দীর্ঘজীবন পাইতে পারে না। জন্মদাতার দৈহিক সামর্থ্যের তারতম্যে সন্তানের দেহের স্ফূর্ত্তি ও আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাঠক পিতার সহিত পুত্রের দৈহিক ও মানসিক ঐক্যতা লক্ষ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

নিজের দুর্ব্বলতাও অকালমৃত্যুর একটি কারণ। পিতার অনুরূপ দৈহিক উন্নতি ও সামর্থ্যলাভ করিয়াও যৌবনে যাঁহারা নিজের শরীর নষ্ট করিয়া ফেলেন, অযথা চিন্তা, ইন্দ্রিয়পরিচালন ও নানাবিধ শরীরক্ষয়করী কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের জীবনও অকালে নষ্ট হয়।

পৈত্রিক পীড়াগ্রস্ত হইলেও অকালমৃত্যু ঘটে। হাঁপ, যক্ষা, কুষ্ঠ, ধবল প্রভৃতি কয়েকটি রোগ পুরুষানুক্রমে ভোগ করে। কোন কোন রোগ আবার এক পুরুষ বাদ দিয়া প্রতি তৃতীয় পুরুষকে আশ্রয় করে। এই সমস্ত পৈত্রিক রোগে আক্রান্ত হইলেও অকালমৃত্যু ঘটে।

মানসিক অতিরিক্ত পরিশ্রম অকালমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে সকল মহাত্মা স্ব স্ব অসাধারণ প্রতিভাবলে নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, যাঁহারা বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াও পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিবলে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইংলণ্ড কি অন্যদেশ ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ভারত-বিখ্যাত মহাত্মারা অকালেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। অকাল মৃত্যুর প্রমাণ বঙ্গদেশে বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অকাল মৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ নৈসর্গিক বিপ্লব। এই নৈসর্গিক বিপ্লব হেতু কত দেশ উৎসন্ন হইয়াছে, কত প্রাণী এক সময়ে—এক ক্ষেত্রে একটি সাময়িক নৈসর্গিক বিপ্লবে প্রাণ হারাইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই!

যতগুলি নৈসর্গিক বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সাময়িক পীড়া প্রধান। কয়েক বৎসর ম্যালেরিয়া রোগে বঙ্গদেশের কত প্রাণী নষ্ট হইয়াছে, বিসূচিকা রোগে কত কত নগর কত কত পল্লি একবারে শ্মশান দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে, পাঠকগণের মধ্যে তাহা অবিদিত নাই।

মধ্যে মধ্যে সাময়িক বিবর্ত্তনে এক একটি সংক্রামক পীড়া উদ্ভুত হওয়ায় এক সময়ে বহুসংখ্যক অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। গত ডেঙ্গুয়া জ্বর, কৃষ্ণ জ্বর (Black Fever). মেলেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি কয়েকটি সংক্রামক রোগে বঙ্গের এক চতুর্থাংশ মনুষ্যের অকালমৃত্যু ঘটে।

বরিশালের কমিশ্যনারের রিপোর্টে প্রকাশ, গত বরিশাল জলপ্লাবনে দুই সহস্র প্রাণীর জীবন নষ্ট হয়। গত বৎসর পুরুষোত্তম যাত্রীদিগের অকালমৃত্যুর সংখ্যা পাঁচশতের কম নহে। কেহ কেহ বলেন, এক সহস্র যাত্রীর জীবন এই উপলক্ষে নষ্ট হইয়াছে। সময় সময় রেলওয়ের দুর্ঘটনাতেও অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

এই সমস্ত দুর্ঘটনার কতকগুলি নৈসর্গিক বিপ্লব এবং আর কতকগুলি দৈববিপ্লব। রেলওয়ে প্রভৃতিতে যে সমস্ত লোকের জীবন নষ্ট হয়, তাহা দৈববিপ্লব হেতু, এবং ঝড়ে, জলোচ্ছাসে কি সাময়িক সংক্রামক পীড়ায় যে সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, তাহা নৈসর্গিক বিপ্লব হেতুই হইয়া থাকে।

এস্থলে একটি পাশ্চাত্য গবেষণার অদ্ভুত সামঞ্জস্য পাঠকগণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে অকালমৃত্যু সংসারের উপকারার্থ হইয়া থাকে। সাময়িক পীড়াদিও নৈসর্গিক বিপ্লবে মানবের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যদি নৈসর্গিক বিপ্লবে মধ্যে মধ্যে এক ক্ষেত্রে কতকগুলি জীবের ধ্বংস না হইত, তাহা হইলে সংসারে জীবের স্থান সংকুলান হইত না। আহারাভাবে এককালে সংসারের সমস্ত মনুষ্য মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। সাময়িক বিপ্লবে কতকগুলি মনুষ্য নষ্ট হয় বলিয়া সংসারের শান্তি রক্ষা হয় এবং লোকে

দুর্ভিক্ষ হইতে অনেকাংশ রক্ষা পায়। জগদীশ্বর এই জন্যই সাময়িক বিপ্লব দ্বারা ধরায় গুরুভার লঘু করেন। (১) এই যুক্তি বলে অকালমৃত্যু জগতের উপকার ও সৃষ্টিরক্ষার একটি প্রধান উপাদান।

যুদ্ধবিগ্রহ সংসারের হিতের জন্য। পূর্ব্বকালে আমাদিগের রাজা প্রার্থনা করিতেন, সর্ব্ব প্রযত্নে যত্ন করিতেন, কি করিলে রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়। লোকে গর্ব্ব করিয়া বলিত, অমুক রাজত্বে অশান্তির নাম মাত্র নাই। রামরাজ্য বর্ণনায় বাল্মিকী বলিয়াছেন, "সৈন্যগণ সকলেই সৈনিকোচিত বেশ পরিত্যাগ করিয়া, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। অস্ত্রাগারের অস্ত্র সমূহ বহুদিন ব্যবহারাভাবে অকর্ম্মণ্য হইতেছে।" এই সমস্ত বাক্য কেবল শান্তির চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গের প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু শান্তির মূর্ত্তি দেখাইতে লিখিয়াছেন, " * * দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া নগরে গেল। সেখানে তাহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।" এ সকল ধারণা বাঙ্গালার। বাঙ্গালীর যাহা প্রার্থনা,—আমাদের যাহা প্রাণের বাসনা, তাহা প্রাচীন বাল্মীকি হইতে আধুনিক বঙ্কিমবাবুর উক্তি পর্য্যন্ত দেখাইলাম, আর আমাদের রাজ-জাতির মহাপণ্ডিতগণের মত কি, তাহাই এখন দেখা যাউক। আরও বক্তব্য যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বজাতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতানুসারেই দেশের সকল প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর মতানুসারেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে, ইহাও আমা-দিগের বিশ্বাস।

জন ষ্টুয়ার্ট মীল লিখিতেছেন, "সাময়িক সমরের আবশ্যকতা আমরা অন্তরের সহিত অনুমোদন করি। কতকগুলি লোকের নিধনে সংসারের সংকীর্ণতা বিদূরিত হয় এবং দেশের আহার্য্য, ধন ও পণ্যদ্রব্য বৃদ্ধি হেতু সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সংসারের আহার্য্য দ্রব্যের মহার্ঘ্যতা বিদূরিত করিবার জন্য সংসারের একান্ত আবশ্যকতা স্বতঃসিদ্ধ। (২) এমন উদরসর্ব্বস্ব দার্শনিকের দর্শন সুসভ্যদিগের অন্তরের সহিত অতিযত্নে গ্রথিত আছে।

(১) Vide Dr. Holkar's Lectnre on Natire and men."

(২) Vide J. S. Mlll's "Lecture on war."

দার্শনীক ম্যাল্‌থস্‌ এই নীতির সমর্থন করিয়া লিখিতেছেন, "জগতের খাদ্য সংখ্যা অপেক্ষা লোক সংখ্যা প্রতি পঞ্চবিংশতি বর্ষে দ্বিগুণ হইয়া থাকে। এমত স্থলে কোন নৈসর্গিক বিপ্লবে প্রাণীনাশ ব্যতীত সংসারের আহার্য্য সংকুলন হইবার কি শান্তিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। (৩) এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য। ইতিপূর্ব্বে ভারতের লোকসংখ্যা কেবল মাত্র দ্বাদশ কোটী ছিল, প্রথম জনসংখ্যায় সেই দ্বাদশ কোটী হইতে বর্দ্ধিত হইয়া বিশংতি কোটীতে পরিণত হয়, আবার গত জনসংখ্যায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে পঞ্চবিংশতি কোটী মানব বসতী করিতেছে।

এই খাদক ও খাদ্য সংখ্যার সামঞ্জস্য করিতে হইলে অবশ্যই লোক ক্ষয় বা ভবিষ্যজন্ম রুদ্ধ করা আবশ্যক। কেন না, উত্তরোত্তর লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে খাদ্যাভাব হওয়া আশ্চর্য্য নহে। খাদ্য ও খাদক সংখ্যা সম তুল্য থাকাই আবশ্যক, অন্যথা দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। (৪)

লোকক্ষয় আবশ্যক হইলেও তাহা প্রার্থনীয় নহে, এ কথা অন্য কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। বরং ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর। (৫) এখানে আরও একটী কথা আবশ্যস্বীকার্য্য যে, ভবিষ্য সন্তানোৎপাদনে বিরতি,

---

(৩) The necessary effects of these tow differnt rates of increase, when brought together. will be very striking taking the whole earth, emigration would ofcourse be excluded, and whose the human race would increase as the numbers 1. 2. 4, 8. 16. 32. 64. 12. 8. 256. and the subsistence would only increase at the rate of 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. and 9.

Malthus "On Population" page 276.

(৪) "There is a principle in human Society, by which population is perpetualsy kept down to the level of the means of subsisitence.

Godwin's guide. Page 279.

(৫) On this subject Mr. Maethus. ruled Three propositions viz;—

যাবন্ন বিন্দতে জায়াস্তাবদর্দ্ধ ভবেৎপুমান।

বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। যে হিন্দুধর্ম্মে পুত্র ভিন্ন স্বর্গলাভের উপায় নাই, যে পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করেন, কোন্ হিন্দু সেই সন্তান কামনা জগতের ইষ্টার্থ পরিত্যাগ করিবেন?

যদি ও কেহ এ প্রবৃত্তি পরিহার করিতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলেই বা উপায় কি? ইন্দ্রিয় পরিচালন প্রবৃত্তি দমন করা যে সকলের পক্ষে সম্ভবে না, ইহা ত নিশ্চয়। আর ইহার প্রস্তাব করিয়াও কেবল হাস্যাস্পদ হওয়া ভিন্ন অন্য কোন লাভের প্রত্যাশা নাই। জগতের লোক যদি নিষ্কাম নির্লিপ্ত এক একটি শঙ্করাচার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও সংসার চলে না। অতএব উপায় কি? যে উপায় অবলম্বিত হইলে ইচ্ছামত পুত্রকন্যা উৎপাদন করিবার অধিকার জন্মে, সেই উপায়েই বোধ হয় এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত সকলে রাশী রাশী পুত্রকন্যা পরিবৃত না হইয়া প্রত্যেকে যদি নিয়মিত সংখ্যায় পুত্রকন্যা উৎপাদন করেন, তাহা হইলে অকালমৃত্যুকেও ডাকিতে হয় না, যুদ্ধেও রক্তপাত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

যে উপায় অবলম্বিত হইলে পুত্রকন্যা সমুৎপাদন ইচ্ছায়ত্ত হয়, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি, পরন্তু এ সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান না জন্মিলে তৎসাধনে ক্ষমতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ দ্বারা লোক ক্ষয় করিবার অনাবশ্যকতাই অধিকতর অনুমোদিত। কেন না, পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসরণ করিলে যদি স্বেচ্ছা প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সন্তানোৎপাদন মানবের আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে যে পরিমাণে সংসারে স্থান আছে, তাহাতে বসতীর কষ্ট

Ist.—Population is necessarily limited by the ,means of subsistance.

2ud.—Population increases. when the means of subsistence increase.

3rd.—The checks which repress the superior of power of populetion and keep its effects on a level with the means of subsisteuce, are ail rasolvable in te moral restraint, vice and misery.

Malthus Law of population.

নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বী প্রসববেদনম্।

হইবার সম্ভাবনা নাই এবং যে পরিমাণে খাদ্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেও দুর্ভিক্ষ হইবার কোন আশঙ্কা পরিলক্ষিত হইতে পারে না।

অকালমৃত্যু নিবারণের উপায়, ইতিপূর্ব্বে ইহার যে কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার বৈপরিত্য সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যাহাতে যাহার সংঘটন তাহার বৈপরিত্যাচারই তাহার প্রতিবিধান উপায়। অতএব সে সম্বন্ধে অধিক চিন্তা অনাবশ্যক।

সংসারতত্ত্বে অনেক কথা লিখিবার আছে, লিখিবার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু বিষয়টি বড় গুরুতর এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত সাধারণের দৃষ্টি কম। সুতরাং ইহার কথাগুলি তাঁহাদিগের ভাল লাগিবে কি না, জানিবার জন্য সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় সূচনা করিয়া রাখা গেল। বলা বাহুল্য, আশা পাইলে এ সকল তত্ত্ব বিশেষ রূপে বিবৃত হইবে।

শান্তিরাহি সর্ব্বত্র শিবম্।

চিকিৎসাতন্ত্র।

পীড়া ও ঔষধ।

প্রকৃত প্রস্তাবে রোগের লক্ষণ, ব্যবস্থা, ঔষধ প্রস্তুতকরণ ও পথ্যাদির সম্যক ব্যবস্থা বিশেষ প্রকারে লিখিবার এ স্থান নহে। কেবল কয়েকটি রোগের ঔষধ মাত্র ইহাতে লিখিত হইল। পাঠকগণ অন্য কোন উপায়ে বা সাধারণ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া রোগনির্ণয় করিবেন এবং এতল্লিখিত ঔষধ সেবন করাইবেন। তবে ইহা নিশ্চয় যে, রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধ সেবন করাইলে নিশ্চয়ই ফললাভ হইবে। ইহাতে যে কয়েকটি রোগের ঔষধ লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এবং কিয়দংশ বিশ্বস্ত চিকিৎসকগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহারা যে যে ঔষধে ফললাভ করিয়াছেন, সেই সেই ঔষধগুলিই গৃহীত হইয়াছে। নতুবা পুঁথিগত ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের কলেবর পূর্ণ করা হয় নাই। ঔষধগুলি কিরূপ ফলপ্রদ, পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইবে। আমাদিগের অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

রক্তাতিসার।

হরিদ্রা চূর্ণ, কলিচুণ ও মধু প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা পরিমাণে একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

হাঁপানি কাশি।

এই কাশির প্রাদুর্ভাব কালে শরীর অতি জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, মেরুদণ্ডের সঙ্কোচনে শরীরও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, আহারে রুচি থাকে না, উদরের পীড়াও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। শ্বাসবায়ু নিরোধই এই রোগের প্রধান উপসর্গ সুতরাং এই পীড়ার যন্ত্রণা যে অপরিসহ; তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। হাঁপানি নিবারণের উপায় নিম্নে বিবৃত হইল।

ঔষধ।—এক তোলা পরিমাণে সোহাগা জলে ভিজাইয়া সেই জলে একখানি ব্লটিং কাগজ উপর্য্যুপরি সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া দিবে, পরে সেই ব্লটিং কাগজের পলিতার ধুম ঘ্রাণ লইলে হাঁপানি বন্ধ হইবে।

রক্তমূত্র।

দশপাত অলক্তক অৰ্দ্ধসের দুগ্ধে ভিজাইয়া, সেই দুগ্ধ এক ছটাক পরিমাণে প্রতিদিন তিনবার সেব্য।

মূত্রবদ্ধ।

অৰ্দ্ধ পোয়া শুষণীর শাক ও অৰ্দ্ধতোলা যবক্ষার একত্রে অৰ্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই জল দুই বার সেবন করিবে।

হিক্কা।

স্তনদুগ্ধ বা আল্‌তা ভিজার জলের নস্য ব্যবহারে হিক্কা নিবারিত হয়। ডাবনারিকেলের জল এক ছটাক ও গব্যদুগ্ধ এক ছটাক একত্রে সেব্য।

বিসূচিকা।

আপাঙ্গের মূল জলে বাটীয়া সেবন করিলে বিসূচিকা রোগ আরোগ্য হয়। ইন্দ্রযব চারি তোলা এক সের জলের সহিত জ্বাল দিয়া অৰ্দ্ধ সের থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া লইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক পরিমাণে সেবন করাইবে।

ক্ষত।

একটি তাবার পাত্রে একছটাক ঘৃত রাখিবে। পরদিন প্রাতে একটি কুঁচিলার সিকি পরিমাণ ঘষিয়া ঐ ঘৃত তুলার দ্বারা প্রতিদিন তিনবার ক্ষত স্থানে দিলে উপদংশাদি সৰ্ব্বপ্রকার ক্ষত তিন দিনে আরোগ্য হয়।

প্রমেহ।

একটি পুঁই শাকের শিকড় এক পোয়া জলের সহিত বাটিয়া স্নানান্তে সেবন করিবে, পরিশেষে ভিজা কাঁচা কলাইয়ের দাইল শর্করার সহিত সেবন করিবে, তাহা হইলে তিনদিনে প্রমেহ আরোগ্য হইবে।

বমন নিবারণ।

এক ছটাক ইক্ষু চিনির সরবতের সহিত দশ বারটি কচি আমের পাতা রগড়াইয়া, সেই সরবৎ সেবন মাত্রেই বমন নিবারণ হইবে।

আঁচিল।

হরিদ্রাদগ্ধ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আঁচিলের উপর প্রলেপ দিবে।

দুরবীক্ষণ আবিষ্কার ১৫৯০ খৃঃ।

বাঘী।

ভেলার আঠার নেক্‌ড়া ভিজাইয়া, তাহার উপর অল্প পরিমাণে কলিচুণ মাখাইয়া পটী দিলে এক রাত্রিতেই বাঘী বসিয়া যায়।

শীরঃপীড়া।

কুলপাতার উল্টা দিকে কলিচুণ মাখাইয়া রগে দিবে।

ছুলি।

পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘসিয়া সূর্য্যপক্ক করত প্রলেপ দিবে।

চুল্‌কনা।

শ্বেতচন্দন ও কর্পূর একত্রে মিশাইয়া গাত্রে মাখিলে চুলকনা দুই তিন দিনের মধ্যেই নিবারিত হয়।

বসন্ত।

কণ্টিকারীর মূল অর্দ্ধ তোলা পাঁচটি মরিচের সহিত বাটীয়া একুশটি বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে বাসীজল অনুপানে সেবন করিলে বসন্ত রোগ আরোগ্য হয়।

পারদ নিবারণ।

পাঁড় কুমড়ার জল দুইসের ও পুরাতন গুড় এক পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া; প্রাতে এক পোয়া ও বৈকালে অর্দ্ধ পোয়া সেবন করিলে শরীরস্থ পারদ নির্গত ও ক্ষত বিশুদ্ধ হয়।

টাক।

কাঁচাদুধের গাঁজলা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া টাকে প্রয়োগ করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে টাকের উপর চুল উঠিবে।

আম্‌বাত।

বিচুতীর পাতা ঘৃতের সহিত পাক করিয়া খাইলে, আম্‌বাত আরোগ্য হয়।

নেতরোগ।

চন্দন ও মধু একত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়। সামুকের জলদ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে চোক উঠা আরোগ্য হয়।

শব্দের গতি প্রতি ৮ সেকেণ্ডে এক মাইল।

উৎকুণ নিবারণ।

পানের রস পদতলে লেপন করিলে উৎকুণ মরিয়া যায়।

খোস।

শেয়ালাকাঁটার আঠা, ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রয়োগ করিলে খোসের যাতনা অপগত ও ক্ষত শুষ্ক হয়।

গুল্ম।

বচ দুই তোলা, হিং পাঁচ তোলা, যবানি ছয় তোলা ও চিতার নুল সাত তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে গুল্ম রোগ আরোগ্য হয়।

প্লীহা।

ছাগ দুগ্ধের সহিত আদা সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয়। প্লীহাজনিত বিষমজ্বর প্রতিদিন তিনটি করিয়া রশুন সেবন করিলে নিরাময় হয়।

শোষ্ ঘায়ের ঔষধ।

পুরাতন ঘৃত কুড়ি তোলা, কাঁচাতুতিয়া চূর্ণ পাঁচ তোলা, কলিচুণ এক তোলা মিশ্রিত করিয়া, এই মলম ক্ষতে দিবে।

পাঁচ্ড়ার মলম।

গব্যঘৃত এক পোয়া শতবার ধৌত করিয়া তাহাতে মুদ্রাশঙ্খ এক ছটাক, সফেদা অর্দ্ধ ছটাক একত্রে মিশ্রিত ও মর্দ্দন করতঃ যে মলম প্রস্তুত হইবে, তাহা পাঁচড়ায় দিলে অতি অল্পদিনেই আরোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।

মুখের দুর্গন্ধ নিবারণ।

যবানী চারি তোলা, মৌরী চারি তোলা, যষ্টিমধু চারি তোলা, ধনিয়া চারি তোলা, একত্রে চারি তোলা মিশ্রির সহিত মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ শয়নকালে ছয়মাষা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে।

চক্ষুর ছানী নিবারণ।

শ্বেত পুনর্নবার শিকড় পুরাতন কাঁজির সহিত ঘর্ষণ করিয়া, চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে ছানী কাটিয়া যায়।

চোক উঠা।

পাতিলেবুর রসে পাতিলেবুর মূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে, চোক উঠা আরোগ্য হয়। চক্ষু অধিকতর লাল হইলে গোলাপ জলে ধৌত করিলে লাল কাটিয়া যাইবে। কতকগুলি গেঁড়ি (গুগুলী) একটি শুষ্ক পাথরের বাটীতে রাখিলে কিয়ৎকালপরে আপনা হইতে জল বাহির হইবে, সেই জলে চক্ষুর লাল কাটিয়া যায়।

রক্ত বমন।

গোলাপ এক তোলা ও কাঁচা ডুমুরের রস দুই তোলা একত্রিত করত সেবন করিলে তিন দিবসে রক্তবমন প্রশমিত এবং সপ্তাহকালের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

চষিপোকা নিবারণ।

হস্তে চষিপোকা লাগিয়া হস্তের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করে। প্রাতঃকালে তেলাকুচা পাতার রস উভয় হস্তে মর্দ্দন করিলেই আরোগ্য হইবে।

দন্তকীট।

বালকদিগে দুধে দাঁতে পোকা লাগিয়া বড়ই কষ্ট প্রদান করে। এমন কি, ইহার যন্ত্রণায় বালকদিগের জ্বর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বড়পানার শিকড় চিবাইতে দিলেই বালকের দন্তের পোকা মরিয়া যাইবে এবং কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকিবে না।

পৃষ্ঠবেদনা।

পৃষ্ঠ, ঘাড় বা যে কোন স্থানেই কেন বেদনা হউক না, থানকুঁড়ীর পাতা লবণ সংযোগে রস নির্গত করিয়া প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে।

অর্শ।

লৌহপাত্রে তুঁতিয়া রাখিয়া তাহা লেবুর রসে পূর্ণ করিয়া দুই তিন দিন রাখিলে তুঁতিয়া তাম্র হইবে, সেই তাম্রের অঙ্গুরী প্রস্তুত করতঃ বাম হস্তে ধারণ করিলে অর্শরোগ শান্তি হয়।

টাকশালে অর্থাৎ যে স্থানে প্রচুর রৌপ্য গালিত হয়, তথাকার ঝুল গলাইলেও তাহা হইতে রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রৌপ্যের অঙ্গুরী পূর্ব্ববৎ বামহস্তে ধারণ করিলে অর্শরোগ নিরাময় হয়।

সুরা আবিষ্কার ২৭৬ পৃঃ।

নখকুনী।

তুতিয়া ভিজার জল নখকুনীতে প্রলেপ দিলে এবং তুতিয়া ভিজার জল দ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, নখকুনী ভাল হয়।

পাঁকুই।

কর্দ্দমাদিতে অধিকক্ষণ থাকিলে, অঙ্গুলীর সংযোনস্থানে ক্ষত হয়, সাধারণত চলিত কথায় ইহা পাঁকুই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পাঁকুই হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, মুদীর পাতার রস প্রয়োগ করিলে, তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়।

পদতল ফাটা।

পা ফাটিলে চলিতে বিশেষ কষ্টবোধ হয়। ইহার ঔষধ লিখিত হইতেছে। সাদা ধুনা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ফাটায় লাগাইয়া অগ্নির উত্তাপে সেক দিলেই আরোগ্য হয়।

রাত্র্যান্ধতা।

অনেকে রাত্রিকালে দেখিতে পান না। রাত্রিতে কোনস্থানে গমনাগমন করিতে হইলে, বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠে। এই রোগ প্রতীকার করিতে হইলে, সদ্য গাভীঘৃত রোগীর তালু ও চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে, রাত্র্যান্ধতা বিদূরিত হইয়া, চক্ষুঃজ্যোতি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হয়।

টাক্।

টাক রোগ হইলে, মস্তকের শোভা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কেশই মস্তকের শোভা, সুতরাং কেশহীনতা যে অত্যন্ত শোভানষ্টকারী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আবার এই রোগে যদি স্ত্রীলোক আক্রান্ত হয়েন, তাহা হইলে আরও কষ্টকর। এক্ষণে এই টাক্ রোগ নিবারণের উপায় লিখিত হইতেছে। এতল্লিখিত নিয়মানুরূপ ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার করিলে ফললাভে সমর্থ হইবেন।

হরিতকী এক তোলা, বহেড়া এক তোলা এবং বৃহতীর মূল এক তোলা একত্রে মধুর সহিত পেষণ করিয়া টাকে প্রযুজ্য।

কুকুর ও শৃগালের বিষনাশ।

শৃগাল দংশনে অন্য শৃগালের রোম এবং কুকুর দংশনে অন্য কুকুরের রোম কদলীর মধ্যে করিয়া সেবন করাইলে, বিষ নষ্ট হয়।

লেবু ও তেঁতুলাদি অম্লে রক্ত পরিষ্কার করে।

ইন্দুর নিবারণ।

গৃহে ইন্দুরের উপদ্রব হইলে, আকন্দের পাতার ধূম গৃহমধ্যে ও ইন্দুর গর্ত্তে প্রদান করিলে, ইন্দুরসমূহ চিরদিনের জন্য সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এক সপ্তাহ ক্রমান্বয়ে ধূম দিবার প্রয়োজন।

স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি।

প্রসূতির স্তনে প্রচুর দুগ্ধ না থাকিলে, শিশুর জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। মাতৃস্তনে বালকের শরীর গঠিত ও সেই পরিমাণে তাহার সুখস্বচ্ছন্দতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বালক প্রচুর দুগ্ধ পান করিতে না পাইলে, যদি জীবিতও থাকে, তথাপি তাহার শরীর পরিপুষ্ট হয় না। আজীবন দুর্ব্বল অবস্থায় ক্ষুন্নমনে কালযাপন করে। এজন্য সন্তানকে প্রচুর স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি প্রসূতীর স্তনে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিলেই স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হইবে, সন্দেহ নাই।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূলচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, আতপ তণ্ডুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এক ছটাক দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে, যথোপযুক্ত ফললাভে সমর্থ হওয়া যাইবে।

পেটফাঁপা।

অত্যধিক আহার্য্য উদরস্থ করিলেই, অজীর্ণ ও তজ্জন্য পেট ফাঁপিয়া চোঁয়া উদ্গার উঠিতে থাকে, আহারে রুচি থাকে না। ইহা নিবারণ করিতে হইলে, পাঁচটী মরিচ চূর্ণ এক পোয়া মিশ্রি ভিজার জলের সহিত পান করিতে হয়। তাহা হইলেই পেটফাঁপা বিদূরিত হইয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ক্ষুধা হয়।

রজঃরোধ।

স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু রুদ্ধ হইলে, তাহার সন্তানের সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য ইহার নিবারণার্থ ঔষধ সেবন আবশ্যক। প্রতিদিন পাঁচটী কাঁচা সুপারি চিবাইয়া উদরস্থ করিলে, পুনর্ব্বার রজঃ নির্গত হইবে।

হলব্বা বৃক্ষের মূল কাঁজির সহিত সেবন করিলেও, নষ্টঋতু আরোগ্য হয়।

কেরোসিন তৈল ছারপোকার ঔষধ।

সহজ জ্বর।

কেবলমাত্র পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর হইলে, দুই তোলা গুলঞ্চের রস সেবন করিলেই নিরাময় হয়।

কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপে জ্বর হইলে, এক তোলা হেলেঞ্চা রস ও এক তোলা ক্ষেত পর্পটীর রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, নিরাময় হয়।

কেবলমাত্র কফের প্রকোপে জ্বর হইলে, এক তোলা তুলসী রস ও এক তোলা সেফালিকার পত্ররস সেবন করিলে, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

বাধকবেদনাশান্তি।

ঋতুস্নানের পরদিন হইতে সিকি তোলা হাঁচুটীর রস ও সিকি তোলা পানের রস একত্রে স্নানান্তে তিন দিবস সেবন করিলে, অতি উৎকট বাধকের বেদনাও শান্তি হইবে।

ঘুর্ণিরোগ শান্তি।

যাহার সর্ব্বদা মস্তক ঘুর্ণিত হইতে থাকে, তাহাকে অন্নের সহিত প্রথমতঃ কচি পরিষ্কার দূর্ব্বা ঘাস ভাজা এক তোলা, তৎপরে বীজহীন ডুমুর ভাজা এক তোলা খাইতে দিবে এবং মস্তকে লাউয়ের তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। তাহা হইলে, ঘুর্ণিরোগ নিরাময় হইবে।

মাথাধরা।

ময়দা পাৎলা করিয়া জলে গুলিয়া রগে লাগাইলে, মাথাধরা আরোগ্য হয়। মুথাঘাসের রস রগে দিলেও মাথাধরা আরোগ্য হয়। হস্তের পেশী সবলে বন্ধন করিলে, তৎক্ষণাৎ মাথাধরার যন্ত্রণা প্রশমিত হয়, এমন অত্যাশ্চর্য্য মুষ্টিযোগ দ্বিতীয় নাই।

পানের উল্টা পিঠে চুণ লাগাইয়া, রগে বসাইয়া দিলেও, মাথাধরা নিবারণ হয়।

মূর্চ্ছাবায়ু শান্তি।

মূর্চ্ছারোগ স্থানবিশেষে সংঘটিত হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। মূর্চ্ছারোগগ্রস্থ ব্যক্তির বিদেশে গমন করা নিতান্ত অন্যায়। ইহা নিবারণের ঔষধ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বসোত এক পোয়া পরিমাণে লইয়া, তাহা জলদ্বারা বাটিয়া সমস্ত গাত্রে মর্দ্দন করিবে, দণ্ডত্রয় পরে উষ্ণজলে স্নান করিবে। এই ঔষধ তিন দিবস ব্যবহার বিধি।

নিশিন্দা মূলের ছাল অর্দ্ধ পোয়া কাঁজির সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া, সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন, নস্য গ্রহণ ও মস্তকের তালুদেশে প্রদান করিলেও, মূর্চ্ছারোগ নিরাময় হয়। এই ঔষধ সপ্তাহকাল ব্যবহার করাই বিধি।

ফোড়ার পাক।

গরুর দন্ত মাখনের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, ফোড়া কি বাঘিতে প্রলেপ দিলে, এক রাত্রির মধ্যে পাকিয়া যায়।

শ্বেতচন্দনের প্রলেপ দিলেও, ফোড়া পাকে এবং আপনা হইতেই পাকিয়া যায়।

ফোড়া বসাইবার ঔষধ।

রশুনের রস ও মেটেসিন্দুর একত্রে মিশ্রিত করিয়া, কুচ্‌কী কি বাঘিতে প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়।

ছোটগোয়ালের পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও, ফোড়া ও বাঘি বসিয়া যায়।

বরফও বাঘি প্রভৃতি বসাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাকা তেঁতুল বীজের শাঁষ সাতটী, চিনা বাসন ভাঙ্গার গুঁড়া এক ছটাক, মনসা গাছের পাতা অগ্নিতাপে উষ্ণ করতঃ তাহার রসে বাটিয়া, বাঘি বা ফোড়ায় প্রলেপ দিতে হইবে। পরিশেষে তাহার উপর ভেরেণ্ডার পাতা ও তদুপরি তুলা দিয়া উত্তমরূপ বন্ধন করিয়া দিবে। তাহা হইলে, সমস্ত দূষিত রক্ত জল হইয়া, প্রস্রাবদ্বার দিয়া নির্গত হইবে।

নাশারোগ।

দাড়িম্বের মূল এক তোলা, গেঁটিয়া দূর্ব্বা এক তোলা, হরিতকী এক তোলা, বহেড়া এক তোলা, কাঁচা আমড়ার শাঁস এক তোলা, কট্‌ফল এক তোলা সমভাগে চূর্ণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলেও নাশারোগ নিবৃত্তি হয়।

বসাক পত্র অর্দ্ধ পোয়া ও মধু অর্দ্ধ পোয়া মিশ্রিত করতঃ দুইবার সেবন করিলে, নাশারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

তিলফুল চূর্ণ সর্ষপ তৈলে পেষণ করতঃ সূর্য্যপক্ক করিয়া, তাহা মস্তকের তালুতে প্রয়োগ ও ঐ তৈলের নাশ লইলে, নাশারোগ নিরাময় হয়।

তোত্লা।

যাঁহাদিগের কথা কহিতে বাধে, তাঁহারা নিয়মিত কাঁকর মুখ মধ্যে রাখিয়া দিলে, তোৎলা রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

কর্ণে তালা লাগা নিবারণ।

দোক্তা তামাকু কলিকায় সাজিয়া দম কসিবে এবং ধূম পরিত্যাগ করিবে না, তাহা হইলে তালা ভাল হয়। প্রবাদ আছে, এই ক্রিয়া দ্বারা কালাও আরোগ্য হয়, কিন্তু ইহা আমরা পরীক্ষা করি নাই। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাহার ফলাফল আমাদিগকে জ্ঞাপন করাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

কয়েক খণ্ড আদা চর্ব্বণ কয়িয়া ডুব দিলেই, কাণের তালা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া যায়।

কর্ণ চাপিয়া আড়াইটী মরিচ চর্ব্বণ করিয়া, মুখ বন্ধ করতঃ কাণের চাপা ছাড়িয়া দিলে, তালা লাগা নিবারিত হইয়া থাকে।

আমাশয়।

কাঁচা আম্র লবণসংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে, আমাশয় প্রশমিত হয়। মাষকলাইয়ের দাইল হিং মিশ্রিত করতঃ উভয় দিকে কলাপাত দিয়া পিষ্টকবৎ করিবে। পরে সেই কলাপাত সহিত মাষকলাই দাইল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, অন্নের সহিত ব্যবহার করিলে আমাশয় নিবারিত হয়।

পুরাতন তেঁতুল এক ছটাক, এক পোয়া শীতল জলে ভিজাইয়া, সেই জল লবণসংযুক্ত করিয়া পান করিলে, আমাশয় রোগের শান্তি হয়।

আমরক্ত।

যদি আমরক্ত পীড়ায় আম নির্গমনকালে তৎসহ শোণিত নির্গত হয়, তবে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

আমধান্যের চাউল কাটখোলায় ভাজিয়া ভস্ম করতঃ তাহা এক পোয়া পরিমাণ জলে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপ শীতল হইলে, তাহাতে সামান্য পরিমাণে চিনি নিক্ষেপ করিয়া সেবন করিলে, আমরক্ত নিবারিত হইবে।

বলা বাহুল্য যে, আমরক্ত নিবারিত হইলে, তৎসহ আমাশয়ও নিবারিত হইবে।

বলবিবর্দ্ধক রস।

এই ঔষধ সেবনে বল বৃদ্ধি, শরীর কান্তিবিশিষ্ট, ক্ষুধা, অগ্নি ও মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হয়। এতগুলি গুণবিশিষ্ট ঔষধ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কালে এই ঔষধ সেবন বিশেষ প্রকারে নিষিদ্ধ। কেননা, গ্রীষ্মকালে অত্যধিক উষ্ণ হইয়া, শরীরের উপকার দূরে থাকুক, বরং অপকারই হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহারের সময়। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঔষধ সেবন করিলেই উপরোক্ত ফল-লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

ঔষধ।—লবঙ্গ দুই তোলা, জায়ফল দুই তোলা, জয়ত্রি দুই তোলা, গুজরাটি এলাচ দুই তোলা, এচগন্ধ নাগারি দুই তোলা, মহার্ব্বরী বচ দুই তোলা, পিপুল দুই তোলা, পিপুলমূল দুই তোলা, ত্রিফলা দুই তোলা এই কয়েকটী দ্রব্য উত্তমরূপে থেৎলাইয়া পুটুলী বাঁধিবে। পরিশেষে একটী পৃথক পাত্রে দুই সের জল ও অর্দ্ধ সের মিশ্রি রাখিয়া, তন্মধ্যে ঐ পুটুলী নিক্ষেপ করিবে। আবার পৃথক একটী পুটুলীতে দেড় তোলা হাঁচটি বাঁধিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরিশেষে পাত্রের মুখ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া, এক সপ্তাহ দিবারাত্রি রৌদ্র ও শিশিরে রাখিয়া দিবে। পরে প্রতিদিন এই রস এক ছটাক মিশ্রির পানার সহিত সেবন করিলেই উপরোক্ত ফল-লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। ঔষধ প্রস্তুতকালে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক, যেন কোন অংশে কোন প্রকার ত্রুটী না ঘটে।

দন্তরোগ।

দন্তপীড়া অতিশয় কষ্টকর। যে আহার্য্য মানমের প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, সেই আহার্য্য দন্তের সাহায্য ব্যতীত উদরস্থ হইতে পারে না, হইলেও পরিপাকের নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, আহার্য্য গ্রহণে শরীরের উপকার না হইয়া বরং অপকারই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, পরন্তু দন্তের আবশ্যক ও তাহা যথোপযুক্ত কার্য্যক্ষম রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

দন্তরোগ হইলে, তাহা নিবারণের নানাবিধ উপায় লিখিত হইতেছে।

ঔষধ।—নাগকেশর মূল এক তোলা ও আদা এক তোলা একত্রে বণ্টন ও তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিলে, দন্তের পীড়া উপশম হয়।

বৃহতীর মূল এক তোলা, নীলকণ্ঠফুলের মূল এক তোলা, একত্রে বণ্টন করিয়া তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিলেও, দন্তরোগ নিরাময় হয়।

আমের পীড়া।

ধাইফুল এক তোলা, লোধ এক তোলা, বৃহতী মূল এক তোলা, সুপক্ক দাড়িম ছাল এক তোলা, সমভাগে আতপ চাউলের জল দিয়া বাটিয়া, কুলের মত এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর বাসি জলের সহিত এক একটী বটিকা সেবন করিলে, আমের পীড়া নিরাময় হয়।

অসাময়িক গর্ভপাত।

অসাময়িক গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইলে, ঝাপি টেপারীর বীজ কদলীর মধ্যে পুরিয়া সেবন করাইলে আর গর্ত্তপাতের আশঙ্কা থাকে না। গর্ত্তিণী যথাসময়ে সুখে সন্তান প্রসব করেন।

প্রমেহ।

অর্দ্ধ সের দুগ্ধ ও অর্দ্ধ পোয়া কচি লাউ একত্রে এমনভাবে ক্ষীর করিবে, যেন লাউ গলিয়া দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপ কঠিন হয়। তিনদিন মাত্র এই ক্ষীর স্নানান্তে সেবন করিলে অতি উৎকট প্রমেহও আরোগ্য হইয়া থাকে।

উৰ্দ্ধগ নিবারণ।

উৰ্দ্ধগজনিত মস্তকের যন্ত্রণা প্রশমিত করিতে হইলে, লবঙ্গের ধূম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাগজের পলিতার ধূম নাশাপথে আকর্ষণ করিলেও উৰ্দ্ধগজনিত মাথাধরা নিবারিত হইয়া থাকে।

যবের চাউল কাঁচা দুগ্ধে বাটিয়া খাইলে এবং মস্তকে জলমিশ্রিত কাঁচা দুগ্ধের ধারা দিলে, উৰ্দ্ধগজনিত উৎকট মাথা ধরা, রগ টন্‌টনানি, মাথা ঘোরা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ নিবারিত হয়।

থুনকা।

ঔষধ।—হাঁচটী এক তোলা, গোলমরীচ এক তোলা, ঘৃতকুমারী এক তোলা, দগ্ধ হরিদ্রা ভস্ম এক তোলা এই দ্রব্য চতুষ্টয় ছাগ দুগ্ধে পেষণ

করিয়া স্তনের উপর প্রলেপ দিলে, একদিনে যন্ত্রণা নিবারণ ও উর্দ্ধসংখ্যা এক সপ্তাহ ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

মন্দাগ্নিনাশক বটিকা।

ঔষধ। বীজশূন্য বড় হবিতকী বার মাষা, বীজশূন্য বহেড়া বার মাষা, আমলকী বার মাষা, মৌরী বার মাষা, শ্বেতচিতার মূল সাত মাষা, শুষ্ক পদিনা সাত মাষা, ধনিয়া সাত মাষা, গুজরাটি এলাইচের দানা সাত মায়া, মুথা তিন মাষা, পিপ্পলী তিন মাষা, মরীচ তিন মাষা, সোহাগার খৈ দুই মাষা, লবণ এক তোলা, লাহোরী লবণ সাত মাষা, চূক এক তোলা এই কয়েকটী দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ কাগজীলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া, শুষ্ক করিতে হইবে। পরিশেষে পুনর্ব্বার কাগজীলেবুর রসে বাটিয়া, কুলের ন্যায় এক একটী বটিকা প্রস্তত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই ঔষধ প্রস্তত হইল।

প্রয়োগ।—প্রত্যহ প্রাতে একটী বটিকা জলের সহিত সেবন করিবে এবং রাত্রিতে শয়নকালে একটী বটিকা সেবন করিয়া নিদ্রা যাইবে। সমস্ত পরিপাক ও প্রাতে বাহ্য পরিষ্কার হইয়া, দিব্য স্বচ্ছন্দতা অনুমিত হইবে।

বাল্‌সা নিবারণ।

শিশুদিগের উৎকাশি, কণ্ঠনালী ঘড়্‌ঘড়ানি, কফ প্রভৃতিকে বাল্‌সা বলে। ইহাতে শিশুরা বড় কষ্ট পায়। রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেবল কাঁদিতে থাকে, স্তনপান করিতে চাহে না, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ইহার প্রতীকারের উপায় নিম্নে বিবৃত হইল।

ঔষধ। গোটা পান একটী, লবঙ্গ একটী, জায়ফল চূর্ণ এক আনা, এক তোলা পরিমাণ জলের সহিত বাটিয়া প্রদীপের শিখায় উষ্ণ করিয়া, দুই তিনদিন ব্যবহার করাইলেই শিশুর সমস্ত পীড়া নিরাময় হইয়া, পূর্ব্বের মত দুগ্ধপান ও হাস্য করিবে।

কর্ণরোগ।

জরদ বর্ণের ঘিয়ে কড়ি দগ্ধ করিয়া, চূর্ণ করতঃ এক সিকি পরিমাণে পাতিলেবুর রসের সহিত মিশাইয়া, কর্ণের ভিতর তুলার দ্বারা প্রবেশ করাইয়া রাখিলে, কর্ণরোগ নিরাময় হয়।

কাণ পাকিলে, গোলাপী আতর তুলায় করিয়া কাণের মধ্যে দিয়া রাখিলে, আরোগ্য হয়। সিমুলের মূল মধুর সহিত বাটিয়া কর্ণে দিলে, কর্ণশূল নিরাময় হয়।

কর্ণমূল ফুলিলে, মনসাসিজের পাতা অল্প পরিমাণে দগ্ধ করিয়া, তাহার রস আফিং সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফুলা নিরাময় হয়।

কেবলমাত্র টাট্‌কা চুণের প্রলেপ দিলেও ফুলা কমিয়া যায়।

সর্ব্বাঙ্গের বেদনা ও যে কোন প্রকার ফুলায় চুণের প্রলেপ দিলে, আরোগ্য হইতে দেখা গিয়া থাকে।

হাত পা জ্বালা।

তেলাকুচার পাতার রস দুই তোলা এবং তিলতৈল দুই তোলা প্রস্তর পাত্রে মাড়িয়া, রৌদ্রের তাপ দিলে যখন অত্যন্ত উষ্ণ হইবে, তখন সেই তৈল মস্তকে, হস্তে ও পদের তালুতে মর্দ্দন করিলে, হাত পা জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। কেবলমাত্র তেলাকুচার পাতার রসেও হাত পা জ্বালা প্রশমিত হয়।

জলদোষ।

কদম্বের পাতা দ্বারা অণ্ডকোষ উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিলে, জলদোষ নিবারিত হয়। ইহাতে একশিরাও নিরাময় হয়।

একশিরা।

একশিরা রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ। ইহার নিবারণ উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে। তাম্র অঙ্গুরী যে অঙ্গ স্ফীত হইয়াছে, তাহার বিপরীত দিকের পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পরিধান করিলে, একশিরার যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শিরঃশূল।

আমলকী চূর্ণ ঘৃতের সহিত নিয়মিত সেবন করিলে, পরিণামে শূলের আশঙ্কা ও তাহার পূর্ব্বোপসর্গ নিবারিত হয়।

কদম্বের কচি পাতা মস্তকে মর্দ্দন করিলে, শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

সূর্য্যমণির মূল মরীচের সহিত বাটিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে, শিরঃশূল আরোগ্য হয়।

নিসিন্ধার মূলের রস, গোল মরীচের গুঁড়া, ছাগদুগ্ধ, গোমূত্র সমভাবে

চুণের জল শিশুর অজীর্ণরোগে উপকারী।

নস্য লইলে, আধকপালিয়া, মাথাব্যথা নিরাময় হয়।

শুলল্‌টি, দেবদারু, পিপ্পলী ও গুড় সমভাবে পেষণ করিয়া, উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, ঊর্দ্ধ্বগঃ আরোগ্য হয়।

সূতিকারোগ।

প্রসবান্তে সূতিকাগারে প্রসূতির এক প্রকার পীড়া হয়, তাহার নাম সূতিকাজ্বর। ইহা নিবারণের উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঔষধ।—ডাক নামক পক্ষীর মাংস গোলমরীচের সহিত ঝোল রান্ধিয়া তিন দিবস সেবনে আরোগ্য হয়।

প্রকারান্তর।—মাগুর কিম্বা কৈ মৎস্যে ধনিয়া ও পুঁইশাকের শিকর বাটিয়া, সেই ঝোল রান্ধিয়া, সূতিকারোগগ্রস্থাকে অন্নের সহিত খাইতে দিবে। যতক্ষণ তিক্ত না লাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাইতে দিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় নিরাময় হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

ভেদ নিবারণ।

যে কোন গতিকে হউক না কেন, অধিক পরিমাণে বাহ্যে হইলে, নিম্ন লিখিত বটিকা একটী বাসি জলের সহিত সেবন করাইলে, তৎক্ষণাৎ ভেদ নিবারিত হইবে। যদি এক বটীকাতে সম্পূর্ণ নিরাময় না হয়, তাহা হইলে, আর একটী বটিকা সেবন করাইবে।

ঔষধ।—জায়ফল এক তোলা, লবঙ্গ এক তোলা, গুজরাটী এলাচ অর্দ্ধ তোলা এবং মধু দুই তোলা উত্তমরূপে একত্রে মাড়িয়া, মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিবে। ব্যবহারকালে সেই বটিকা বাসি জলের সহিত সেবন করাইলেই নিরাময় হইবে। বিসূচিকার সময় এই বটিকা গৃহে গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

গাত্রচিহ্ন দমন।

পারদব্যবহারজনিত শরীরে যদি চক্রাকার চিহ্ন, চুলকনা, ফুসকুড়ি প্রভৃতি হয়, তাহার নিবারণ প্রণালী এইরূপ।

ঔষধ।—কাল তুলসীর পত্ররস প্রতিদিন এক ছটাক পরিমাণে ব্যবহার করাইবে। এক সপ্তাহ মধ্যে গাত্রের সমস্ত চিহ্ন মিলাইয়া যাইবে।

প্রকারান্তর।—কুক্‌সীমার রস সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলেও, পারদ ব্যবহার-জনিত সর্ব্বাঙ্গের চক্রাকার চিহ্ন নিবারিত হইয়া থাকে।

গাত্রকণ্ডু ও পিত্তে চিরতার জল উপকারী।

প্রস্রাব নিবারণ।

অত্যধিক প্রস্রাব হইলে, যজ্ঞডুম্বুর ভাতে দিয়া, তাহা তৈল লবণসংযোগে অন্নের সহিত ভোজন করিলে নিবারিত হয়।

জলের পরিবর্ত্তে ডাবের জল পান করিলে, প্রস্রাবাধিক্য নিবারিত হইয়া থাকে।

বালকের সর্দ্দি নিবারণ।

বালকের সর্দ্দি বুকে বসিলে, রামতুলসীর পত্ররস সম্বুকের মধ্যে পুরিয়া, উষ্ণ করতঃ সেবন করাইলে, সর্দ্দি উঠিয়া বা অধোঃ হইয়া যায়।

অঞ্জনি।

চলিত কথায় ইহাকে আঞ্জনাই বলে। ইহা চক্ষুর পাতার উপরে বা নিম্নে ব্রণের মত হইয়া, তাহা ক্রমে পাকিয়া বিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে। ইহা নিবারণ করিতে ইইলে, যে স্থানে ব্রণ হইয়াছে, সে স্থানে কচি আমের পাতা ভাঙ্গিয়া, সেই পাতার বোঁটার রস দুই তিনবার লাগাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ বেদনা নিরাময় ও দুই একদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

কর্ণচটিকা।

প্রচলিত কথায় ইহাকে কাণচটা বলে। কাণের উপরে এমন এক প্রকার ক্ষত হয় যে, কোনমতে ইহা আরোগ্য হয় না। এই ব্যাধি বিশেষ যন্ত্রণাপ্রদ। ইহা নিবারণ করিতে হইলে, আমগাছে কাণচটা বলিয়া এক প্রকার অবিকল কাণের মত জন্মিয়া থাকে। সেই কাণচটা বাটিয়া অল্প গরম করিয়া, দুই তিনদিন ক্ষতে প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হয়।

ওষ্ঠক্ষত।

ওষ্ঠে ক্ষত হইলে, তাহাতে বিশেস যন্ত্রণা হয়। আহার করিতে বড়ই জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহার নিবারণ উপায় লিখিত হইতেছে। বটের নূতন পাতা ভাঙ্গিয়া তাহার আঠা, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, অতি সত্বরেই নিরাময় হয়।

শূল ব্যথায় লবণ ও যোয়ান উপকারী।

ওষ্ঠব্রণ।

ফোড়া অপেক্ষাও ব্রণ কষ্টকর। তাহা আবার স্থানবিশেষে হইলে, আরও কষ্টকর হইয়া উঠে। ওষ্ঠের ব্রণ এতদূর সাংঘাতিক যে, তাহাতেই রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ওষ্ঠব্রণে ওষ্ঠের উপরে ক্ষত হয় না, মাংসের নীচে ক্রমশঃ পচিয়া উঠিয়া, অল্পদিনেই রোগীর জীবনসংশয় করিয়া তোলে। কিন্তু এই ব্যাধির প্রতীকার অতি সামান্য দ্রব্য দ্বারা হইতে পারে। ব্রণে বেদনা হইলেই সেই স্থানে অল্প পরিমাণে টাট্‌কা কলিচুণ দিলেই বেদনা নিবারণ ও ক্রমশঃ ব্রণ আরোগ্য হইয়া যায়।

ধ্বজভঙ্গের পটী।

অল্পদিনজাত ধ্বজভঙ্গ ইহাতে নিশ্চয়ই নিরাময় হইবে। নাগেশ্বর ফুলের আতর এক রতি পানের সহিত সেবন এবং এক রতি পরিমাণে উপস্থের গোড়ায় মর্দ্দন করিয়া, তাহার উপর নেকড়ার পটী বাঁধিয়া তিনদিন রাখিবে, তাহা হইলেই ফললাভে সমর্থ হওয়া যাইবে।

বীর্য্যহীনতা।

কোন কোন স্থানে কোন ব্যক্তির রতিকালে বীর্য্য স্খলন হয় না। অথবা হইলেও, অতি সামান্য পরিমাণে স্খলন হয়। তাহাতে সন্তান হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তজ্জন্য বীর্য্যবৃদ্ধি হওয়ার যে ঔষধ তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এক পোয়া পরিমাণে গাভীদুগ্ধের সহিত তিন চারিটী সোহারা। (মেওয়াবিশেষ) নামক ফলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণ করিয়া সেবন করিলে, অধিক পরিমাণে বীর্য্য হইবে এবং তাহাতে সন্তান জন্মাইবার কোন বাধা হইবে না।

মুখ ও গা ফাটার ঔষধ।

অন্যান্য সময়ে না হউক, শীতকালে লোকের মুখ ও গা ফাটিয়া বড়ই যাতনা প্রদান করে। দেখিতেও অত্যন্ত বিশ্রী হয়, ইহার নিবারণ উপায় নিম্নে লিখিত হইল।

মোম ও ফুলেল তৈল একত্রে মিশাইয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে। উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে, তাহা জলে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপ শীতল হইলেই

ধুতুরার পাতার ধূমপান হাঁপানি কাশিতে উপকারী।

জমিয়া যাইবে, তখন উহা ফাটায় লাগাইয়া দিলেই অচিরে আরোগ্য হইবে।

দাঁত কড়া।

দাঁতকড়ায় মুখের বড় যাতনা হয়। আহার করিতে কষ্টবোধ হয়। মুখ স্ফীত ও বেদনায় বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহার একটী অতি আশ্চর্য্য ঔষধ লিখিতেছি।

ঘরের ঝুল সমভাগ লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মুখে দিয়া যে জল জমিবে, সেই জল দাঁতকড়ায় বারম্বার লাগাইবে এবং কুলী করিবে। যখন বুঝিবে আর ব্যথা নাই, তখনই ঔষধ ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইবে। ইহার এই আশ্চর্য্য গুণ পরীক্ষিত।

দন্তনালী।

দন্তমূলে নালী ক্ষত হইলে, তাহার প্রতীকার নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা হইবে। এক তোলা গাব ভেরেণ্ডার আঠা, সিকি পরিমাণ লবণ মিশাইয়া, তাহা তামার পাত্রে উষ্ণ করতঃ দুই তিনবার প্রয়োগ করিলেই, নালী শুষ্ক হইবে এবং দুইবার দিলেই সমস্ত যন্ত্রণা নিবারণ হইবে।

বিষক্ষয়।

কোন আহার্য্যের সঙ্গে যদি বিষ উদরস্থ হয়, তবে কলমী শাকের ডাঁটা ও পাতার রস আধ পোয়া পরিমাণে সেবন করাইলে, বমির সহিত উঠিয়া যাইবে। যদি উদরের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাও জীর্ণ হইয়া যাইবে।

শ্লেষ্মাবেদনা প্রতীকার।

শ্লেষ্মার জন্য যে কোন স্থানেই বেদনা হউক না কেন, কর্পূরসংযুক্ত তার্পিণ তৈল উত্তমরূপে দলিয়া, তাহার উপর কম্বলের সেঁক দিলেই ভাল হইবে। জল গরম করিয়া, তাহাতে এক টুকরা কম্বল ভিজাইয়া, তাহা নিঙ্‌ড়াইয়া বেদনা স্থানে দিবে। তাহা হইলে একবার দিলেই অনেক উপশম হইবে এবং বারত্রয় দিলেই আরোগ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশুদিগকে লবণ খাওয়াইলে পুষ্ট হয়।

ক্রোড়দক্রু।

ভদ্রলোকের পক্ষে এই পীড়া সমূহ যন্ত্রণা ও লজ্জার বিষয়। ইহা নিবারণ করিতে হইলে, বনপালঙ্গের পাতা লবণসংযুক্ত করতঃ রস বাহির করিয়া, দদ্রুতে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হইবে। বলা বাহুল্য যে, ঔষধ লেপনের পূর্ব্বে দাদ ঘুঁটিয়া দিয়া চুলকাইয়া শেষ ঔষধ লেপন করিতে হইবে।

শরীর সংস্কার।

এই প্রক্রিয়ায় লিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে, স্ত্রীলোকের শরীর কোমল, ময়লাশূন্য এবং চাকচিক্যযুক্ত হয়। দুগ্ধে ময়দা মিশাইয়া, সমস্ত শরীরে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, অল্প অল্প জল দিয়া শরীরের যাবতীয় মলিনতা নষ্ট হইয়া, শরীর দিব্য কোমল, সুখস্পর্শ ও চাকচিক্যযুক্ত হয়।

ঘাড় মাগুরা।

ঘাড়ে এমন ক্ষত হয় যে, ইহা সহজে আরোগ্য হয় না। রোগী ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট পায়। ইহার প্রতীকার করিতে হইলে, ডেউফলের বীজ ছিলিমের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেই সামান্য দিনেই আরোগ্য হইবে।

বহুমূত্র।

বহুমূত্র নিবারণের উপায় নিম্নরূপ। যজ্ঞডুম্বুর ভাতে দিয়া, তৈল ও লবণসংযুক্ত করতঃ অন্নের সহিত ব্যবহার করিলে, বহুমূত্র নিবারণ হয়। অধিক প্রস্রাব নিবারণের ইহা এক অদ্বিতীয় মহৌষধ,—কিন্তু পুরাতন বহু-কালস্থায়ী পীড়া ইহাতে নিবারণ হয় বটে, কিন্তু একেবারে আরোগ্য হয় না। নূতন ব্যাধির পক্ষে ইহা আশু উপকারী।

শ্লেষ্মা নিবারণ।

ময়দার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া, সেই ময়দার লুচি ভাজিয়া খাইলে, কফ ও শ্লেষ্মা ভাল হয়।

গোড়শূল।

গোঘাসী (মৃত গরুর পেটে যে ঘাস থাকে) জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

ধাতুচলা।

জবাফুলের পাতা দুই তোলা, জল আধ পোয়ার সহিত বাটিয়া তাহার সহিত দুই তোলা চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে, ধাতুচলা নিবারণ হয়।

কোরন্দ।

অহিফেন জলে গুলিয়া উষ্ণ করতঃ কোরন্দে লেপন করিলে, আরোগ্য হয়। কেতকীর মাথী ঘষিয়া লেপন করিলেও, কোরন্দ আরোগ্য হয়, কিন্তু এ ঔষধ অধিকদিন ব্যবহার করিতে হয়।

অতিসার।

বটপাতা বাসি জলে বাটিয়া পান করিলে, রক্তাতিসার নিবারণ হয়।

আমের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া পান করিলেও, রক্তাতিসার নিরাময় হইয়া থাকে।

গ্রহণী।

পাকাবেল ভিজা চিঁড়ার সহিত আহারে দুষ্ট গ্রহণী নিরাময় হয়।

ঘোলের সহিত পাকাবেল ও চিনি দিয়া আহার করিলে, গ্রহণী আরোগ্য হয়। বকপুষ্পের মূল বাসি জলে ঘর্ষণ করিয়া, তোলা প্রমাণ পান করিলে, গ্রহণী রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।

বারুদ আবিষ্কার ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

প্রথম প্রবন্ধ।

বিজ্ঞান কি?

বিজ্ঞান নামে আজকাল একটা বিষম হুজুগ উঠিয়াছে। দেবতাদিগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সমাজনীতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অধিক কি শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, জাগরণে শিক্ষিতগণ বিজ্ঞানমূর্ত্তি অনুধ্যান করিতেছেন। চারিদিকে বিজ্ঞানের তরঙ্গ উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে আজকাল যাহারা অর্থ বুঝে না, বিজ্ঞানের বি উপসর্গটীর পর্য্যন্ত অর্থ জানে না, তাহারাও আজকাল বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী হইয়া, চীৎকারে জগৎ তোলপাড় করিতেছে, পরন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধার তাহারা অতি অল্পই ধারে। এই সমস্ত বিষয় দেখিয়া, আমার অনুরোধ যে, ইহাতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিত হইবে, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় জ্ঞান করিয়া, উপেক্ষা প্রদর্শন না করে। বিলাতী "বিজ্ঞান সমালোচক" এবং আমাদিগের শাস্ত্রাদির লিখিত বিষয় গুলির যে সকল বিষয় পরীক্ষায় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সমস্ত ফলের প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি লিখিত হইতেছে। বহু বিজ্ঞান গ্রন্থ হইতে বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক পরীক্ষিত বিষয়গুলি পাঠকগণ এক ক্ষেত্রে পাইতেছেন। আশা করি, লেখা যেন পড়িয়াই নিশ্চিন্ত না হন, ইহা পড়িবার জন্য নহে। পড়িবার জন্য অনেক সুখপাঠ্য পুস্তক পাওয়া যাইবে, ইহা কেবল পরীক্ষা করিবার। পাঠকগণ ইহার প্রকরণগুলি শিক্ষা করিয়া, স্বীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইবেন, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

ইহার প্রকরণানুসারে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিলে, ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এমন কি, যে জিনিষ বাজার হইতে ক্রয় করিলে, এক টাকা লাগিতে পারে,

ঘরে প্রস্তুত করিলে, অবিকল তদ্রূপ, এমন কি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষ আট আনা মাত্র ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

বিলাতী দ্রব্যাদি অধিকাংশতেই অনেক বিষাক্ত দ্রব্য থাকে। বাহ্য সৌন্দর্য্যপ্রিয় বঙ্গবাসী বিলাতী জিনিষের নাম শুনিয়াই, একবারে পুলকে পূর্ণ হন; এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, তাহাই উচ্চমূল্যে ক্রয় করেন। তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক যে, বিলাত হইতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি সচরাচর আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই বাহ্যসৌন্দর্য্যে ঢাকা, বস্তুগত্যা উহা অন্তঃসার শূন্য। কিন্তু কেমন যে কালমাহাত্ম্য, এ সকল জানিয়াও—দেখিয়া শুনিয়াও বঙ্গবাসী এ মোহ ত্যাগ করিতে পারেন না।

দ্রব্যের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা বিচার না করিয়া, বঙ্গবাসী বিলাতী দ্রব্যাদির এতদূর পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন, বিলাতী দ্রব্যের অসারসৌন্দর্য্য তাঁহাদিগের হাড়ে হাড়ে এমন ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে, যদি কেহ কোন খারাপ জিনিসও বিলাতী বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে, সেই জঘন্য দ্রব্যও উচ্চমূল্যে বঙ্গবাসী ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহাদিগের মনের ধারণা, বিলাতী জিনিস খারাপ হইতে পারে না। একেবারেই বিলাতী জিনিস যে অকর্ম্মণ্য, একথা আমরা বলি না। বিলাত হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয়, তাহার সমতুল দ্রব্য প্রস্তুত করা বড় সামান্য কথা নহে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, দেশের উন্নতির জন্য, স্বদেশের বাণিজ্যপথ যথাসাধ্য প্রশস্ত করিবার জন্য সকলেরই স্বদেশোৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য এ ক্ষতি বঙ্গবাসীর পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইবে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

গন্ধদ্রব্য। (PARFUMERY)

কতদিন হইতে গন্ধদ্রব্যের উপভোগ লালসা মনুষ্য সমাজে পরিলক্ষিত হইতেছে, কতদিন হইতে প্রকৃতির এই প্রধান বিলাস উপাদান মানবগণকে মোহিত করিয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাইবার কোন উপায় নাই। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, যতদিন হইতে মানবের সৃষ্টি, যতদিন

হইতে মানব ঘ্রাণেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে, ততদিন হইতেই তাহারা সুগন্ধে আমোদিত ও দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া আসিতেছে। পুষ্পের স্বভাবজ গন্ধ ভোগ করিবার পর দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

বেদে দেবতাগণ সচন্দন পুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়াছেন। পুষ্প দেবতাগণের প্রীতি সম্পাদনের জন্যই পূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব হিন্দুর সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ বেদে যখন পুষ্পের ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার পূর্ব্বকার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। উহা অনুমাণ দ্বারা স্থির করা ভিন্ন উপায়ন্তর দেখি নাই।

গন্ধদ্রব্যের প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে এই বিবেচনা হয় যে, প্রথমে কোন সুগন্ধযুক্ত কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে, তাহা হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়, এই হইতে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়াস মনুষ্য সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন গন্ধদ্রব্য অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া, উহার গন্ধ ভাগ বাষ্পাকারে পরিণত ও তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। "শুক্রনীতি" নামক গ্রন্থে দেখিতে প্যাই, বিশ্বকর্ম্মা এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। হিন্দুর যত কিছু আবিষ্কার, যত কিছু আশ্চর্য্য দ্রব্যের গঠন, সকলই বিশ্বকর্ম্মার দোহাই দিয়া চলিয়া আসিতেছে। শিল্পবিজ্ঞানের প্রধান আবিষ্কারক হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে একমাত্র বিশ্বকর্ম্মা। অতএব এ প্রহেলিকা ভেদ করিয়া, সত্যাবধারণ বড় কঠিন কথা। তবে বিশ্বকর্ম্মার দ্বারাই হউক, বা অন্য কোন কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারাই হউক, গন্ধদ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে যে উক্ত প্রকার নিয়মে সাধিত হইত, তাহা এক প্রকার স্বীকার্য্য। (১)

(১) বিলাতী প্রধান গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারক রীমেল বলেন, The, origin of perfumery, like that of all ancient arts. is shrounded in obscurity. Some assert that it wac first diseovered in Mesopotamia, * * The word perfnme (*per* throngh, *fnmnm* smoke) indicates clearly, that it was first obtained by burning aromatic gums and woods ; and it seems as if a mystic idea was connected with this mode of sacrifice. and as if men fundly bele-

গ্রীকদিগের প্রচীন গ্রন্থাদিতেও সুগন্ধদ্রব্যের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

রীমেল বলেন, ইজিপ্ত দেশীয়েরা সর্ব্ব প্রথমে গন্ধ দ্রব্যের আদর বুঝে, তৎপরে ক্রমান্বয়ে জু, আসিরীয়ান, গ্রীক, রোমান, আরব এবং সর্ব্বশেষে ইউরোপ ভূমে ইহার আদর সম্প্রসারিত হয়। (৩) তুরস্কদিগের প্রাচীন গ্রন্থ গুলেস্তাতেও পুষ্পোৎসবের বিবরণ লিখিত আছে। (৪) সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাফেজ পুষ্পের প্রশংসার ক্রটী করেন নাই। তিনি সৃষ্টির মধ্যে পুষ্পকেই সুন্দর দেখিয়াছেন। (৫) এইরূপ সকল জাতীর মধ্যেই সুগন্ধ সেবনস্পৃহা যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

জগতে যখন সুবর্ণ ও রজত খনি আবিষ্কৃত হয় নাই, যখন স্বর্ণকারের

---

ived that their prayers would sooner reach the remeals of their gods by being wafted on the bute wreaths which slowly ascended to humen and desappeared in the atmosphere, whiist their iutoxicatinf Fnmes threw them in to religions instasies.

Engene Remmel's "Book of perfumes" page 4.

(২) Celestial venus hovered over his head,
and roseat unguents heavenly frogrance sred!

(৩) it was transmitted by the Egyptions to the gews. then to the Assyrians. the Greeks, the Romans, the Arabs. and at last to the modern European nations.

Remmel's Book of perfumes,

(৪) Vide Sadi's Gulistan, Chap I, at I8,

(৫) Like the bloom of the rose,
When Fresh pluck'd and Full dlown,
Sweetly soft is thy nature and air,
Like the beautyfnl cypress in Paradise grown.
Thon art every way charming and fair.

Hafiz. Gazel XI.

A bitter gest is the poison of friendship,

ব্যবসা অবলম্বন করিবার কেহ ছিল না, যখন মনুষ্যগণের জাতি প্রভেদ বলিষ্ঠ ছিল না, তখন ছত্রিশ জাতির উৎপত্তি ছিল না, তখন হইতে পুষ্পের আদর চলিয়া আসিতেছে। যখন সৌধবাস মানবের কল্পনাচক্ষের সম্মুখেও আসিত না, যখন সুপরিস্কৃত ডায়মনকাটা নূতন নূতন নামের নূতন নূতন গহনা গঞ্জনায় গৃহস্থগণ জ্বালাতন হইবার কোন লক্ষণ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যখন গৃহিণীরা এখনকার গজেন্দ্রগামিনী গৃহিণীদিগের ন্যায় গহনারোগে পীড়িত হয়েন নাই, তখন সকলে আদর করিয়া, প্রকৃতিদত্ত ভূষণ পরিধান করিয়া কৃতার্থ হইত। বিবাহে আনন্দে, কৌতুকে সন্তোষ প্রকাশের একমাত্র বস্তু ছিল, বনফুল। যুবতীরা বনফুলের মালা গাঁথিয়া, বনফুলে ভূষিতা হইত, বনফুলের মালা স্বামীর গলায় পরাইয়া আমোদিত হইত, বনফুলে দেবতা পূজা করিয়া, মনে বিমল শান্তি লাভ করিত। এখন কল্পনার চক্ষে সেই ফুলভূষণভূষিতা যুবতীদিগের সহিত বাউটী সুট, চুড়ীসুট প্রভৃতি দশবিশ সের গহনা ভারাক্রান্ত মেয়েমুটেগুলির তুলনা করিলে, মনোমধ্যে বড় ঘৃণা ও দুঃখ হয়। জানি না, কোন্ পাপে প্রকৃতিদত্ত ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গকামিনী সোণারূপায় দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রয়াসী হয়েন? প্রকৃত ও অপ্রাকৃত দ্রব্যের পার্থক্য কেন না বুঝেন। পাঠিকাগণ! ক্ষমা করিবেন। মনে করিবেন না, আমি আপনাদিগের (স্বামীর প্রতি) গহনা দিবার স্বত্ব লোপ করিতে বসিয়াছি, সে ক্ষমতাও আমার নাই। আর মনে করিবেন না যে, গ্রন্থকার গৃহলক্ষ্মীর গহনাপ্রাপ্তির গঞ্জনায় কাতর হইয়া, সুবিধামতে বঙ্গযুবতীকে লক্ষ্য করিয়া, দুকথা শুনাইতে বসিয়াছেন। প্রকৃত কথা তাহা নহে, যদি দোষ হইয়া থাকে, বেয়াদবি মাপ করিবেন।

দেবতাগণের মধ্যেও পুষ্পের আদর সামান্য নহে। বিধাতা কামদেবকে নিরবচ্ছিন্ন কুসুম দিয়া গঠিত করিয়াছেন। এমত স্থলে বিবেচনা করা অন্যায় নহে যে, যতদিন মানবের জন্ম, যতদিন মানব ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ততদিন হইতে তাহারা সুবাস উপভোগের ক্ষমতা পাইয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা ঘ্রাণ লইবার জন্য। ঘ্রাণেন্দ্রিয় না থাকিলে, মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। বিধাতা জীবনকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়াছেন, কেবল এই জন্য।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী।

সম্প্রতি কয়েকটী প্রয়োজনীয় গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইতেছে। পুনরায় অনুরোধ, পাঠকগণ এ গুলি পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হইবেন না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার প্রস্তুত করিয়া দেখিবেন। স্বহস্তে প্রস্তুত দ্রব্যের ব্যবহার-কালে কত আনন্দ, তাহা তখন বুঝিতে পারিবেন।

গোলাপ জল। যখন ভারতবর্ষে বিলাতী গন্ধদ্রব্যের আমদানী ছিল না, তখন গোলাপজল ও আতরই সকলে ব্যবহার করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গন্ধদ্রব্যের মধ্যে এই দুইটী কি গন্ধে, কি স্নিগ্ধগুণে অন্যান্য গন্ধদ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অদ্যাপি অনেক স্থানে কেবল আতর গোলাপজল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোলাপজল প্রস্তুত করাও আজকাল অতি সহজ হইয়াছে। গাজীপুর প্রভৃতি স্থানের গোলাপজলই প্রসিদ্ধ, অতএব সেই গোলাপজল প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

সচরাচর গোলাপজল বকযন্ত্রের সাহায্যে (Distillation) চোয়াইয়া লওয়া হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে সকলের এ যন্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। অতএব তৎপরিবর্ত্তে বকযন্ত্র ঘরে বসিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া সহজ। একটী শক্ত কলসীতে পাঁচ সের টাট্‌কা গোলাপের পাপড়ী, গোলাপী আতর ৩০ ফোঁটা ও জল এক গ্যালন রাখিয়া, ময়দা দিয়া অতি সাবধানে মুখ বন্ধ করিয়া জ্বালে উঠাইবে। সেই কলসীর গাত্রে নলের পরিমাণ মত ছিদ্র করিয়া, একটী দুই কি তিন হাত লম্বা নল বসাইবে। দুই হাত দূরে আবার ঐরূপ একটী কলসীতে ছিদ্র করিয়া, ঐ নলের অপর দিকে লইয়া লাগাইয়া দিবে। এ কলসীটীরও মুখ বন্ধ করিয়া, জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে। পরে জ্বাল পাইয়া, গোলাপের সারাংশ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া, নলপথে সেই জলনিমগ্ন শূন্য কলসীতে যাইয়া, শীতল হইয়া, গোলাপজল রূপে পরিণত হইবে। অন্যান্য যাহা কিছু চোয়াইতে হইলেও এইরূপ করিতে হইবে।

অন্য প্রকার। পরিশ্রুত অথবা বৃষ্টির জল এক পাইণ্ট, স্পিরিট অব রোজ এক ড্রাম একত্রে মিশাইলেই উৎকৃষ্ট গোলাপজল প্রস্তুত হইল।

অটো অব রোজ। গোলাপী আতর ১০ ফোঁটা, বিশুদ্ধ খড়ি চূর্ণ (খটিকা চূর্ণ) এক ড্রাম উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া, তিন পোয়া পরিশ্রুত জলে (Distilled qater) দ্রব করিয়া, পরে শোষকযন্ত্র (Filter) দ্বারা অথবা ব্লটিং কাগজে (Blottiug paper) ছাঁকিয়া লইলেই হইল।

ইচ্ছা করিলে, মৃগনাভী (musk) জেসমিন (gessamine) কি ভাইলেট (violet) প্রভৃতির সুগন্ধী জল প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রত্যেকটীর এসেন্স দুই ড্রাম এক পাইণ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইল।

ল্যাভেণ্ডার। (Lavender water) অতি উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার তৈল Engliah (Lavender oil) তিন ড্রাম, এক পাইণ্ট রেক্‌টিফাইড স্পিরিটের সহিত দ্রব করিয়া, তাহাতে ৪০ গ্যালন পরিশ্রুত জল মিশাইলেই প্রস্তুত হইল।

সদ্গন্ধযুক্ত ল্যাভেণ্ডার। রেক্‌টিফাইড স্পিরিট ৫ গ্যালন, ল্যাভেণ্ডার তেল ২০ আউন্স, বর্গমেণ্ট তৈল ৫ আউন্স, এম্বারগ্রিজ এসেন্স আধ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিলেই হইল। *

অন্য প্রকার। বর্গমেণ্ট তৈল ও ল্যাভেণ্ডার তৈল প্রত্যেকটী তিন ড্রাম, অটো অব রোজ ৬ ফোঁটা, লবঙ্গ তৈল ৬ ফোঁটা একত্রিত করিয়া, তৎপরে রোজমেরি তৈল এক ড্রাম, বিশুদ্ধ মধু এক আউন্স, বেঞ্জোইন এসিড ২০ গ্রেণ এবং পরিশ্রুত জল তিন আউন্স মিশ্রিত করিলেই, উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার প্রস্তুত হইল।

স্মিথের ল্যাভেণ্ডার। এই ল্যাভেণ্ডার কলিকাতার প্রধান ঔষধ বিক্রেতা স্মিথের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, ল্যাভেণ্ডার তৈল ৪ আউন্স, প্রুফ স্পিরিট পাঁচ পাইণ্ট এবং গোলাপজল এক পাইণ্ট মিশ্রিত করিয়া, বকযন্ত্রের সাহায্যে চোয়াইয়া লইলেই হইল।

অডিকলোন। ল্যাভেণ্ডার তৈল, বর্গমেণ্ট তৈল, লেবুর তৈল এবং নিরোলী তৈল প্রত্যেকটী এক আউন্স এবং দারুচিনির তৈল অর্দ্ধ

---

* বিলাতের প্রধান গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্রাণ্ড সাহেব (Mr. Brend) ইহা আবিষ্কার করেন।

(১) Vide Dr. Parira's "Own experiments"

আউন্স, স্পিরিট অব রোজমেরি, স্পিরিট অব বাম, প্রত্যেকটী ১৫ আউন্স, সাড়ে সাত পাইণ্ট উত্তম রেকটিফাইড স্পিরিটে মিশ্রিত করিয়া, এক পক্ষ-কাল ঢাকিয়া রাখিবে। পরে চোয়াইয়া লইলেই হইল। (২)

কুইন অব হাঙ্গরেজ। রোজমেরির পুষ্প দুই পাউণ্ডে রেকটিফাইড স্পিরিট এক গ্যালন সংযোগ করিয়া, চোয়াইয়া লইলেই হইল।

ইউডিটু´গাল। এক গ্যালন রেকটিফাইড স্পিরিট কমলা লেবুর ত্বকের তৈল ৬ আউন্স, লেবুর তৈল এক আউন্স, লেমন গ্রেস্ অইল সিকি আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিলেই হইল।

ফারফিউম ডি রয়। দুই গ্যালন রেকটিফাইড স্পিরিট, ৬ আউন্স ষ্টোরাক্স বেঞ্জোইন, ১৬ আউন্স মুসর্ব্বর কাষ্ঠ, ৮ আউন্স এম্বার গ্রিজ এসেন্স, ৮ আউন্স টিংচার অব মস্ক এবং টিংচর অব ভেনিয়া ১৬ আউন্স মিশ্রিত করিলেই হইল।

স্পিরিট ডি রোজ। গোলাপী আতর ২ ড্রাম, নিরোলী তৈল অর্দ্ধ ড্রাম, রেকটিফাইড স্পিরিট এক গ্যালন, একটী পাত্রে একত্রিত করতঃ শুষ্ক ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়ম চূর্ণ দেড় পাউণ্ড মিশ্রিত করিয়া, অবশেষে চোয়াইয়া লইলেই হইল। (৩)

গোলাপী আতর। অতি উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুলের পাপড়ীগুলি একটী কাঁচের গ্লাসে অল্প জলের সহিত রৌদ্রে যে পর্য্যন্ত উহা হইতে ফেণা নির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। তৎপরে ঐ ফেণা সংগ্রহ করিয়া, চারিগুণ বাদাম কি তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইল।

ভারতীয় গোলাপ। উত্তম গোলাপী আতর অর্দ্ধ ছটাক, এক গ্যালন রেকটিফাইড স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করিয়া, পাত্রের মুখটী বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া উত্তপ্ত করিবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইলেই হইল।

ভার্বেনার এসেন্স। ভার্বেনার তৈল ২ ড্রাম, রেকটিফাইড

(২) Vide Dr. Granvell's "perfumery."

(৩) এই গন্ধদ্রব্য পারস্য দেশে অতি সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণে আদর করিয়া ইহাকে রাজসৌগন্ধ বা (queens perfume) বলিয়া আদর করিয়া থাকেন।

স্পিরিট ৪ আউন্স, এসেন্স অব এম্বারগ্রিজ আধ ড্রাম, কমলা লেবুর ফলের জল অর্দ্ধ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিবে।

অন্য প্রকার। ভার্বেনার তৈল অর্দ্ধ আউন্স, ভ্যানিলার এসেন্স ৪০ ফোঁটা, রেকটিফাইড স্পিরিট ৪ আউন্স মিশ্রিত করিলেই হইল।

লেবুর এসেন্স। লেবুর তৈল ১ আউন্স, আলকোহল ৮ আউন্স, কমলা লেবুর ত্বক আধ আউন্স দুই দিবস ভিজাইয়া রাখিয়া, চোয়াইয়া লইলেই হইল।

মিল্ক অব রোজ। মিষ্ট বাদাম ৫ আউন্স, গোলাপ জল আড়াই পাইণ্ট, তিক্ত বাদাম ১ আউন্স, শ্বেত সাবান অর্দ্ধ আউন্স, বাদাম তৈল অর্দ্ধ আউন্স, তিমি বসা দুই আউন্স, শ্বেত মম আধ আউন্স, ল্যাভেণ্ডার তৈল ২০ ফোঁটা, অটো অব রোজ ২০ ফোঁটা, রেকটিফাইড স্পিরিট এক পাইণ্ট আবশ্যক। প্রথমে বাদামগুলি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, সাবান ও গোলাপ জলের সহিত চটকাইতে হইবে, পরে মম বসা ও বাদাম তৈল মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে অটো অব স্পিরিটে দ্রব করিয়া, মিশাইয়া লইলেই হইল।

সহজ প্রকরণ। এক আউন্স বাদাম তৈলে এক ড্রাম দ্রব পটাশ মিশ্রিত করিয়া, পরিশেষে এক পাইণ্ট গোলাপ জল ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া লইলেই হইল। গন্ধ দ্রব্য বলিয়া যত হউক বা না হউক, মিল্ক অব রোজ মুখ ব্রণের একটী চমৎকার ঔষধ। মুখের ব্রণের জন্য যাঁহাদিগের মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা একবার ইহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

জক্কুইলি। বর্গমেণ্ট এবং লেবুর এসেন্স প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আউন্স, কমলালেবুর ত্বকের তৈল ও লবঙ্গের তৈল প্রত্যেক দ্রব্য ২ আউন্স, জলীয় ষ্টোরাক্স অর্দ্ধ আউন্স একত্রে মিশাইয়া লইলেই হইল।

নীসিহাসু। ইহা পারস্য দেশের প্রধান গন্ধ দ্রব্য। উষার ৫ তোলা, চন্দন তৈল ৪০ ফোঁটা, লেবুর তৈল ২০ ফোঁটা, ফাঁলুনা ৩ তোলা প্রথমে উষার ও ফাঁলুনা আধ ছটাক গোলাপে সিদ্ধ করিয়া, তাহার কাথের সহিত অন্যান্য দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিলেই হইল। এই তৈলের গন্ধ যেমন চমৎকার, গুণও তেমনি চমৎকার। শিরোরোগের ইহা অমোঘ ঔষধ।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

সাবান।

আজকাল সাবান ব্যবহার ইতর সাধারণ সকলের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। যুবতী স্ত্রীর সাবানের খরচ যোগাইতেই অনেকের প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এক্ষেত্রে স্বহস্তে সাবান প্রস্তুত করিলে, অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইতে পারে, অথচ সাবানও ভাল হয়। যে সাবানগুলি সচরাচর ব্যবহার হয়, সেই গুলির প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইতেছে।

কাপড় কাচা সাবান।—আজকাল এই সাবান বড়ই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে বার সোপ বলে। এই সাবান প্রস্তুত প্রণালী ১ সের সাজিমাটী, অর্দ্ধসের নারিকেল তৈল, ১ তোলা সোহাগা, অৰ্দ্ধ পোয়া কলিচুণ একত্রে একটী হাঁড়িতে রাখিয়া, পাঁচ সের জল দিয়া ক্রমান্বয়ে সিদ্ধ করিতে থাকিবে। সিদ্ধ করিবার সময় হাঁড়ির মুখ যেন উত্তমরূপে বদ্ধ থাকে। যখন হাঁড়ির মধ্যে চুড় চুড় শব্দ হইতে থাকিবে, তখন তাড়াতাড়ি হাঁড়ির মুখ খুলিয়া, তাহাতে জল ঢালিতে থাকিবে, এরূপ জল ঢালিবে যে, হাঁড়ির মুখ পূর্ণ হইয়া, জল বাহির হইয়া যায়। ইহাতে সাবানের অপরিষ্কার অংশ জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এবং সাবানও কঠিন হইয়া আইসে, তখন ইচ্ছামত খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলেই হইল।

উইণ্ডসর সাবান।—জলপাই তৈল এক ভাগ, চৰ্ব্বি নয় ভাগ, অল্প পরিমাণে কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করিয়া, সাবানের ন্যায় ঘন হইলে, লবঙ্গ তৈল ৩০ ফোঁটা, বর্গমেণ্ট তৈল ১৫ ফোঁটা, ল্যাভেণ্ডার তৈল ২০ ফোঁটা মিশ্রিত করিলেই হইল।

হনি সাবান।—শ্বেত সাবান খণ্ড খণ্ড করিয়া গালাইয়া, তাহাতে ২০ ফোঁটা ভার্ব্বেনা ও ২০ ফোঁটা রোজ জিরেনিয়ম মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইল।

কাৰ্ব্বলিক সাবান।—শ্বেত সাবান ১২ ভাগ লাগাইয়া, তাহার সহিত ১ ভাগ কাৰ্ব্বলিক এসিড মিশাইয়া শীতল করিয়া লইলেই হইল।

A good name is better than wealth,

সাবান ইচ্ছামত রং করিতে পারা যায়। সাবান দ্রব অবস্থায় উহার সহিত সামান্য পরিমাণে ম্যাজেণ্টার, ভাইওলেট, পিংক প্রভৃতি রং মিশাইলেই সেই সেই বর্ণের সাবান প্রস্তুত হইবে। সাবানের আকারও ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালিয়া লইতে পারা যায়। সাবানের খেলনা, লেবু, পুতুল যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যাইতে পারিবে।

পমেটম।

পমেটম।—মেষের চর্ব্বি এক সের, মম দুই ছটাক, তিমি মৎস্যের চর্ব্বি দুই ছটাক, বেঞ্জোইন চূর্ণ দুই ড্রাম, একত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া, শীতল হইলে, তাহার সহিত দুই ড্রাম ল্যাভেণ্ডার তৈল, ১০ ফোঁটা অটো ডি রোজ মিশাইয়া লইলেই চলিত পমেটম প্রস্তুত হইল।

সুগন্ধী পমেটম।—এক আউন্স মেষের চর্ব্বি, এক আউন্স শূকরের চর্ব্বি অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিয়া, তাহার সহিত বর্গনেণ্ট এসেন্স ১ ড্রাম, লেবুর এসেন্স ১ ড্রাম, রোজমেরি অর্দ্ধ ড্রাম, লবঙ্গের তৈল ২০ ফোঁটা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইলেই অতি সুগন্ধী পমেটম প্রস্তুত হইল।

গোলাপী পমেটম।—কঠিন পমেটম দ্রব করিয়া, উহা আলকে-নিট মূল দ্বারা রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, গরম থাকিতে গোলাপ জল দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে, পরে শীতল হইয়া আসিলে, উহাতে আবশ্যক অনুসারে গোলাপী আতর মিশাইয়া লইলেই হইল।

দেশী পমেটম।—মেষের চর্ব্বি ১ ৷১২ সের, শ্বেত মম এক পোয়া, পাম তৈল ১ তোলা, মৃগনাভি ১০ রতি একটী আবৃত পাত্রে রাখিয়া, অগ্নির তাপে দ্রব করিতে হইবে। সমস্ত দ্রব উত্তমরূপে দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হইলে, তাহার সহিত লেবুর তৈল ১ তোলা, গোলাপী আতর ৪০ ফোঁটা মিশাইয়া লইবে। এই পমেটম ব্যবহার করিলে, চুলের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

দেমেস্ক রোজ।—উৎকৃষ্ট গোলাপী আতর ২০ ফোঁটা, গোলাপ জল এক পোয়া, অয়েল অব নিরোলী ৫ ফোঁটা একত্রে একটী পরিষ্কার

বোতলে পূরিয়া, উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া, ঘন ঘন নাড়িয়া রাখিলেই, উৎকৃষ্ট ডেমেস্ক রোজ প্রস্তুত হইল। ইহার গন্ধ স্নান করিলেও নষ্ট হয় না। এমন দীর্ঘকাল স্থায়ী সুগন্ধী দ্রব্য দ্বিতীয় নাই বলিলেও বোধ হয় বেশী বলা হয় না। অল্প মূল্যে এমন উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ম্যাকাসার তৈল।—বেলা তৈল ৩ পোয়া ও নট তৈল ১ পাইন্ট একত্রে মিশাইয়া, আলকেনিটমূল দ্বারা রঞ্জিত করতঃ ব্লটিং কাগজে ছাঁকিয়া লইয়া, তাহার সহিত রেকটীফাইড স্পিরিট ৪ আউন্স, টিংচর মস্ক ২ ড্রাম, বর্গমেণ্ট তৈল ২ ড্রাম এবং গোলাপী আতর ২০ ফোঁটা মিশাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত হইল।

মৃগনাভী তৈল।—এক পাইন্ট বাদাম তৈল অভাবে তিল তৈলের সহিত মৃগনাভি চূর্ণ আধ ড্রাম, ক্যাসিয়া, ল্যাভেণ্ডার, নিরোলী ও লবঙ্গ তৈল প্রত্যেক ১০ ফোঁটা পরিমাণে মিশাইয়া লইলেই, মৃগনাভি তৈল প্রস্তুত হইল।

কেশ রঞ্জিনী তৈল।—ইহা চুল বৃদ্ধির একটী চমৎকার ঔষধ। গন্ধও অধিকদিন স্থায়ী। নারিকেল তৈল কি তিল তৈল ১ সের আল-কেনিট মূল দ্বারা রঞ্জিত করিয়া, রৌদ্রে রাখিতে হইবে। পরে ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া, গোলাপী আতর ২০ ফোঁটা, রোজমেরি তৈল ৪০ ফোঁটা ও কাঁচা গোলাপের পাপড়ী ১০।১৫টী ফেলিয়া, মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। ৫।৭ দিনের পর গোলাপের পাপড়ীগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহাতে মস্তক শীতল হয় এবং চুল বৃদ্ধি হয়। আমরা এই তৈল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়াছি। (১)

---

(১) ডাক্তার ডিনেকেট (Denaqnet) এই তৈল প্রথম প্রস্তুত করেন।

পঞ্চম প্রবন্ধ ।

বার্ণিস প্রকরণ ।

সচরাচর যত প্রকার বার্ণিস আমাদিগের প্রয়োজনে আইসে, সেই সমস্ত গুলির প্রস্তুত প্রক্রিয়া এই প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে।

চলিত বার্ণিস। ম্যাথিলেটেড স্পিরিট এক সের, চাঁচগালা চূর্ণ আধ পোয়া, খুনখারাপি ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইলেই চলিত বার্ণিস প্রস্তুত হইল। সচরাচর বাক্স, আলমারি প্রভৃতিতে এই বার্ণিস ব্যবহৃত হয়। যদি রং অধিক লাল করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে খুনখারাপির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই হইল।

চিনদেশীয় বার্ণিস। গম্ স্যাণ্ডাবক ২ আউন্স, মম ম্যাষ্টিক ২ আউন্স, এক পাইণ্ট রেকটিফাইড স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করতঃ মুখ বন্ধ করিয়া এক কড়া জলের উপর রাখিয়া তাপ দিবে এবং উত্তমরূপে গলিয়া গেলে, কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই হইল। টিনের বাক্স প্রভৃতিতে এই বার্ণিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অতি উজ্জ্বল এবং শীঘ্র শুষ্ক হয়।

জাপান বার্ণিস। এস ফ্যালটম্ ২৫ পাউণ্ড গম্ এনিসি ৪ পাউণ্ড মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে মসিনার তৈল ১২ গ্যালন দিয়া ফোটাইতে থাকিবে। পরে ২১ গ্যালন মসিনার তৈলে ৫ পাউণ্ড এম্বর ফোটাইয়া, উহার সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে মুদ্রাশঙ্খ ৫ তোলা মিশ্রিত ও আবশ্যকমত তার্পিন দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ধাতুদ্রব্য বার্ণিস করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কৃষ্টল বার্ণিস। কেনেডা বালসম ১ ভাগ ও পরিশ্রুত তার্পিন এক ভাগ মিশ্রিত করিলেই ইহা প্রস্তুত হইল। মানবচিত্র ও নানাবিধ চিত্রাদি করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ফ্রান্স বার্ণিস। পাতগালা ৫॥ সাড়ে পাঁচ আউন্স, এক পাইণ্ট উড-ন্যাপথায় দ্রবীভূত করিয়া লইলেই হইল।

পাতগালা ৫॥ সাড়ে পাঁচ আউন্স, গম এলিমাই ছয় ড্রাম, এক পাইণ্ট রেকটিফাইড স্পিরিটে দ্রবীভূত করিলেই হইল। এই বার্ণিস বাক্স ও আলমারী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সোণালী বার্ণিস। এই বার্ণিস ধাতুদ্রব্যে মাখাইলে, সোণার

ন্যায় দেখায়। জাফ্রান চূর্ণ পাঁচ আনা, খুনখারাপি আড়াই আনা, লাক্ষা পাঁচ ভরি, সকট্রাইন এলোজ দশ আনা, স্পিরিট মিথালেটেড স্পিরিট আড়াই পোয়া সমুদয় রৌদ্রে দ্রব করিলেই হইল।

লাক্ষা ৮ অংশ, চন্দ্রাস ৮ অংশ, রুমি মস্তকী ৮ অংশ, গাম্বোজ ২ অংশ, খুনখারাপি ১ অংশ, তার্পিন তৈল ৬ অংশ, হরিদ্রা চূর্ণ ৪ অংশ। সমস্ত দ্রব্য গুলি ১২০ অংশ মিথালেটেড স্পিরিটে মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইল। এই বার্ণিস গিল্‌টির রং খারাপ হইলে, তাহাতে মাখান যাইতে পারে।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

গিল্‌টি প্রকরণ।

আজকাল গিল্‌টির দ্রব্য সর্ব্বস্থানেই ব্যবহৃত হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা,—পাশ্চাত্য সভ্যতা,—পাশ্চাত্য রীতিনীতি শিখিয়া, বঙ্গবাসী নিজে যেমন গিল্‌টি হইতেছেন, গিল্‌টির দ্রব্যও তেমন ব্যবহৃত হইতেছে। ইংরাজের আমলে গিল্‌টির আদরই বেশী। এই গিল্‌টির মহিমায় কত কত বাজে দ্রব্য গিল্‌টির আবরণে হংস সাজিয়া, হংসসম্মান পাইতেছে, কত কত সত্য কথা গিল্‌টির ঢেউ খাইয়া, গিল্‌টির তোড়ে অসত্যে পরিণত হইতেছে। যেখানে গিল্‌টির এত আদর, সেখানে গিল্‌টির দুই এক কথা বলা আবশ্যক।

কথাটা সত্য সত্যই গিল্‌টি নয়। প্রকৃত কথা গিল্ডিং (Gilding)। এই গিল্ডিং হইতে চলিত কথা গিল্‌টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রিক্‌গিল্‌টি। রসকর্পূর ১ ভাগ ও নিশাদল ১ ভাগ একত্রিত করিয়া, নাইট্রিক এসিডে বিগলিত করতঃ সমভাগ স্বর্ণ চূর্ণ মিশ্রিত করিলে হইল। ইহা শ্বেতবর্ণ দ্রব্যে মাখাইলে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উত্তপ্ত করিলে, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে।

জাপান গিল্‌টি। কাষ্ঠের উপরিভাগ সিরিশ কাগজ দিয়া ঘষিয়া, অয়েলগোল্‌ড সাইজ ও তার্পিন তৈল সমভাগে মিশাইয়া, মাখাইয়া দিবে। পরে তদুপরি স্বর্ণচূর্ণ ছিটাইয়া দিয়া, ওয়াস লেদার দ্বারা পালিস করিতে থাকিবে। পরে উহাতে স্পিরিট বার্ণিস মাখাইয়া উত্তাপে ধরিলেই হইল।

তৈল গিল্‌টি। প্রথমে মসিনার তৈলে হোয়াইট লেড মিশাইয়া, যে স্থানে গিল্‌টি করিবে, সেই সেই স্থানে মাখাইয়া রাখিবে। পরে শুষ্ক হইলে, উহাতে কালসাইনেড হোয়াইট লেড, মসিনার তৈল ও তার্পিন তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মাখাইবে। এইরূপ নিয়মিত সপ্তাহকাল মাখাইবে ও শুষ্ক করিবে। পরে উহাতে স্বর্ণপাত লাগাইয়া, তুলা দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই উৎকৃষ্ট তৈল গিল্‌টি হইল। কাষ্ঠ, ধাতু ও পারিস প্লাষ্টার নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে এই গিল্‌টি উপযোগী।

পুস্তকের উপর গিল্‌টি। পুস্তকের যেখানে স্বর্ণাক্ষর বা চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, সেই স্থানে গমমাষ্টিকের সূক্ষ্ম চূর্ণ মাখাইয়া দিবে। পরে লৌহ বা পিতল যন্ত্র, যাহাতে অক্ষর বা চিত্র সজ্জিত আছে, তাহা উত্তপ্ত করিয়া, অভিলষিত স্থানে স্বর্ণপাত দিয়া, তদুপরি চাপিয়া ধরিলেই অবিকল চিত্র বা স্বর্ণাক্ষর সমূহ অঙ্কিত হইবে।

পিতলের বোতাম গিল্‌টি। পিতলের বোতাম গিল্‌টি করিতে হইলে, একটী পাত্রে গিলডিং আমলগাম ও একোয়া ফর্টিস্ একত্রিত করিয়া, বোতামগুলি উহাতে ডুবাইয়া, পরে ওয়াসেলদার দ্বারা পরিষ্কার করিয়া, উত্তপ্ত করিবে এবং শীতল হইলে, বিয়ার সুরায় ধৌত করিলেই হইল।

সাইন বোর্ড। সাইন বোর্ডে স্বর্ণাক্ষর লিখিতে হইলে, প্রথমে অক্ষরগুলি পীতবর্ণ রংয়ে লিখিবে এবং অয়েল গোলড সাইজ মাখাইবে, শুষ্ক হইলে, উহাতে স্বর্ণপাত লাগাইয়া বার্ণিস করিয়া লইলেই হইল।

স্বর্ণ রং করণ।—ফটকিরি ও লবণ এক আউন্স, সোরা ২ আউন্স অর্দ্ধ পাইণ্ট পরিষ্কার জলের সহিত ফোটাইতে হইবে। স্বর্ণালঙ্কার অতি উত্তম রং হয় সত্য, কিন্তু স্বর্ণের কিয়দংশ ইহার সহিত দ্রবীভূত হইয়া নষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা আমাদিগের দেশীয় স্বর্ণকারগণ যে প্রকরণে অলঙ্কারাদি রং করে, তাহা উৎকৃষ্ট এবং স্বর্ণ-ক্ষয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

দেশীয় প্রণালীতে স্বর্ণ রং করণ।—ফটকিরি ও লবণ অম্ল জলে দ্রবীভূত করিয়া, অলঙ্কারগুলিতে মাখাইবে। পরে কুঁচি কি ব্রুস দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া, একটী পাত্রে সামান্য পরিমাণে ফটকিরি, পক্ক তেঁতুল, অত্যম্ল গন্ধক ও নিশাদল মিশ্রিত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলেই অতি সুন্দর রং হইয়া থাকে।

পুরাতন গিল্‌টি উজ্জ্বল করণ।—এলেটা এবং সল্ট অব টার্টার প্রত্যেকে এক আউন্স, তিন পোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে ফোটাইতে হইবে। পরে ১।৪ অংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ২০ গ্রেণ জাফ্রাণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। অল্প উষ্ণাবস্থায় উহা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে। ইহা পুরাতন গিল্‌টিতে লাগাইলে, পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর।—উষ্ণ চূর্ণ এক আউন্স এক পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধবৎ হইলে, প্যারালাম ২ আউন্স দেড় পাইণ্ট উষ্ণজলে মিশ্রিত করিয়া, উহার সহিত সংযোগ করিবে। ইহা মলিন গিল্‌টির উপর মাখাইয়া পরিষ্কার জল দ্বারা ধৌত করিলে, অতি চমৎকার নূতন রং হইবে।

সপ্তম প্রবন্ধ।

রাসায়নিক প্রকরণ।

গ্যাসের আলো।—কলিকাতার গ্যাসের আলো বোধ হয় দেখিতে কাহারও বাকি নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ভাবিয়া থাকেন, ইহার ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই। পাড়াগাঁয়ের সকল স্থানেই যে এইরূপ গ্যাসের আলো প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তাহা বোধ হয়, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য সে উপায়টী নিম্নে লিখিতেছি।

একটী কলসী কি জালায় পাথুরিয়া কয়লা পূর্ণ করিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া দিবে এবং নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে। একটী লম্বা নল সেই কলসীর গাত্রে সাবধানে বসাইয়া অপর মুখে একটী বদ্ধমুখ কলসীর গাত্রে লাগাইয়া দিবে। প্রথম কলসীর পাথুরিয়া কয়লা উত্তপ্ত হইয়া, গ্যাস জন্মাইবে এবং ঐ নলপথে দ্বিতীয় কলসীতে আসিয়া সঞ্চিত হইবে। এক্ষণে যতদূর ইচ্ছা দ্বিতীয় কলসীর অপরদিকে নল বসাইয়া, সেই নলের মুখে প্রজ্বলিত দীপ সংলগ্ন করিবামাত্র জ্বলিতে থাকিবে। পাঠকবর্গ ইহা ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

বিনা কলে বরফ প্রস্তুত।—আজকাল বরফের ব্যবহার বড় চলিত হইয়াছে। চিকিৎসকগণও রোগ বিশেষে বরফের ব্যবস্থা করেন।

পাড়াগাঁয়ের সকল স্থানে বরফ পাইবার সুবিধা নাই। এমত স্থলে যদি ঘরে বিনাকলে বরফ প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার মত সুখের আর কি আছে!

শীতল, মেঘশূন্য ও পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু যে দিন বহিবে, সেই দিন কোন অনাবৃত স্থানে। (গ্রামের বহির্ভাগে হইলেই ভাল হয়) দুই হাত কি দেড় হাত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া, উহার অংশ (বার আনা ভাগ) শুষ্ক ঘাস ও খড় দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে ঐ ঘাসের উপর দেশীয় নূতন মালসা কি সরা শীতল জল পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিলে, পরদিন প্রত্যূষে তাহাতে বরফ দেখা যাইবে।

অন্যপ্রকার।—একটী ছোট শিশি পূর্ণ করিয়া, ঈথরপূর্ণ একটী বড় বোতলে নিমর্জ্জিত করিয়া, নল দ্বারা যদি ঈথরে ফুৎকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে, ৩০ মিনিটের মধ্যে ছোট শিশির জল জমিয়া, তখনি বরফ হইয়া যাইবে।

মার্কিং ইঙ্ক।—বা কাপড়ে চিহ্ন করিবার কালী। ইহা দ্বারা কাপড়ে নাম লিখিয়া রাখিলে, হারাইবার বা বদল হইবার কোন ভয় থাকে না অনেকে সূতা দিয়া নাম লেখেন, তাহাতে অপরিষ্কার দেখায় এবং ইহা করিলে সূতা খুলিয়াও ফেলা যায়। এমত স্থলে মার্কিং ইঙ্কই প্রশস্ত। প্রস্তুত প্রণালী নিম্নরূপ।

কাষ্টিকি আধ ভরি, বৃষ্টির জল আধ ছটাক, গঁদের ঘন মণ্ড এক কাঁচ্চা, লাইকর এমোনিয়া সিকি কাঁচ্চা। একটী পরিষ্কার শিশিতে এই কয়েকটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিবে। শিশিটী নীল কাগজ দিয়া মুড়িয়া সাবধানে রাখিবে। কাপড়ে চিহ্ন করিবার সময় নূতন কলমে লিখিয়া, সেই স্থানটী গরম করিবে। একখানি লৌহপাত্র গরম করিয়া, ঐ চিহ্নিত স্থানে চাপিয়া ধরিলেই হইল। এই লেখা কাপড় ছিঁড়িয়া গেলেও উঠে না বা লেখা অস্পষ্ট হয় না।

কেরোসিন তৈল। কেরোসিন তৈলের আবিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতেছে, এই তৈল অতি সুলভ। দরিদ্র ব্যক্তিরা এই তৈল কিনিয়া ব্যবহার করায়, অনেক পয়সা বাঁচিয়া যাইতেছে, কিন্তু সম্পন্ন ব্যক্তিরা ইহার দুর্গন্ধ ও ধূমাধিক্যপ্রযুক্ত ব্যবহার করিতে

প্রবৃত্ত কহেন। কাঁচের মূল্যবান ডুম চিম্নীযুক্ত দীপাধার প্রত্যক্ষ ধুম নিবারণ করে সত্য কিন্তু ঘরের উপরের ছাতে কালি পড়ে। উন্মুক্ত ছোট ছোট টিনের কুপীতে যাঁহারা এই তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়েন। গৃহের বস্ত্রাদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, এই প্রদীপের নিকট অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে নাকের মধ্যে পর্য্যন্ত কালি পড়ে। নাসাপুটের সহিত এই ধুম দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে। এমত স্থলে এই তৈলের দুর্গন্ধ ও ধুম যদি নষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় ইহা ব্যবহার করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। এক্ষণে কি উপায় ইহার ধুম ও দুর্গন্ধ নষ্ট করা যাইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে।

এক কানেস্ত্রা (ডে লাইট) কেরোসিন তৈল কিনিয়া প্রথমতঃ তাহা ৭ ৮ দিনের মত রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। ধুম হইবার কারণ এই তৈল খনিজ সুতরাং তৈলের সহিত জলীয় অংশ অধিক পরিমাণে থাকায় ধুম হয়। রৌদ্রের তাপ পাওয়ায়, তাপের পরিচালিকা শক্তি বলে ঐ তৈল উত্তপ্ত এবং সেই জন্য জলীয় অংশ বাষ্পাকারে পরিণত ও ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তৎপরে একটি বড় গাম্‌লা উষ্ণ জলপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে ঐ ক্যানেস্ত্রা বসাইয়া দিবে। পরে ব্যবহার করিবে। বব্যহার কালে ইহার পলিতা স্পিরিট দ্বারা তিজাইয়া দিলে আর ধুম হইবে না।

কেরোসিন তৈলের দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে হইলে, ইহার সহিত সিকি পরিমাণে নারিকেল তৈল ও প্রতি সেরে ৮ ফোটা হিসাবে গোলাপী আতর এবং পচাপাতা, মোহঙ্গুর প্রভৃতি তৈলের যে মসলা বেনে দোকানে পাওয়া যায়, ঐ মসলা তৈলের কানাস্ত্রার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে। এই সমস্ত দ্রব্য মিশাইয়া এক সপ্তাহ কাল তৈল ব্যবহার করিবে না। পরে ব্যবহার করিলে ইহার যে দুর্গন্ধ মাত্র নষ্ট হইবে তাহা নহে, যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিবে, সুবাসে সে ঘর আমোদিত হইবে সন্দেহ নাই। কোন অজানিত ব্যক্তি কেরোসিন তৈলের বিষয় মনেও ভাবিয়া আনিতে পারিবেন না, বরং গন্ধতৈল জ্বলিতেছে বলিয়াই তাঁহার ভ্রম জন্মিবে। আবার নারিকেল তৈল মিশ্রিত করণ হেতু আকস্মিক

কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। কেরোসিন তৈল সামান্য উত্তা-পেই জ্বলিয়া উঠায় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এই মিশ্রিত তৈলে সেরূপ বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। ভরসা করি, উইরূপ প্রণালীতে তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

চুলের কলপ। এই কলপ প্রায় একমাস কাল স্থায়ী হয়। পাকা চুল কাল করিতে যাহারা বিশেষ উৎসুক, অতঃপর তাহারা এই কলপ ব্যবহার করুন।

মুদ্রাশঙ্খ ২ ভাগ, শুষ্ক চূর্ণ ১ ভাগ আর চা খড়ি দুই অংশ এই তিন দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। ব্যবহার কালে ইহার কিয়দংশ গরম জলে গুলিয়া চুলে মাখাইয়া দুই ঘণ্টা পরে ধৌত করিয়া ফেলিবে। চুলে লাগাইবার জন্য ব্রস ব্যবহার করিবে। হাতে করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, কেন না এসব ঔষধ বিষাক্ত।

নকল তুলিবার যন্ত্র। এতদ্বারা কোন পত্র বা চিত্রের ৫০ খানি নকল এক সময় তুলিতে পারা যায়। আবার ইহার প্রস্তুত প্রণালী এত সহজ যে, সকলেই ইহা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতে পারেন।

প্রথমে ওজন মত জিলাটিন ঠাণ্ডা জলদ্বারা ভিজাইয়া রাখিবে। ৪ ঘণ্টার মধ্যে জিলাটিন গুলি ভিজিয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহা ছাঁকিয়া অন্য একটি চিনে বাটীতে তুলিবে। একখানি কড়া জলপূর্ণ করিয়া তাহা জ্বালে চড়াইবে এবং ঐ জিলাটিনের বাটিটী ঐ জলের উপর ভাসিতে থাকিবে। অগ্নির উত্তাপে জল গরম হইলে জলের উত্তাপে জিলাটিনও গলিয়া বেশ তরল হইলে ৪ ভরি ওজনে গ্লিশিরিণ মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দিবে। তাহার পর চারি আনা ওজনে চা খড়ি দিয়া আবার নাড়িয়া দিবে। বেশ জল মরিয়া গেলে নামাইয়া লইবে।

একটী টিনের বাক্সের ঢাকনীর মত টিনের প্লেট প্রস্তুত করিয়া লইয়া উহাতে ঐ মণ্ড ঢালিয়া দিবে। টিনের প্লেটের কিনারা এক অঙ্গুলী পরি-মান উচ্চ হইলেই যথেষ্ট। মণ্ডটী প্লেটে ঢালিয়া জল দিয়া তাহার উপরি ভাগ ধৌত এবং শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা উহা শুকাইয়া লইবে।

১ ভাগ বেগুনী রং, জল সাত ভাগ ও ২ ভাগ স্পিরিট একত্রিত করিয়া কালী প্রস্তত করিয়া রাখ। নূতন কলমে ভাল চকচকে কাগজে চিত্র কি পত্র লিখিয়া শুস্ক কর। লিখিবার সময় অধিক কালি ব্যবহার করিতে হইবে। লেখা শুস্ক হইলে উহা ঐ প্লেটের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাগজে উঠাইরা লও। তখন দেখিবে ঐ মণ্ডের উপর চিত্র বা পত্রের অবিকল ছাঁচ উঠিয়াছে। তখন ইচ্ছামত ঐ ছাঁচের উপর কাগজ রাখিয়া সম যত্নে চাপ দিলেই নকল উঠিতে থাকিবে। ইহার নকল এত পরিস্কার যে, হাতে লেখা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এক একখানি ছাচে ৫০ খানি পর্য্যন্ত নকল উঠিতে পারে। একবার নকল তুলিলে ছাচ নষ্ট হয় না। নাবান জল দিয়া ধৌত করিয়া তাহারা উপর আবার নূতন ছাঁচ হইয়া থাকে। অধিক দিন মণ্ড থাকিলেও নষ্ট হয় না। ছাঁচ তুলিবার সময় একবার প্লেটখানি গরম করিয়া লইলেই আবার নূতন হইল।

চুল উঠা নিবারণ। মিঠা তৈল ও স্পিরিট অব রোজমেরি সমান ভাগে লইয়া তাহার সহিত ৩০ ফোটা [জায়ফলের তৈল মিশাইয়া শিশিতে করিয়া রাখিবে। বৈকালে কি সন্ধ্যাকালে নিয়মমত বঃবহার করিলে চুল উঠা মিবারণ হইবে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে আবার নূতন চুলে মাথা পুরিয়া যাইবে।

অন্য প্রকার।—অডিকলোন এক ছটাক, টিংচার অব ক্যাম্থ্যারাই ডিস আধ কাঁচ্চা, রোজমেরি তৈল ১০ ফোটা, ল্যাভেণ্ডার তৈল ১০ কোটা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলেই উক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাড়িত কবচ।—চারিদিকে তাড়িত কবচের বড় প্রাধান্য দেখি-তেছি। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা তাড়িত কবচ, তাড়িত অনন্ত, তাড়িত অঙ্গুরীয়, তাড়িত পদক ব্যবহার করিতেছেন। তাড়িত সম্বন্ধীয় এই কবচের বিজ্ঞাপনে যাবতীয় রোগ নিবারণের কথা লেখা আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সবগুলি আরোগ্য হউক না হউক, শোণিত সম্বন্ধীয় পীড়া ইহাতে যে আরোগ্য হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে এই সমস্ত রোগ নিরাময়ের জন্য অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরী ও মাদুলী ব্যবহৃত হইত। আসল কথা এই যে, তাড়িত কবচাদি কেবল নামের

তারতম্যমাত্র। নতুবা প্রস্তুত প্রকরণ সেই একই। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, তাম্র, লৌহ, পারদ, সীসা, দস্তা এই অষ্ট ধাতুর সন্মিলনে যে কোন আকারের অঙ্গুরী,কবচ, অনন্ত প্রভৃতি) কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলেই হইল।

তাড়িত বলে শীলমোহর প্রস্তুত।—তাড়িত কোষ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কোন মৃৎপাত্রে তুঁতে ভিজার ঘন জল, দস্তা ও তাম্র একত্রিত করিয়া দুই প্রস্থ সজ্জিত করত সুক্ষ্ম পিত্তল ও তাম্র তার :সংযুক্ত করিয়া দিলে তড়িতের পরিচালিকাশক্তি অনুভূত হয়। একটি তাম্রাধারের যে নামের শীল হইবে, সেই অক্ষর কয়েকটী যোজনা করিয়া তার দ্বারা দৃঢ়তর আবদ্ধ করিয়া, তার দ্বারা পার্শ্বদেশ উপরে রাখিবে এবং অক্ষরগুলি ঝুলাইয়া তুঁতেয় জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে। তাড়িতবলে তুতের তামা আনিয়া ঐ অক্ষরের মুখে লাগিবে। ইহাতে উল্টা :অক্ষর উঠিবে। গোটা পার্চ্চা গালা দ্বারা কোন চিত্র বা নামের শীল তুলিয়া এই প্রক্রিয়া দ্বারা শীল ও শত শত চিত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইলেকট্র প্লেটীং বা তাড়ীতবলে অক্ষরাদির নকল ছাঁচ ও ছাপ তুলিবার প্রণালীও এই প্রকার।

সাধারণ নিয়ম এই যে, যদি উল্টা ছাপ তুলিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে গালা বা গোটাপার্চ্চার ছাঁচ তুলিতে হইবে, আর অক্ষরের ছাঁচ তুলিতে কেবল অক্ষরগুলি উক্ত প্রকার বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেই হইল। তাড়িতবলে ঐ তুঁতে ভিজার জলের তাম্র বিন্দু বিন্দু রেণু পরিমাণে সপ্তাহ কি ১০। ১২ দিনে সম্পূর্ণ তাম্র ছাঁচ উঠিবে। তখন ইচ্ছা মত হ্যাণ্ডেলে কি অন্য কোন বস্তুতে সিরিশ দিয়া জুড়িয়া লইলেই হইল। সিরিশের পরিবর্ত্তে আঠা কি সময়দার মণ্ড দিয়াও কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ময়দার রুটী প্রস্তুতের ন্যায় জলে মাখিয়া ক্রমে জল দিয়া ধৌত করিতে করিতে অবশিষ্ট যে আটারৎ অংশ থাকে, তাহা চুর্ণ দিয়া মাখিয়া লইলেই উত্তম আটা প্রস্তুত হইল। উহা জলে খুলিয়া যায়।

শীল মোহরের কালী।—এক তোলা রং ৫ তোলা স্পিরিট মাতগুড় ১ তোলা উত্তমরূপে মিশাইয়া লইলেই চলিত শীলমোহর কালি

All is well that end is well.

প্রস্তুত হইল। এই কালী পিতল শীলের জন্য নয়, রবার ষ্ট্যাপে এ কালি ব্যবহৃত হয়। পিতল শীলের কালি, এক তোলা ভূষা, রেড়ীর তৈল দুই তোলা, শঙ্খচূর্ণ আধ তোলা, একত্রে মিশাইয়া ফুটাইবে। পরে নামাইয়া এক তোলা তার্পিন তৈল মিশাইয়া লইলেই হইল। ভূষার পরিবর্ত্তে বেত দগ্ধ করিয়া, সেই কয়লা চূর্ণ করিয়া লইলে, কালি আরও ভাল হয়।

চিরস্থায়ী কালী।—এই কালী সর্ব্বদা ব্যবহার করিলেও, ৫০।৬০ বৎসর চলে। প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ,—ভূষা ৫ তোলা, তোলাই আড়াই তোলা, সুরাসার এক তোলা, ভেলার আটা এক তোলা, এই কয়েক দ্রব্য মিশাইয়া, দলা পাকাইয়া দোয়াতের নিম্নে আঁটিয়া দাও। পরে আবশ্যকমত জল দিয়া রাখিবে। শুষ্ক হইলে বা কালি ঘন হইলে, জল দিয়া লইলেই হইল। এই কালিতে লিখিলে, লেখা অতি কাল ও চাকচিক্যযুক্ত হয়। কাপড়ে কালি লাগিলে, তাহা আর উঠে না, অতএব সাবধানে এ কালিতে লেখা আবশ্যক।

জীবজন্তু বশীকরণ।—বশীকরণ দ্রব্যগুণ ও মন্ত্রাদির দ্বারা হইয়া থাকে, জানা আছে। কিন্তু আমাদিগের এ বশীকরণ সেরূপ নহে। ইহা তাড়িতের বশীকরণ। ডেলিয়ার সাহেবের ব্যাটারীর তার যে কোন জীবের শরীরের কোন স্থানে স্পর্শ করাইলে, সে মোহিত ও বশীভূত হইয়া, তাড়িত-তার যে দিকে সঞ্চারিত করিবে, সেই দিকে গমন করিবে। তাড়িত-কোষের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেই তাড়িতকোষের আকার ছোট করিয়া, উহা পকেটে গোপনভাবে রাখিয়া, তাহার তার কৌশলে হাতের মধ্যে রাখিবে। একটী টাকা প্রমাণ গোলাকার চাক্তি হাতের তালুর উপরে রাখিবে। ঐ চাক্তির নিম্নে সম পরিমাণে গোলাকার কাঁচ ও রবার পাত দেওয়া থাকিলে, ঐ তাড়িতে তাড়িতপরিচালকের কোন ক্ষতি হয় না।

টেলি-ফোঁ।—এই যন্ত্রের সাহায্যে এক বাড়ীতে বসিয়া কথা কহিলে, অন্য কেহ জানিতে পারিবে না, কেবল যাহার সহিত কথা কহা যায়, সেই ব্যক্তিই জানিতে পারে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নরূপ।

দুটী দুই ফুট লম্বা ৩ অঙ্গুলি পরিধিবিশিষ্ট টিনের নল প্রস্তুত করিয়া, তাহার একদিক পাতলা চামড়া দিয়া মুড়িবে। মোড়া দিকের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র করিয়া, তন্মধ্যে ভাল পাকান মাজা সরু সূতা প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সূতার অপর দিক দ্বিতীয় নলে এই প্রকার প্রবেশ করাইয়া, গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া দিবে। স্থানের দূরতা অনুসারে সূতার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। এই নলের এক দিকের খোলা অংশে মুখ সংলগ্ন করিয়া কথা কহিলে, দ্বিতীয় নলে কান দিয়া অন্য ব্যক্তি সেই কথা শুনিলে, অতি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। ডাক্তার হাট্ বলেন, কাল সূতা ও নল হইলে এবং মধ্যপথে সূতা অন্য কোন পদার্থে সংলগ্ন না হইলে, হাজার ফিট দূরের লোক অনায়াসে কথা বুঝিতে পারে। সেই যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, দূরস্থ কোন বাড়ীতে নলনী সংলগ্ন করিয়া রাখিলেই হইল। আবশ্যকমত কথোপকথন কার্য্য সুন্দররূপে অন্যের অজ্ঞাতে সমাধা করিবার জন্য এই যন্ত্র অতীব উপযোগী। এই যন্ত্র আমেরিকায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

অষ্টম প্রবন্ধ।

বিবিধ বিজ্ঞান।

রোজ সিরপ।—ফোটা সুগন্ধি গোলাপ ৬ আউন্স, ১॥ পাইণ্ট গরম জলের সহিত বার ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে বাষ্প তাপ দ্বারা চোয়াইয়া এক কোয়াটার লইতে হইবে। এবং তিন সের উৎকৃষ্ট শ্বেত শর্করা মিশ্রিত করিয়া, অবশেষে শীতল হইলে, ৫॥ সাড়ে পাঁচ আউন্স রেকটিফায়েড স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া লইলে, প্রস্তুত হইবে।

লেবুর সিরপ।—উৎকৃষ্ট শ্বেত শর্করা ১॥ পাউণ্ড অল্প উত্তাপে গলাইয়া, এক পাউণ্ড লেবুর রস উত্তমরূপে ছাঁকিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। একদিন পরে উপরস্থ অস্বচ্ছাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পরিষ্কার অংশে ২॥ আড়াই আউন্স রেকটিফাইড স্পিরিট সংযোগ করতঃ বোতলে কাক বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

সোডাওয়াটার। একটী বোতলে তিন ভাগের দুই ভাগ পরিষ্কার জল লইয়া, উহাতে বাইকার্বনেট অব সোডা ৪০ গ্রেণ এবং টার্টারিক এসিড ৩০ গ্রেণ নিক্ষেপ করিয়া, তার দিয়া কাক বন্ধ করিতে হইবে। পরে নাড়িয়া ব্যবহার করিলে, অবিকল বাজারের সোডাওয়াটারের মত হয়।

লেমনেড। একটী বোতলে বাইকার্ব্বানট অব সোডা অর্দ্ধ ড্রাম, পরিষ্কৃত শর্করা ২ ড্রাম, এসেন্স অব লেমন ২ ফোঁটা এবং অর্দ্ধেক জল দ্বারা পুরিত করিয়া, ৩৫—৩০ গ্রেণ নাইট্রিক এসিড প্রক্ষেপ পূর্ব্বক কাক বন্ধ করতঃ কিয়ৎক্ষণ নাড়িলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ কার্ব্বনেট অব পটাশ ব্যবহার করিতে বলেন।

ইলোকট্রো ব্রোঞ্জিং। বরনেল সাহেব পেটেণ্টানুযায়িক ক্লোরাইড অব কপার এক পাউণ্ড, অর্দ্ধ গ্যালন জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে। কার্ব্বনেট অব পটাশ ২৫ পাউণ্ড ৬ গ্যালন উষ্ণ জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে। সলফেড অব জিঙ্ক ২ পাউণ্ড অর্দ্ধ গ্যালন উষ্ণ জলে দ্রবীভূত করতঃ উপরোক্ত মিশ্রণের সহিত মিশ্রিত করণান্তর, ১২ পাউণ্ড নাইট্রেক অব এমনিয়া সংযোগ করিয়া নাড়িতে হইবে এবং উহাতে ২০ গ্যালন জল সংযোগ করিতে হইবে। ইহাতেও উপরোক্তের ন্যায় ব্রাস আলোড ও একটীভ ব্যাটারির দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে এবং সময়ে সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে এ্যামোনিয়া দ্রব ও আএনাইড অব পটাশিয়ম ইহাতে মিশ্রিত করিতে হইবে।

ইলেকট্রো কপারিং। লৌহ কিম্বা দস্তা নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ইলেক্ট্রো কপারিং করিবার জন্য জল মিশ্রিত হাইড্রো ক্লোরিক এসিড কিম্বা যে কোন একটী এসিড দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে হইবে। সলফেট অব কপার ২ আউন্স, ফোটান বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত করিয়া, শীতল হইলে, ৪ আউন্স কার্ব্বনেট অব পটাশ এবং এমিনিয়া দ্রব ২ আউন্স মিশ্রিত করতঃ যাহা অধঃপতিত হইবে, তাহা পুনরায় দ্রবীভূত করিয়া ৬ আউন্স আএনাইড অব পটাশিয়ম সংযোগ করিবে। যে পর্য্যন্ত না নীলবর্ণ দূরীভূত হয়। পরে জল মিশ্রিত করিয়া, এক গ্যালন প্রস্তুত করিয়া, একটিভ ব্যাটারি দ্বারা কর্ম্ম করিতে হইবে।

ইলেক্‌ট্রো গিল্‌ডিং। গিল্‌টিকরণ প্রক্রিয়াতে এলকিংটন সাহেবের ইলেক্‌ট্রো গিল্‌ডিং এর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দ্রব্যও ইহার জন্য ব্যবহৃত হয়। অক্সাইড অব গোলড অর্দ্ধ আউন্স এবং সাএনাইড অব পটাশিয়ম ২ আউন্স, এক পাইণ্ট পরিশ্রুত জলে দ্রবীভূত করিয়া, একটিভ ব্যাটারি দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে।

ইলেক্‌ট্রো সিলভারি। রৌপ্য ১ আউন্স, নাইট্রিক এ্যাসিডে দ্রবীভূত করিয়া, দানাদার নাইট্রেড অব সিলভার হইলে, উহা ৩ পাইণ্ট পরিশ্রুত জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে। পরে ঐ মিশ্রণে লবণ মিশ্রিত করিলে, যাহা অধঃপতিত হইবে, তাহা সাএনাইড অব পটাশিয়মের তেজাল দ্রব্য বিগলিত করিতে হইবে। অবশেষে ইহাকে পুনঃ পুনঃ ফিলটার বা শোষক কাগজে ছাঁকিয়া, পরিশ্রুত জলমিশ্রিত এক গ্যালন পরিমিত করিতে হইবে। ইহা ক্ষীণ ব্যাটারি দ্বারা কার্য্য করিলে, পুরু আবরণ হইয়া থাকে।

ফিলটারিং চূর্ণ। সাজিমাটী উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া, অস্থির কয়লা চুণের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে।

কাষ্ঠকে অগ্নিতে অদগ্ধকরণোপায়। ইহার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। সলফিউরেট অব কালসিয়ম কিম্বা বেরিরম দ্রব অথবা তুঁতের জল। প্রথমতঃ কাষ্ঠগুলি একটী আবৃত পাত্র মধ্যে রাখিয়া, বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু বহিস্কৃত করিয়া, উপরোক্ত দ্রব্যের জল দিয়া, উত্তমরূপে সিক্ত করিতে হইবে।

কেশকে কোঁকড়ান অবস্থায় রাখিবার উপায়। দেড় ড্রাম গম্ ট্রাগকান্থ, ৭ আউন্স জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, একদিবসকাল পরে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া, ২০ ফোঁটা আটো ডি রোজ এবং ৩ আউন্স প্রুফ স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। কোঁকড়ান কেশে ইহা অঙ্গুলি দ্বারা মাখাইলে, কেশগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় থাকে।

শুভ্র কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করণ প্রক্রিয়া। লিদার্জ দুই ভাগ, গোঁড়াচূর্ণ এক ভাগ এবং সূক্ষ্ম খাটিকাচূর্ণ দুইভাগ একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে, পরে ব্যবহার করিবার সময় উষ্ণজল মিশ্রিত করণান্তর ব্রুস দ্বারা কেশগুলিতে উত্তমরূপ মাখাইয়া, ২ ঘণ্টাকাল পরে কেশগুলি সাবান

ও জল দিয়া ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। যদি কেশে তৈল এবং অপরিষ্কার পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহা সাবান ও জল দিয়া ধৌত করিয়া শুষ্ক করণান্তর ব্যবহার করিতে হইবে।

দন্তমঞ্জন।—সাধারণতঃ বাত, ব্রিক, লবণ, কয়লা এবং খটিকা প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ দন্তমঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টুথ পাউডার প্রস্তুত করিবার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) খটিকাচূর্ণ ১২ আউন্স, কাটল ফিসকেন চূর্ণ ৮ আউন্স, অরিস মূল চূর্ণ ৪ আউন্স, ড্রাগেনস ব্লড অর্থাৎ খুনখারাপি চূর্ণ ১॥ আউন্স, লবঙ্গ এবং ক্যাসিয়া তৈল অৰ্দ্ধ ড্রাম একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে।

(খ) এক আউন্স কর্পূর কয়েকবিন্দু স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিতে হইবে। পরে ৭ আউন্স অধঃপতিত খটিকা উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া, অবশেষে চালনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলে ইহা ব্যবহার কর্ত্তব্য।

পুটিং।—কোটান মসিনার তৈলে খটিকা চূর্ণ উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া, কাইএর মত হইলেই ইহা প্রস্তুত হইল।

সিরিষ।—পশ্বাদির খুর, শৃঙ্গ এবং চর্ম্মাদির অংশ যাহা চর্ম্মকার দিগের অনাবশ্যক তাহা একত্র করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চদশ দিবসকাল চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে শুষ্ক করতঃ উহাকে চূর্ণের জলে ধৌত করিয়া একদিবসকাল বায়ুতে রাখিয়া শুষ্ক করিতে হইবে তৎপরে একটী লৌহপাত্রে করিয়া দুই ভাগ জলের সহিত যে পর্য্যন্ত আটাবৎ না হয়। অল্প অল্প উত্তাপে ফোটাইবে তদন্তর ঐ আটাবৎ পদার্থ পরিষ্কৃত করিবার জন্য অল্প পরিমাণে ফটকিরী চূণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, একটী ছিদ্রময় পাত্রে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে উহার পরিস্কৃত অংশ ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া যায় এবং অপরিস্কৃত অংশ জলের সহিত পুনরায় ফোটাইয়া, পিষ্টকাকারে পরিশুষ্ক করিয়া লইলেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ম্যানহিম গোল্ড বা সোহাগা।—তাম্র ৮৫ ভাগ এবং দস্তা ১৫ ভাগ অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া মিশ্রিত করিলে উত্তম সোহাগা প্রস্তুত হয়। ইহা মোসেক: গোলস্ড, ম্যানহিম গোল্ড, পিঞ্চবেক, প্রিনসেস্

মেট্যান লোহিতবর্ণ পিত্তল, সিমিলর, টম্বাক প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মোসেক্ গোল্ড। একটী পাত্রে বিশুদ্ধ রাঙ, ১২ আউন্স অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে পরদ ৬ আউন্স মিশ্রিত করিতে হইবে পরে শীতল হইলে নিশাদল ৭ আউন্স এবং গন্ধক চূর্ণ ৭ আউন্স উহার সহিত একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইলে, পারদ ও নিশাদল বাষ্পকারে উড়িয়া যায় এবং কেবল উজ্জ্বল কোবল মোসেক গোল্ড অবশিষ্ট থাকে।

পিত্তল ঝাল। পিত্তল ৩ ভাগ এবং দস্তা ১ ভাগ অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া শীতল হইলে উহাকে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিতে হইবে। ইহা পিত্তলাদির পাত্র ঝালিবার সময় ইহার সহিত নিশাদল চূর্ণ ব্যবহার করা যায়।

রাং ঝাল। রাং ২ ভাগ এবং সীস একত্রে মিশ্রিত করত অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া লইতে হইবে। ইহা তাম্রপাত্র রাংএর খেলেনা, টীনের বাক্স প্রভৃতি ঝালিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ঝালিবার সময় রজন বা ধুনা বাবহার করা যায়।

লিথোগ্রাফি কাগজ প্রস্তুত করণ। শ্বেতসার ৬ আউন্স এবং ফটকিরি ১ আউন্স, এই দুইটী দ্রব্য পৃথক পৃথক উষ্ণজলে দ্রবীভূত করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় বুরুষ দ্বারা মাখাইয়া উহা পরিশুষ্ক করত পুনরায় মাখাইয়া পরিশুষ্ক করিতে হইবে। এই প্রকারে ২।৩ বার মাখাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করত মসৃণ করিয়া লইলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাচ খোদাই করণ। প্রথমতঃ যে কাচের উপর খোদাই করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে মম দ্বারা আবৃত করিয়া অঙ্কিত করনানন্তর উহা তরল হাইড্রো ক্লোরিক এসিড দ্বারা সিক্ত করিলে কিম্বা ঐ খোদাই কাচ পাত্রকে হাইড্রো ক্লোরিক এ্যাসিড বাষ্পের ধুম মধ্যে কিয়ৎকাল রাখিলে খোদাই স্থান অস্বচ্ছ হইয়া যায় এবং মমাবৃত স্থান হইতে মম উঠাইয়া লইলে পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছ হয়।

সীস বৃক্ষ। একটী কাচের বোতলে ১ আউন্স সুগার অব লেডে; ২।৫ ফোটা এ্যানেটীক এ্যাসিড মিশ্রিত ১॥ পাইণ্ট পরিস্রুত জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে। ওরে ঐ বোতল হইতে একখণ্ড দস্তা সূক্ষ্ম

সূত্রদ্বারা ঝুলাইয়া রাখিলে কিছুকাল, পরে উহা প্রকৃত লতা সম্বিত গুল্মের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রৌপ্য বৃক্ষ। ইহাও পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার ন্যায় একটী কাচের বোতলে নাইট্রেড অব সিলভার ২০ গ্রেণ ৩০ আউন্স পরিস্রুত জলে দ্রবীভূত করিয়া উহাতে বিশুদ্ধ পারদ অর্দ্ধড্রাম মিশ্রিত করিতে হইবে।

রাং বৃক্ষ। ইহাতে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় একটী কাচের বোতলে ক্লোরাইড অব টিন ২ ড্রাম, নাইট্রীক এসিড ১০।১৫ বিন্দু, এক পাইন্ট পরিস্রুত জলে দ্রবীভূত কহিয়া এক খণ্ড দস্তা সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা কিছুকাল ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

রবারের যুতা যুড়িবার আঠা। ইণ্ডিয়ান রবর খণ্ড করিয়া বেঞ্জোইনের সহিত অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত করত প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা দ্বারা রবরের বাক্স জুতা প্রভৃতি যোড়া যায়।

কাচ যুড়িবার সহজ উপায়। রশুন থেৎলাইয়া তদ্দারা ভগ্ন কাচের বাসন যুড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে, কিন্তু ইহা হীম লাগিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

অদৃশ্য কালী। এই প্রকার কালির লিখন অগ্ন্যুত্তাপে, কিম্বা কোন রাসায়নিক কার্য্য ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা সচারাচর গুপ্ত পত্রাদি লিখিত হয়। প্রকরণ,—নিশাদল এবং সল্‌ফেট অব কপার (তুঁতে) সমভাগে জলে দ্রবীভূত করিয়া, তদ্দারা লিখিয়া তাহাতে উত্তাপ সংলগ্ন করিলে পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়।

কাঁচা দুগ্ধে লিখিয়া অগ্ন্যুত্তাপে ধরিলে ধূসরবর্ণ লিখন দৃষ্ট হয়।

মাজুফলের ক্বাথ দ্বারা লিখন শুষ্ক করণান্তর সল্‌ফেট অব আইরণ (হিরাকস) দ্রব দ্বারা সিক্ত করিলে সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ লিখন দৃষ্ট হয়।

পর্‌মল কালি। পরিষ্কার লগউড ডিক্‌কসনে (বকম কাষ্ঠের ক্বাথে) অত্যল্প পরিমাণে ফটকিরি কিম্বা ক্লোরাইড অবটিন মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়।

ব্রাউন কালি। তেজাল খদিরের ক্বাথে অত্যল্প পরিমাণে বাইক্রোমেট্‌ অব পটাস্‌ দ্রব মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়।

সবুজ কালি। সাধারণতঃ স্যাপগ্রিণ অত্যল্প পরিমাণ, পাতলা ফটকিরির দ্রবে মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়।

Chance is the providence of adventures.

পীতবর্ণ কালি। গাম্বোজ চূর্ণ এক আউন্স, জলে দ্রব করণান্তর শীতল হইলে, এক কিম্বা অর্দ্ধ আউন্স স্পিরিট মিশ্রিত করিলেই প্রস্তুত হইবে।

স্বর্ণ কালি। অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণস্তবক চূর্ণ গঁদের জলে মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। রৌপ্যবর্ণ কালি হইলে ঐ প্রকার স্বর্ণস্তবক চূর্ণ পরিবর্ত্তে রৌপ্যস্তবক চূর্ণ ব্যবহৃত করিতে হয়।

স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য কালিতে লিখিয়া শুষ্ক হইলে, উহার উপর স্পিরিট বার্ণিস মাখাইলে সুন্দর স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য অক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চিরস্থায়ী কালি। ল্যাম্পব্লাক (ভুষা) ২ ড্রাম একটী আবৃত পাত্র মধ্যে লোহিতোত্তপ্ত করণান্তর উহাতে উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কালি এক পাইণ্ট স্বল্প করিয়া ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত করিতে হইবে। শীতল হইলে এই কালি ক্লোরিণ ব্যাক্স ও ক্ষীণ দ্রাবাদি দ্বারা নষ্ট হয় না।

বেজাঙ্গার সাহেবের মতে ল্যাম্পব্লাক, জেলেটিন ও কষ্টিক সোডা এই তিনটি পদার্থ কষ্টিক সোডার ক্ষার সংযুক্ত জলে উত্তমরূপে পেষিত করিলে প্রস্তুত হইবে। ইহা দেখিতে অবিকল চীনের কালির ন্যায়। ইহা পেষ্ট-বোর্ড পার্চ্চমেণ্ট কাগজ প্রভৃতিতে লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্লু-ব্ল্যাক কালি। মাজুফল ২ সের, হিরাকস ১ সের, খদির অর্দ্ধ-পোয়া, জল ॥০ সের, নীল রং ১ ছটাক, পীত ম্যাজেণ্টা ১০ গ্রেণ। প্রথমতঃ মাজুফলকে অল্প চূর্ণ করণান্তর কুড়ি সের জলে সাত দিবসকাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপশ্চাৎ লৌহ কটাহে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিবে। যখন দেখা যাইবে, যে, উত্তম সিদ্ধ হইয়াছে, তখন উহাতে হিরাকস ও খদির দিবে। এরূপে আরও কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে, যখন দেখিবে যে, উত্তম কাল রঙ হইয়া উঠিয়াছে, তখন চুলি হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ৮।১০ দিন রাখিয়া দিবে। সর্ব্বশেষে পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া এক ছটাক নীল রঙ ও পীত মেজেণ্টা ১০ গ্রেণ মিশাইয়া লইবে। তাহা হইলেই উত্তম ব্লুব্লাক কালি হইল।

নবম প্রবন্ধ ।

ধাঁধাঁ ।

1. A door less house made by God is sat upon contineously by a justing devotee, The house-occupant soon grows so strong and large as to breaks through the house, with outside. what is this ?

2. His name made by three Alphabets. he lived every where. take his middle type. he will sing many good sungs, if behead his first alphabet, all goodly eat him, if you less his last, all will be fearfull, who is he ?

3, He has born to his wife's, his son is very powerful, his daughter is smally, who is he.

4. They four brothers dwelling in one lodgiug with very friendly, when they going out, kill each other what is this ?

5. He has born to the water, but lived at earth, if he want to meet with his mother, kill eat him, who is he ?

Ansewers,—1; Egg; 2; Beding; 3; Fish; 4; Caids; 5; Sult,

১ ! নাক মুখ চ'ক আছে নাহি তার দন্ত ।
সর্ব্বশরীর আছে, কিন্তু নাহি তার অন্ত ॥
আগে মানুষ খেতো কিন্তু এখন নাহি খায় ।
হেঁয়ালির ছন্দ কালিদাস পথে যেতে কয় ॥

২। তিন বীর, বার শির, বেয়াল্লিশ লোচন।
চারি বীর সহিত সদাই করে রণ॥
তার সেনা ষোল জন মরিয়া না মরে।
কহে করি কালিদাস হেয়ালির নরে॥

৩। যুধিষ্ঠিরস্য যা কন্যা নকুলে চ বিবাহিত।
সহদেব পূজিতা কন্যা তাং কন্যা বরদা ভব।

৪। পাপিষ্ঠ মাথাটা, দু'হাত কুড়ি আঙ্গুল নাকটা,
চক্ষু কর্ণ নাই, এমন কি জন্তু আছে বল দেখি ভাই?

৫। তিন অক্ষরে নাম তার হেঁয়ালির সার।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে নরের আহার॥
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গান।
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে লোকে ভয় মান॥

৬। লকরেতে জন্ম তার কুন্তে কিছু দেখি।
মীনের সহিত তার কিছু কিছু ভুখি॥
বড়ই আস্বাদ তার গাড়লের মাসে॥
থাকুক মুর্খের দায় পণ্ডিতে বুঝে বার মাসে।

৭। কৃষ্ণমুখ ন চ কৃষ্ণ, দ্বিজিহ্বা ন চ সর্পিণী।
পঞ্চ ভর্ত্তা ন পাঞ্চালী, তস্যাহং কুলবালিকা॥

৮। শিরং নাস্তি, পদং নাস্তি অস্থি ন চাঙ্গুলী।
পুরুষ ভক্ষয়েৎ নিতং তস্যাহং কুলবালিকা॥

উত্তরমালা। ১। সাপের খোলস। ২। পাশা খেলা। ৩। দুর্গা। ৪। মনুষ্য। ৫। বিছানা। ৬। পক্ক আম্র। ৭। কায়স্থের মেয়ে। ৮। দর্জ্জীর মেয়ে।

দ্রব্যসূচী।

বিলাতী দ্রব্যের বাঙ্গালা নাম আবার ইংরাজিতে লিখিতে বানান ভুল করিলে ক্রয়কালে ভ্রম ও পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে। সেই জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের ইংরাজী নাম দিলাম,—দ্রব্যগুলি ক্রয় কালে তাহার লেবেলের বানান ও ইহার লিখিত বানান মিলাইয়া ক্রয় করিলে আর গোলযোগ ঘটিবে না।

বাঙ্গালা নাম		ইংরাজী নাম
রেক্‌টিফাইড স্পিরিট	...	Rectified Spirit,
সদ্‌গন্ধযুক্ত ল্যাভেণ্ডার	...	Odoriferous Lavender water,
বর্গমেট তৈল	...	Oil of Bergamette,
এম্‌বারগ্রিজ এসেন্স	...	Essence of Ambergris.
অটো অব রোজ	...	Otto of Rose.
স্মিথের ল্যাভেণ্ডার	...	Smith's distilled Essence of, Lavender.
অডিকলোন	...	Eau De cologne,
স্পিরিট অব বাম	...	Spirit of Balm,
কুইন অব হাঙ্গেরিজ ওয়াটার	...	Queen of Hungary's water.
ইউ ডি পর্টুগাল	...	Eau De Portugal.
লেমন গ্রেস অয়েল	...	Oil of Lemongress.
পারফিউম ডি রয়	...	Perfume De Roi.
স্পিরিট ডি রোজ	...	Spirit De Rose.
ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়ম	...	Chloride of Calcium.
বিলাতী আতর	...	Otto de Rose.
ভারতীয় গোলাপ	...	Essenee of Indian Rose.
ভার্ব্বেনার এসেন্স	...	Essence of Verbena.
লেবুর এসেন্স	...	Essence Lemon.
আল্‌কোহল	...	Alcohal.
মিল্ক অব রোজ	...	Milk of Rose.

বঙ্গালা নাম		ইংরাজী নাম
দ্রব পটাস	...	Potass Solution.
জন্কুইলী	...	Jon Quille.
জলীয় ষ্টোরক্স	...	Lequid storax.
নাসিহাসু	...	Nesihasu,
উইণ্ডসর সাবান	...	Windsor Soap,
হনি সাবান	...	Honey Soap,
কার্ব্বলিক সাবান	...	Carbolic Soap,
পমেটম	...	Hard pomatum,
সুগন্ধী পমেটম	...	Perfumed Pomatum,
গোলাপী পমেটম	...	Rose Pomatum,
কষ্টিক সোডা	...	Caustic Soda,
রোজ জিরেনিয়ম	...	Rose Zerenium,
বেঞ্জোইন	...	Benzoin,
আল্কেনেট মূল	...	Alcanet Root,
দেশী পমেটম	...	Indian Pomatum,
পাম তৈল	...	Palm oil,
দেমাস্ক রোজ	...	Damask Rose,
নিরোলী তৈল	...	Oil of Nerroly,
ম্যাকাসার তৈল	...	Macassar oil,
বেন তৈল	...	Oil of Ben or Ben oil,
নট তৈল	...	Nut oil,
চিনদেশীয় বার্ণিস	...	Chinese Varnish,
গম স্যাণ্ডারক	...	Gnm Sandarach,
গম মাষ্টিক	...	Gum Mastick,
এসফ্যাল্টিম	...	Asfalitum,
গম এনিমি	...	Gum Animie,
এম্বর	...	Amber,
ক্রষ্টল বার্ণিস	...	Crystal Varnish,

বঙ্গালা নাম		ইংরাজী নাম
কেনেডা বালসম	...	Canada Balsam.
ফ্রাঙ্ক্ পালিস	...	French Polish.
উড ন্যাপথা	...	Wood Naptha.
গ্রিক গিল্টি	...	Grician gilding.
জাপান গিল্টি	...	Japanise gilding.
তৈল গিল্টি	...	Oil gilding.
রস কর্পূর	...	Corosive Sublimate.
নাইট্রিক এসিড	...	Naitric acid.
স্বর্ণ চূর্ণ	...	Dusting gold.
ওয়াস লেদার	...	Wash leather.
কাল্ সাইনেড হোয়াইট লেড	...	Calcined white lead.
এলোটা	...	Alota.
সল্ট অব টাটার	...	Salt of Tartar.
রোজ সিরপ	...	Rose Syrup.
বাষ্পোত্তাপ	...	Steam bath.
মিঠা তৈল	...	Sweet oil,
ইলেক্‌ট্রো ব্রোঞ্জিং	...	El"ctro Branzing,
ইলেক্‌ট্রো কপারিং	...	Electro coppering.
ইলেক্‌ট্রো গিলডিং	...	Electro gilding.
ইলেক্‌ট্রো সিলভারিং	...	Electro silvering,
অদাহ্য কাষ্ঠ	...	Rendering wood fi eproof,
পুটিং	...	Putting,
সিরিষ	...	Glue;
ম্যান্‌হিম গোল্ড	...	Manheim gold,
মোসেক গোল্ড	...	Mosaic gold,
পিত্তল ঝাল	...	Brass soldering,
রাং ঝাল	...	Tia soldeirng,
সীস বৃক্ষ	...	Arbor salaruni.

Cruelty is the parent to revence.

বাঙ্গালা নাম		ইংরাজী নাম
রৌপ্য বৃক্ষ	...	Arbor dianae.
রাং বৃক্ষ	...	Ardor foleis.
কাচ জুড়িবার উপায়	...	Way for cementing glass.
অদৃশ্য কালি	...	Sympathetie ink.
পারপল কালি	...	Purple Ink.

ওজন প্রকরণ।

২৪ গ্রেণে	এক পেনিওয়েট।	১০ গ্রেণে	এক স্ক্রুপল।
২০ পেনিওয়েটে	এক আউন্স।	৩ স্ক্রুপলে	এক ড্রাম।
৬০ গ্রেণে	এক ড্রাম।	২৮ পাউণ্ডে	এক কোয়ার্ট।
৮ ড্রামে	এক আউন্স।	৪ কোয়ার্টে	এক হন্দর।
১৬ আউন্সে	এক পাউণ্ড।	২০ হন্দরে	এক টন।
২০ গ্রেণে	এক রতি।	৪ কাঁচ্চায়	এক ছটাক।
১৮০ গ্রেণে	এক তোলা।	৪ ছটাকে	এক পোয়া।
১ আউন্সে	এক ছটাক।	৪ পোয়ায়	এক সের।
১ পাউণ্ড	অর্দ্ধ সের।*	৪০ সেরে	এক মোণ।

* পাউণ্ড বাজারের অর্দ্ধ সেরের দেড় কাঁচ্চা কম।

Certain good is better than uncertain hope.

দ্বিতীয় পরীক্ষা।

স্বপ্নবিজ্ঞান।

আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিতগণের সংস্কার যে স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র। এমন কি দু একজন মহাত্মাব্যক্তিও এই মতের অনুমোদন করেন। * তাঁহারা বলেন, নিদ্রার পূর্ব্বে যে বিষয়বিশেষের প্রগাঢ় চিন্তায় চিত্ত সমধিক নিমগ্ন থাকে, নিদ্রিতাবস্থায় সেই সমস্ত বিষয়ক স্বপ্নই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রোভন বলেন, নিদ্রার পূর্ব্বে চিত্তের যে সমস্ত বৃত্তি ও দৈহিক যন্ত্রাদি যে চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, অত্যধিক চিন্তা হেতু সেই সমস্ত যন্ত্র এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তখন আর চিন্তা করিবার আবশ্যক থাকে না, চিন্তার বিরতি প্রার্থনীয় ও আবশ্যকীয় হইলেও তন্নিবারণ সাধ্যায়ত্ব হয় না। চিত্ত কেবল সেই চিন্তার আন্দোলনে চিন্তামগ্ন হইয়া যায়। নিদ্রাতেও সেই চিন্তার বিরতি পরিদৃষ্ট হয় না। নিদ্রিতাবস্থাতেও সেই সেই যন্ত্রের কার্য্যকারিতা শক্তি সমান গতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে বলিয়া লোকে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করে। (১) এসকল কথা পাশ্চাত্যবৈজ্ঞানিকগণের আর আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিকৃতমস্তিষ্ক নব্যগণের। পরন্তু যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র মান্য করেন, যাঁহারা হিন্দুর অক্ষয় জ্যোতিষে বিশ্বাস রাখেন, চন্দ্রসূর্য্য যেমন প্রত্যক্ষ, জ্যোতিষও তদ্রূপ বলিয়া যাঁহাদিগের বিশ্বাস তাঁহারা কখনই স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না।

স্বীকার করি, কোন বিষয় অত্যধিক চিন্তা করিলে স্বপ্নে সেই বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু যে বিষয় কখনও ভাবা যায় নাই, যে বিষয়ের কল্পনাও তিলেকের জন্য মস্তিষ্কে দেখা যায় নাই, সেই সকল অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিষয়ক স্বপ্ন কি জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মীমাংসা কৈ, কোন

---

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে "স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র।

(১) Vide G. A, Groven's "Book of dreem" "ডাক্তার হিউম আরও অনেক প্রমাণ দ্বারা গ্রোভনের মত দৃঢ় করিয়াছেন। Vide Hume's "An euquiry concering the prinoplcs of dreems.

বৈজ্ঞানিক ত করেন নাই। অচিন্ত্যপূর্ব্বক বিষয় স্বপ্নে দেখা যায়, ইহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। তবে এই প্রবল তর্কের মীমাংসা কি জন্য হয় নাই, তাহা কি একবার বিবেচ্য নহে? একদেশদর্শিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোন বিষয়ে মতামত প্রকটন যে ভয়ানক হটকারিতা, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

স্বপ্নের যে কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, স্বপ্নের অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে। নতুবা স্বপ্নের ফলাফল আমরা ভোগ করি কি জন্য। স্বপ্নের সত্যতা অবশ্যই অনেকে উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। জীবনে কোন না কোন স্বপ্নের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেই স্বপ্নের অলীকতা স্বীকার করা যায় না। কি তর্ক যুক্তিতে কি মানসিক পরীক্ষায় অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্বপ্নের উদ্দেশ্য স্বীকার করিতে অবশ্যই হয়।

রাশীর তারতম্যে স্বপ্নের ফলাফল ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। অতএব কোন্ রাশীতে কি প্রকার স্বপ্ন দর্শনে কি প্রকার ফললাভ করা যায়, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ যখন যেরূপ স্বপ্ন দেখিবেন, তাঁহার রাশী অনুসারে স্বপ্নফল মিলাইয়া লইবেন। ইহাতে অবশ্যই ফলপ্রাপ্ত হইবেন।

১। ধনদর্শনে।

মেষের পীড়া, বৃষের অসার স্বপ্ন, মিথুনের বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্কটের অতিথি লাভ, সিংহের ধনলাভ, কন্যার প্রতারিত হওন, তুলার শত্রুনাশ, বৃশ্চিকের ধন ক্ষয়, ধনুর অসার স্বপ্ন, মকরের আতিথ্য স্বীকার, কুম্ভের জয়লাভ ও কার্য্যসিদ্ধি, মীনের আতিথ্য স্বীকার।

২। যুদ্ধ ও রক্তপাত দর্শনে।

মেষের হিংসা, কন্যার সুসংবাদ প্রাপ্তি, তুলার শত্রুবৃদ্ধি, বৃশ্চিকের কর্ম্মানুষ্ঠান (চাকর ইত্যাদি), ধনুর স্ত্রীলাভ, (স্ত্রীলাভ বলিলে কেবল বিবাহ দ্বারা স্ত্রীলাভ বুঝাইবে না। গণিকা ও দাসী প্রভৃতির সমাগমাদিও স্ত্রীলাভ বলিয়া পরিগণিত হইবে), মকরের সংবাদ লাভ, কুম্ভের শত্রুবৃদ্ধি মীনের জয়লাভ।

৩। পীড়া দর্শনে।

মেষের অসার স্বপ্ন, মিথুনের বিবাদ ভঞ্জন ও মীমাংসা, কর্কটের ক্ষতি, সিংহের পুরস্কার লাভ, কন্যার ধনলাভ, তুলার শত্রুলাভ, বৃশ্চিকের বিবাদ ধনুর পীড়া, মকরের জয়লাভ, কুম্ভের আনন্দ, মীনের পুরস্কার লাভ।

৪। রোদনে।

মেষের বিচ্ছেদ, বৃষের বন্ধন ভয়, বন্ধু কর্ত্তৃক ক্ষতি ও বন্ধুবিচ্ছেদ, মিথুনের আনন্দ, কর্কটের দুঃখ ও শোক, সিংহের সম্মানলাভ, কন্যার সুখ, তুলার আনন্দ, বৃশ্চিকের লোক সমাগম ও প্রতিজ্ঞা, ধনুর শত্রু ও রোগ ক্ষয়, মকরের বন্ধুনাশ, কুম্ভের ভ্রমণ, মীনের সংবাদ লাভ।

৫। আনন্দে।

মেষের কষ্ট ও দুঃখ, বৃষের বন্ধু সমাগম, মিথুনের অর্থলাভ, কর্কটের বন্ধু সমাগম, সিংহের বিন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার সুখ ও আনন্দ, তুলার ধন ও মান প্রাপ্তি, বৃশ্চিকের ভ্রাতৃ নাশ (জ্ঞাতি নাশ) ধনুর সুখ ও আনন্দ মকরের বন্ধু বিচ্ছেদ, কুম্ভের ভ্রমণ, মীনের অসার স্বপ্ন।

৬। বস্ত্র দর্শনে।

মেষের অসার স্বপ্ন, বৃষের সুখ ও আনন্দ, মিথুনের অসার স্বপ্ন, কর্কটের দৈহিক সুস্থতা, সিংহের শত্রু লাভ ও স্বয়ং অপরের শত্রুতা সাধন চেষ্টা, কন্যার অপমান, তুলার বিবাদ ও দুঃখ, বৃশ্চিকের সম্মান লাভ, ধনুর পীড়া, মকরের অতিথি লাভ (লোক সমাগম) কুম্ভের মানসিক পীড়া, মীনের মিথ্যা স্বপ্ন।

৭। জল দর্শনে।

মেষের কষ্ট, বৃষের ভয়, মিথুনের ভোগ (রোগ শোকাদি), কর্কটের অসার চিন্তা; সিংহের বল প্রকাশ, কন্যার ধনলাভ, তুলার মিথ্যা স্বপ্ন, বৃশ্চিকের আনন্দ (যে কোন উপায়ে), ধনুর অপমৃত্যু (অপমৃত্যু ও মানসিক ক্লিষ্টতা), মকরের অনুরোগ (রাজ দ্বারে বা অন্য), কুম্ভের মিথ্যা স্বপ্ন, মীনের পীড়া।

Despise none, despair of none,

৮। জলমধ্যে জন্তু দর্শনে।

মেষের ভয়, বৃষের বন্ধন, (প্রেম বন্ধন, সমাজ বন্ধন ও রাজদ্বারে বন্ধন) মিথুনের ধন লাভ, কর্কটের মানসিক পীড়া, সিংহের ভয়, কন্যার ধনহানি, ক্ষতি, তুলার আত্মীয় নাশ, বৃশ্চিকের জীবন শঙ্কা, ধনুর সংবাদ লাভ, মকরের দুঃখ, কুম্ভের পীড়া, মীনের মিথ্যা স্বপ্ন।

৯। সৌভাগ্য দর্শনে।

মেষের দুঃখ, বৃষের রোগভোগ, মিথুনের সম্মান লাভ, কর্কটের পীড়া, সিংহের অন্নকষ্ট, কন্যার ধনজনিত দুঃখ ও অন্নকষ্ট, তুলার শত্রুক্ষয়, বৃশ্চি-কের আরোগ্য ও মুক্তি, ধনুর নববন্ধু লাভ, মকরের চিত্তচাঞ্চল্য ও ভয়, কুম্ভের স্বফল স্বপ্ন অর্থাৎ সৌভাগ্যলাভ, মীনের অসার স্বপ্ন।

১০। ইষ্টকালয় দর্শনে।

মেষের ভয়, বৃষের অত্যাচার সহ্যকরণ, মিথুনের সন্তান লাভ, কর্কটের ধন লাভ, সিংহের ভ্রমণ, কন্যার সংবাদ লাভ, তুলার আরব্ধকার্য্য সম্পাদন, বৃশ্চিকের জয় লাভ, ধনুর বন্ধুলাভ, মকরের মানসিক বিকৃতি, কুম্ভের সফলস্বপ্ন অর্থাৎ ইষ্টকালয় লাভ, মীনের অসার স্বপ্ন।

১১। সঙ্গীত শ্রবণে।

মেষের লাভ, বৃষের সৌভাগ্য, মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের অভিযোগ, সিংহের বন্ধু বিচ্ছেদ, কন্যার জয়লাভ, তুলার অপমান ভোগ, বৃশ্চিকের পীড়া ভোগ, ধনুর ক্রয়কর্ম্মের ফলভোগ, কর্কটের ধনলাভ, কুম্ভের অসার স্বপ্ন, মীনের সন্তান বা সম্মান লাভ।

১২। বন্ধু ও আত্মীয় সমাগম দর্শনে।

মেষের পুরস্কার লাভ, বৃষ ও মিথুনের অসার স্বপ্ন, কর্কটের ধনবৃদ্ধি, সিংহের অপমান, কন্যার অর্থলাভ, তূলার ধীরতা, বৃশ্চিকের ধনলাভ ধনুর সম্মান, মকরের সংবাদলাভ, কুম্ভের ভ্রমণ ও কষ্ট, মীনের বিলাসিতা ও ক্ষতি।

১৩। স্থান পরিবর্ত্তনে।

মেষের শঙ্কা, বৃষের সুস্থতা, মিথুনের সংবাদ লাভ, কর্কটের প্রভুর

মৃত্যু, সিংহের অতিথিলাভ, কন্যার শত্রুবৃদ্ধি, তুলার ক্ষত, বৃশ্চকের সম্মান লাভ, ধনুর মিথ্যাস্বপ্ন, মকরের ক্রোধাধিক্য, কুম্ভের বন্ধন ভয়, মীনের অনিশ্চিত সংবাদ লাভ।

১৪। অগ্নিদর্শনে।

মেষের দুঃখ, বৃষের অতিথি লাভ, মিথুনের ধনবৃদ্ধি, কর্কটের পীড়া, সিংহের ক্ষতি, কন্যার দুঃখ, তুলার সংবাদ লাভ, বৃশ্চিকের পীড়া, ধনুর সংবাদ লাভ, মকরের সংবাদ লাভ, কুম্ভের চিত্তচাঞ্চল্য, মীনের মানসিক পীড়া ও ক্ষতি।

১৫। হত্যাদর্শনে।

মেষের বিপদ, বৃষের বন্ধুনাশ, মিথুনের দুরভিসন্ধি সিদ্ধি, কর্কটের ধনলাভ, সিংহের পীড়া, কন্যার লাভ, তুলার ধনলাভ, বৃশ্চিকের পাপ কার্য্যানুষ্ঠান, ধনুর মৃত্যু, মকরের পুরস্কার প্রাপ্তি, কুম্ভের বিফল স্বপ্ন, মীনের বাসনা পূর্ণ।

১৬। মৃত্যুদর্শনে।

মেষের ধনলাভ, বৃষের ক্ষতি, মিথুনের সংবাদ প্রাপ্তি, কর্কটের ক্রোধ, সিংহের ধনলাভ, কন্যার অতিথি লাভ, তুলার আনন্দ, বৃশ্চিকের মিথ্যাস্বপ্ন, ধনুর সুসংবাদ লাভ, মকরের জয়, কুম্ভের লোকসমাগম, মীনের মিথ্যাস্বপ্ন।

সাধারণ নিয়ম।

সচরাচর কয়েকটী স্বপ্নফল সর্ব্বপ্রকার রাশীরই সমতুল্য। যথা,—সর্প, কুম্ভ ও ব্যাঘ্র দর্শনে সন্তান লাভ। নকুল, শব ও মৃত আত্মীয় দর্শনে পীড়া বা মনস্তাপ। জলজন্তু দর্শনে মনস্তাপ। কাহাকে পাঠ করিতে দেখিলে কি কোন পুস্তকাদি দর্শনে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরীক্ষা।

তিথি গণনা।

এতদ্দ্বারা কোন্ সনের কোন্ তারিখ কি তিথি হইবে বা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যাইবে।

প্রথম সূত্র। শকাব্দার সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা হরণ করিলে, যে রাশী

অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ১১ দ্বারা পূরণ করিয়া, যে রাশী হইবে, তাহাতে মাসাঙ্ক, দিন সংখ্যা ও অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া, ৩০ দ্বারা হরণ করিলে, যে অঙ্ক থাকিবে, তাহাই তিথি জানিবে।

মাসাঙ্ক।—বৈশাখ ০, জ্যৈষ্ঠ ১, আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৫, ভাদ্র আশ্বিন ৯, কার্ত্তিক ১০, অগ্রহায়ণ ১০, পৌষ ৯, মাঘ ৯, ফাল্গুন ১০, চৈত্র ১০।

তিথি সংখ্যা। শুক্লপক্ষ। প্রতিপদ ১, দ্বিতীয়া ২, তৃতীয়া ৩, চতুর্থী ৪, পঞ্চমী ৫, ষষ্ঠি ৬, সপ্তমী ৭, অষ্টমী ৮, নবমী ৯, দশমী ১০, একাদশী ১১, দ্বাদশী ১২, ত্রয়োদশী ১৩, চতুর্দ্দশী ১৪, পূর্ণিমা ১৫। কৃষ্ণপক্ষ। প্রতিপদ ১৬, দ্বিতীয়া ১৭, তৃতীয়া ১৮, চতুর্থী ১৯, পঞ্চমী ২০, ষষ্ঠি ২১, সপ্তমী ২২, অষ্টমী ২৩, নবমী ২৪, দশমী ২৫, একাদশী ২৬, দ্বাদশী ২৭, ত্রয়োদশী ২৮, চতুর্দ্দশী ২৯, অমাবস্যা ৩০।

প্রকারান্তর।

দ্বিতীয় সূত্র।—যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, তাহার নিয়ম,—দিনসংখ্যা ও মাসাঙ্ক যোগ দিয়া, তৎপরে আবার যে বৎসরের তিথি গণনা করিতে হইবে, সেই বৎসরের ১লা বৈশাখের তিথি যোগ দিয়া, ৩১ দ্বারা ভাগ দিলে, সেই লব্ধ রাশিই তিথির সংখ্যা জানিবে।

চতুর্থ পরীক্ষা।

নক্ষত্র গণনা।

এতদ্দ্বারা কোন্ তারিখের কি নক্ষত্র, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র যথা,—১ অশ্বিনী। ২ ভরণী। ৩। কৃত্তিকা। ৪ রোহিণী। ৫ মৃগশিরা। ৬ আর্দ্রা। ৭। পুনর্ব্বসু। ৮ পুষ্যা। ৯ অশ্লেষা। ১০ মঘা। ১১ পূর্ব্ব-ফল্গুনী। ১২ উত্তরফল্গুনী। ১৩ হস্তা। ১৪ চিত্রা। ১৫ স্বাতী। ১৬ বিশাখা। ১৭ অনুরাধা। ১৮ জ্যেষ্ঠা। ১৯ মূলা। ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। ২২ শ্রবণা। ২৩ ধনিষ্ঠা। ২৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ। ২৭। রেবতী। জিজ্ঞাসিত তারিখের তিথি স্থির করিয়া, সেই রাশির সহিত মাসাঙ্ক যোগ করিলে, যাহা হইবে, তাহাই নক্ষত্র বুঝিতে হইবেক।

পঞ্চম পরীক্ষা।

বার গণনা।

যে সনের বার জানিতে হইবে, সেই সন যদি ১২৯০ সালের পূর্ব্বে হয়, তবে তাহা হইতে ১২৯০ বাদ দিয়া যে রাশি পাইবে, সেই রাশির খণ্ডা যাহা নিম্ন তালিকায় লিখিত আছে, তাহা লইবে এবং সেই রাশি ৬।১৬।৩ হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রথম অঙ্ক বার, দ্বিতীয় পল এবং অনুপল বুঝিবে। বার গণনা রবি ১, সোম ২, মঙ্গল ৩, বুধ ৪, বৃহস্পতি ৫, শুক্র ৬, শনি ৭ এইরূপ।

যদি ১২৯০ সালের পর কোন দিনের বার জানিতে হয়, তাহা হইলে সেই সনের রাশি হইতে ১২৯০ বাদ দিয়া, তাহার খণ্ডা ৬।১৬।৪ অঙ্কের সহিত যোগ করিলে, যদি ৭ এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ৭ বাদ দিবে এবং অবশিষ্ট অঙ্কই বার জানিবে। আর যুক্তাক্ষর ও দণ্ডাদি উক্ত সংখ্যার অধিক হইলে, ৭ যোগ করিলেই সেই সনের ১লা বৈশাখের বার জানিবে।

ইহা হইতে হিসাব করিয়া বলাও সহজ। কেবল একটু চিত্ত স্থির করিয়া, হিসাব করিতে পারিলেই যথেষ্ট। জ্যোতিষের গণনা বড় কঠিন। কেননা, একটু ভ্রম হইলে, সমস্তই অনর্থক হয় এবং গণকের মনে জ্যোতিষের দোষই প্রমাণিত হয়।

তালিকা।

তারিখ	বার	দণ্ড	পল	বিপল
১	১	১৫	৩১	৩০
২	২	৩১	৩	০
৩	৩	৪৬	৩৪	৩০
৪	৫	২	৬	০
৫	৬	১৭	৩৭	৩০
৬	৭	৩৩	৯	০
৭	৯	৪৮	৪০	৩০
৮	৩	৪	১২	০

তালিকা।

৯	৪	১৯	৪৩	৩০
১০	৫	৩৫	১৫	০
১১	৬	৫০	৪৬	৩০
১২	১	৬	১৮	০
১৩	২	২১	৪৯	৩০
১৪	৩	৩৭	২১	৮
১৫	৪	৫২	৬২	৩০
১৬	৬	৮	২১	০
১৭	৭	২৩	৫০	৩০
১৮	১	৩৯	২৭	০
১৯	২	৫৩	৫৮	৩০
২০	৩	১০	৩০	০
২১	৫	২৬	১	৩০
২২	৬	৪১	৩৩	০
২৩	৭	৫৭	৪	৩০
২৪	২	১১	৩৬	০
২৫	৩	২৮	৭	০
২৬	৩	৪৩	৩৯	০
২৭	৫	৪৯	৪৯	০
২৮	৭	১৩	৪২	০
২৯	১	৩০	১৩	৩০
৩০	২	৪৫	৪৫	০
৩১	৪	১	১৬	৩০
৩২	৫	১৬	৬৮	৪০
৩৩	৬	৩২	০	৩০
৩৪	৭	৩৭	৫১	০
৩৫	২	৩	২২	৩০
৩৬	৩	১৮	[illegible]	০

Do not judge betw[illegible]d enemies.

সংসার-তরু

দ্বিতীয় খণ্ড।

শান্তি-কুঞ্জ।
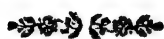
৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

শান্তি-কুঞ্জ।

পাগলের ফিলজফি।

প্রথম স্তর।

আমি একা।

আমি একা!—নিতান্তই আমি একা! এই অনন্ত বিক্ষোভিত উত্তাল-তরঙ্গসমাকুল অনন্তসমুদ্র মধ্যে,—এই সুদূরসমাগত সদাপ্রবাহিত অনন্ত বায়ু গর্ভে আমি একা! উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নিম্নে অনন্ত নীল নীর-নিধি, চারিদিকে দিগন্তরব্যাপী নীলিমারাশী, তন্মধ্যে এই অনীলতাড়িত তরঙ্গভঙ্গে আমি একা—কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কোথায়ই বা যাইব, তাহা জানি না, কিন্তু যাইতেছি। অনন্তপথে অভ্রান্তগতিতে কোন অনির্দ্দিষ্ট—অজ্ঞাতলক্ষ্যকে লক্ষ করিয়া আমি অগ্রসর হইতেছি, কোথায়—কে জানে? আমি কেন, আমার অস্তিত্বে কি আবশ্যক, আমি কেন এই অকুলসাগরে ভাসমান, তাহা ত জানি না! এ তরঙ্গহীন তরঙ্গিণী নয় যে কুল পাইব, এ শ্বাসযন্ত্রের ক্ষীণ বায়ুহিল্লোল নয় যে রোধ করিব, এ মনুষ্যসাধ্য শান্ত গতিরোধ করিব,—ভাবিব,—উত্তর দিব। ইহার মীমাংসা নাই, যুক্তি নাই, ধারণা নাই, কিছুই নাই। কেবল আপন আপন ধন লইয়া ভাসিয়া চল।—কার্য্য দেখ,—কার্য্য কর—কারণ খুজিয়া দেখিও না—খুজিয়া পাইবেও না, অধিকন্তু ধাঁধায় পড়িয়া—সারা জীবনই দিশাহারা হইয়া অন্ধবৎ কাটাইতে হইবে। তাই বলি, কারণ খুজিও না, কার্য্য কর,—আপনা লইয়া ভাসিয়া চল।

আমি কেন এই অনন্তসাগরে ভাসমান? আমার লক্ষ্য কি?—তাই যদি আমার বক্তব্য হয়, যদি আমার লক্ষ্যকে লক্ষ্য করিতে আর কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে আমি বলি, আমার লক্ষ্য শূন্য! আমি শূন্যকে লইয়া শূন্য হইয়া শূন্যপ্রাণে ভাসিয়া চলিয়াছি! সকলে জানে—শূন্য শূন্যময়! আমি দেখি শূন্য পূর্ণময়!—শূন্যতাই পূর্ণতার আস্পদ। শূন্য ভিন্ন পূর্ণ হয় না, শূন্য কখন শূন্য থাকে না, যে গতিকে হউক তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। তাই শূন্য আমি পূর্ণ হইতে চলিয়াছি! আইস শূন্যগণ!—পূর্ণ হইতে আমরা আজ কালসাগরে ভাসিয়া যাই।

আমি একা চলিয়াছি কেন? আমার অনুসরণ করিবার কেহ কি নাই? আমায় প্রতিনিবৃত্ত করিবার কি কেহ নাই?—আমায় আকৃষ্ট করে এমন কোন আকর্ষণ কি নাই? আছে সব, কিন্তু কার্য্য যে সকলের সমান নয়! ছিল সব, কিন্তু এখন দেখি নাই, আছে সব কিন্তু খুজিয়া পাই না, তাই আজ একা চলিয়াছি। মাতার আচ্ছেদ্য অপত্যস্নেহপাশ, পত্নির অনন্ত অপরিমেয় প্রেম, পুত্রকন্যাগণের অসীম ভক্তি, প্রতিবেশীগণের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পিতার অসীম বাৎসল্য, এ সবই ছিল; সংসারের মোহবন্ধন স্নেহমমতার ভীষণ আকর্ষণ সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে অকৃষ্ট করিতেছিল, কিন্তু কেহ সে বন্ধনে ত আমাকে বন্দী করিতে পারিল না? সে স্নেহপাশ, সে ভক্তিবন্ধন, বাৎসল্যাদি আকর্ষণ কৈ আমাকেত প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না? তাই বলিতেছিলাম, আমি এ সকল বন্ধন কোথাও ছেদন করিয়া—কোথাও বা বাধ্য হইয়া—আমি আজ কালসাগরে ভাসিয়াছি! তাই আমি এখন একা! সে সকল তুচ্ছবন্ধন ছিঁড়িয়া আমাকে কে এই অকুল পাথারে ভাসাইয়াছে! তাই আজ আমি একা ভাসিয়াছি! এখন আমার ত কেহ নাই,—আমি একাকী! মস্তকে মাতা, স্কন্ধে পিতা, হৃদয়ে পুত্র কন্যা হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে—স্ত্রী, কক্ষে পরিবার প্রতিবেশী এবং চরণে দাসদাসী রাখিয়াছিলাম, সদ্ব্যবহারে পুরিতুষ্ট করিতাম, কিন্তু কৈ এখন তাহারা কোথায়? ম্লানমুখ দেখিলে মাতা সজলনয়নে মুখচুম্বন করিতেন, বিষণ্ণ ভাব দেখিলে পিতা সোহাগে আদরে মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া ক্রোড়ে করিতেন, পরিশ্রান্ত দেখিলে সর্ব্বতাপনাশিনী প্রণয়িনীর সহাস্য বদন দেখিয়া সংসারের সকল জ্বালা জুড়াইতাম, সংসারের কঠিন তাড়নে,

কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

বিতাড়িত—মর্ম্মাহত হইলে পুত্রকন্যার অমিয় বচনে সে মনস্তাপে শান্তি পাইতাম, ইচ্ছা আজ্ঞানুবর্ত্তিভৃত্যগণ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ধন্য জ্ঞান করিত, অকুলভাবনায় আকুল হইলে প্রতিবেশীর সাহায্যে—অকপট বান্ধবগণের সহায়তায় সেই দুস্তর চিন্তাসাগরে অচীরে কুল পাইতাম। কিন্তু কৈ। এখন তাঁহারা কোথায়?—আমাকে একাকী রাখিয়া তাঁহারা কোথায় আছেন? আমি একাকী!—কৈ, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রীপরিবার, আমার দাসদাসী সব কোথায়? আমি যে একাকী! নয়নমণি মাতার আমি, কৈ তিনি ত আমায় দেখিলেন না? আমি বড় বিষণ্ণ, পিতা কৈ আমায় ক্রোড়ে করিলেন না? আমি বড় শ্রান্ত, বড় মর্ম্মাহত প্রিয়ার সেই সদাসহাস্য প্রসন্ন বদন কৈ? আমি সন্তপ্ত,—তাপিত, লাঞ্ছিত, কন্যাপুত্র কৈ? আর ত তাহারা অমিয়বচনে পিতার সন্তপ্ত প্রাণে শান্তি দিতেছে না? আমি বড় চিন্তাকুল, কোথায় বান্ধবগণ, কৈ অমাত্যবর্গ, আমার এ চিন্তায় শান্তি দিবে কে? আমি যা চাই, তাই বা সম্পন্ন করে কে? এ সকলের কেহই নাই, তাই আমি একাকী! কেহ ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে, কেহ ধাঁধায় ঘুরাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করিলেও পারিতেছে না, তাই আমি একাকী!—একাকী—শূন্য প্রাণে ভাসিয়া যাইতেছি।

আমার নিজের কোন লক্ষ্য নাই, কিন্তু আমার গতির কোন লক্ষ্য আছে বুঝিলাম। গতি আমার বাধ্য নহে, এ গতির সংযমন আমার সাধ্যায়ত্ব নহে, সুতরাং গতির সহিত আমার ঐক্যতা নাই, কিন্তু গতিতে আমি বাধ্য হইতেছি, নতুবা অনিচ্ছায় এই অকূলে ভাসিব কেন? স্বজন বান্ধব পরিবৃত—কত শত শত জনের আশা ভরসাস্থল আমি, আজ একাকী কেন? তাই বলি, আমি অনিচ্ছায় ভাসিয়াছি! এ মোহ—এ অনিচ্ছা যায় না কেন? ভাসিতে হইবেই, তবুও এ অনিচ্ছা কেন, তাও বড় ভাবিয়া পাই না, কিন্তু সত্যই বলিতেছি, আমি স্বেচ্ছায় এই অকুলে আত্মসমর্পণ করি নাই। বাধ্য হইয়া—কোন মহাশক্তি আমার শান্ত ক্ষুদ্র শক্তিটুকুকে পর্য্যুদস্থ করিয়া আমাকে বল পূর্ব্বক কালস্রোতে ভাসাইয়াছে।

আমার গতির সীমা কোথায়, তাই বা জানিব কিরূপে? আর কাহাকেও দেখিতেছি না, আর কাহারও সংস্রব অনুভব করিতেছি না, আর

কোন জীবজন্তু সত্বার সম্ভাব উদ্ভাবনা করিতেও সমর্থ হইতেছি না, তবে কাহাকে এ তত্ত্বের—এ গভীরতম তত্ত্বের সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করিবে? আমার এ প্রাণের পিপাসা মিটাইবার আর কাহাকেও ত দেখিতেছি না।—আমি যে আজ একা।

আমি চলিয়াছি।—অবিরাম গতিতে—অনন্তপথে একা আমি চলিয়াছি। কোথাও কিছু নাই, অন্ধকার দৃষ্টির গতি প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। যত অগ্রসর হইতেছি, ততই অন্ধকারের গভীরতম আবরণে আবৃত হইয়া নিজেও যেন অন্ধকার হইয়া আঁধারে আঁধারে ভাসিয়া চলিয়াছি। কোনদিকে কোন কিছুই দেখিতে পাই না।—চক্ষু অন্ধ! সম্মুখে পশ্চাতে অন্ধকার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিয়া রুদ্ধপ্রায় শ্বাসে অতি কষ্টে চলিয়াছি। এ আঁধার আর ঘুচিবে কি না,—ভাবিয়াও পাইতেছি না। পুত্র কন্যাগণের স্নেহমাখা বদন,—প্রিয়তমার প্রেমপূরিত বচন, পিতামাতার বাৎসল্য ভাব হৃদয় হইতে একে একে যেন কোথায় চলিয়া যাইতেছে। কষ্টে—অতি কষ্টে মর্ম্মেমর্ম্মে যেন যুদ্ধ করিতেছি, তবুও সংসারপাশ আপনা হহতেই খসিয়া পড়িতেছে। সংসারের যাহা বন্ধন,—সকলি যেন হারাইতেছি, সকল সূত্রই যেন ছিঁড়িতেছি।—আমার শক্তি নাই, সামর্থ নাই,—সজল নয়নে কেবল যন্ত্রণাভোগ করিতেছি। বুঝিতেছি, এই সংসারের শেষ সীমা।—পুত্রকন্যার মুখ আর দেখিতে পাইব না,—প্রিয়তমার পবিত্র প্রেম আর এই তৃষিত প্রাণে শান্তিদান করিবে না, মাতাপিতা আর সেই বাৎসল্যভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন না, এ কষ্ট—এ যন্ত্রণা কি সহ্য হয়? আমি এই বিচ্ছেদ চাহি নাই, তবুও আমি এই অনন্ত বিচ্ছেদের কেন্দ্রিভূত হইয়া সজলনয়নে পরিবার বর্গের নিকট করযোড়ে বলিতেছি, "পরিবারবর্গ! বিদায় দাও,—তবে আসি!—আমি আজ একাকী চলিলাম। তোমরা আমায় বিদায় দাও,—আমি চলিলাম।—ভাইবন্ধু,—স্ত্রী পরিবার তোমরা আমার বিদায় দাও—তবে আসি।"

চলিয়াছি। সংসার আমার বহু দূরে। আমার পশ্চাতে সংসার আঁধারে আঁধারে চলিয়াছি। আলোক এখানে দেখি নাই!—অনেক আলোক দেখিয়াছি, অনেক আলোক স্বয়ং স্বহস্তে নির্ব্বাণ করিয়াছি, তখন বুঝি নাই, এক আলোকের অভাবে প্রাণে এতটা কষ্ট উপস্থিত হয়।

এখন জ্যোৎস্নার একটু স্তিমিত আলোক পাইলে প্রাণ যেন নবীন প্রসাদে পূর্ণ হয়। আলোক আর কি পাইব? এই অনন্ত আধারের পর পূর্ণচন্দ্র পূর্ণকলা প্রদর্শনে এই পরিশ্রান্ত জনের পরিতাপ কি দূর করিবেন।

ঐ যে আলোক! সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া, নিবীড় ঘনতমসা উদ্ভিন্ন করিয়া যেন কোথা হইতে স্তিমিত আলোক সহসা উদ্ভাসিত হইল। এত কষ্টেও আনন্দ অনুভব করিলাম। ইচ্ছা হইল ঐ আলোকের নিকটে গিয়া—ঐ আলোকের জ্যোতিঃ উপভোগ করিয়া একবার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করি। হতভাগ্য আমি সে সুখভোগ পোড়া অদৃষ্টে ঘটিল না। আলোকের সন্নিকটে আমার গতি প্রতিরুদ্ধ হইল। সকল চেষ্টা--আমার ঐকান্তিক বাসনা বিফল হইল।

দেখিলাম, সেটি একটী বিস্তৃত শিল্পশালা!—আলোক সেই সৌধশীরে কিছুই বুঝিলাম না। এই নির্বাত জনশূন্য—কোথা এ? এখানে এ বিস্তৃত শিল্পশালা কি জন্য?—কার্য্য কি? অনেক কষ্টে কার্য্য দেখিলাম। এ শিল্প শালায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। রাশী রাশী ক্ষুদ্রবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এই মহান শিল্পশালা হইতে গঠিত ও কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে।—এও কি বিষম ব্যাপার! এত ব্রহ্মাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলাম না। তত্ত্ব লইতে ব্যগ্র হইলাম!—আমার গতিও সেই দিকে।—আবার গমন—সেই একা।

ক্রমে সেই শিল্পশালায় গমন করিলাম। দেখিলাম, কারিগর নাই, আপনা হইতে—একই উপাদানে—একই শক্তিতে—ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য আবির্ভাব! একি বিষম ধাঁধা। আবার ইচ্ছা হইল, ফল দেখিব যে ফলে এই ফলের সৃষ্টি, যে শক্তির সমন্বয়ে ও অংশে, এই শক্তির উৎপত্তি, সেই শক্তির শক্তি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। সহসা, শিল্পশালায় প্রবেশ করিলাম। কি দেখিলাম? যাহা দেখিলাম, তাহা ন ভূত—ন ভবিষ্যতি! আশ্চর্য্য।—পাঁচটী কেন্দ্রে সংযুক্ত পঞ্চধা বিভক্ত পরস্পর সম্বদ্ধ স্তম্ভ।—তাহার উপর এক অলৌকিক রূপে এক শক্তির অবিরাম গতি।—জড় সেই শক্তির সাহায্য কার্য্য করিতেছে, কল চলিয়াছে। অবিলম্বে আমিও কলের নিকটে!—আপনা হইতে সেই কলে পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন। আবার সেই পাঁচটী ভূতের সম্মিলনে—শক্তির সঞ্চালনে দিব্য নবরূপ ধারণ করিলাম।—বুঝিলাম এ রিফাইনের কল। আমার গায়ের

ময়লা কাটিয়া গেল,—দিব্য নূতনটী হইয়া নূতন পথে নূতন রাজ্যে চলিলাম,—আমি এখন একটি ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু একা।

এবার লেখা পড়া।—এখানে লেখা পড়িয়া লেখা পড়াইয়া যাইতে হয়। দেখিলাম সেই স্থানে অতি চমৎকার—সাদা অক্ষরে লেখা আছে,—"আপন আপন কর্ম্মলীপি পাঠ কর,—সম্মুখে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড,—নিজের কার্য্যের নিকাশ দিয়া—ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হও।" আপন কার্য্যলীপি কি ছিল জানি না কিন্তু পাঠশেষ হইতে না হইতে হৃদয় যেন যাতনায় অভিভূত হইল। ভয়ে আতঙ্কে চক্ষু বুজিলাম চাহিয়া দেখি—আশ্চর্য্য আমি কোথায়? কোথায় বা সে সৌধ!—কোথাই বা শিল্পশালা!—আর কোথাই বা সে আলোক রেখা!—ভীষণ হৃদয় যন্ত্রণা—প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে,—যন্ত্রণায় দেহ অবসন্ন, হৃদয় অবসন্ন,—আমি অবসন্ন। হৃদয় ভারে কাতর হইয়া নিরাশ ভাবে চাহিয়া কাতরে ডাকিলাম, বড় ভয় হইল, বড় নির্ভরতায় কাঁদিয়া কাদিয়া সকাতরে ডাকিলাম, "কোথা মা! কোথা মা! কোথায় জগদ্ধাত্রি ধরিত্রী! শোকতাপনাশিনী অম্বিকে,—কোথায় বরাভয়বারিণী চামুণ্ডে! রক্ষা কর মা,—রক্ষা কর। কোথায় ভক্তহৃদয়বাসিনী ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী কালিকে! কোথা ভক্তজনহৃদয়-তমোনাশিনি!—জয় মা জয়দে—বরদে—শর্ম্মদে।

জয় কালীশ মনমোহিনী।
জয় প্রসন্নবদনি সনাতনী।
জয় চণ্ডমুণ্ডনাশিনী দনুজদলদলনি।
জয় অটহাসিনী শিবে সর্ব্বানি।
জয় পালনকারিণী,—শুভদে।
জয় ধ্যানপরাণী ধর্ম্মরূপিনী বরদে।

জয় অম্বিকে চণ্ডিকে কালিকে! ভয়ার্ত্তজনের ভয় দূর কর। কত ডাকিলাম, আকুল হৃদয়ে মা মা বলিয়া কতই ডাকিলাম, কোথা মা?—মা আসিলেন না। কিন্তু ভয় ঘুচিল,—প্রাণের যন্ত্রণা—হৃদয়ের ভার কমিয়া গেল।—প্রাণে শান্তি পাইলাম। সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ড। অনন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড,—প্রবেশ করিলাম। সেই শূন্যগর্ভ ব্রহ্মাণ্ড আমার অবস্থানে পূর্ণ হইয়া আবার কোথায় চলিল। আমি সেই গর্ভে।—দৈববাণী হইল, কর্ণে অতি

স্পষ্ট শুনিলাম,—অলক্ষ্যে আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল, "যাও আত্মা, আবার যথাস্থানে গমন কর। মনে রাখিও অদৃষ্টলীপি,—আবার আসিতে হইবে। আবার আসিবে, কিন্তু স্মরণ রাখিও,—আজ তোমার নবজীবন।" ধাঁধাঁ লাগিল।—ভাবিতে ভাবিতে—পরিবর্ত্তনের আঘাতে গড়াইতে গড়াইতে চলিলাম। ভাবি কিন্তু কথা কহিতে পারি না, আছি কিন্তু অস্তিত্ব দেখাইতে পারি না!—আমি এখন ভবিষ্যশৈশব!—রক্তমাংসপিণ্ড!—বিন্তু একা।

দ্বিতীয় স্তর।

—০:০—

কি যন্ত্রণা।

আমি গঠিত।—নিত্য নূতন,—নূতন প্রণালীতে আমি গঠিত হইতে চলিলাম। আজ যা দেখি, কাল আর তাহা দেখিতে পাই না। এ কি বৈচিত্র!—একি প্রহেলিকা!—একি ভীষণ ধাঁধাঁ।

আজ যেটীর দিব্য পূর্ণ প্রশান্ত ভাব দেখিলাম, কাল আবার দেখি সেটী অসম্পূর্ণ,—শুষ্ক,—মৃতবৎ! আজ যেখানে কুসুমিত কোকিল কুজিত মনোহর পুষ্পবাটীকা, কাল দেখি সেখানে মরুভূমির ভীষণ মরীচিকা! এত পরিবর্ত্তন—এত আঘাত আর সহ্য হয়?—এ জঠর যন্ত্রণা আর কত সহ্য করিব? আজীবন অনন্তকাল কেবল যন্ত্রণাই পাইলাম,—কেবল মনস্তাপেই দগ্ধ হইলাম,—কেবল অশ্রুজলেই সিক্ত হইলাম। অনন্তকাল ধরিয়া কেবল হৃদয়ে বিষাদের ভারই বহিলাম, তবে এ বিষাদে আর হর্ষ হইল কবে?—এ যন্ত্রণার অবসান হইবে কিসে? এ প্রাণান্ত শান্তির বিশ্রাম লভিব কবে?—আর যে পারি না, যন্ত্রণা ক্রমেই অপরিসীম,—আর কত সহ্য হয়।

জঠর যন্ত্রণা ফুরাইল!—জঠরের ঘোরতর যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিলাম, কৃমিপুরিষে আবৃতাঙ্গ—শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত নিজের কর্ত্তৃত্ব ছিল না

আহার নিদ্রায় স্বাধীনতা ছিল না, মলমূত্র জ্ঞান ছিল না। এত কষ্টে—এত যন্ত্রণায় এতদিন কাতর ছিলাম, এতদিনে বুঝি সেই যন্ত্রণা ফুরাইল! ব্রহ্মাণ্ড-ময়ীর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড হইতে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আমি—আর এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে নীত হইলাম! প্রাণ জুড়াইল! এত দিনে পোড়া মুখে হাসি দেখা দিল! আবার সম্বন্ধ, আবার আত্মীয় স্বজন, আবার জ্ঞাতি পরিজন,—আবার সব! তাই একটু হাসিলাম। যাহা হারাইয়াছিল, যাহার অভাবে আবার প্রত্যাগমন, যাহাদের বিরহে কতই রোদন—কতই হৃদয়বেদন প্রকাশ করিয়াছিলাম, যাহাদের আনন্দে আনন্দিত ও দুঃখে দুঃখিত হইতাম, তাহারাই আমার সম্মুখে! হরি। হরি। তবে একি ধাঁধাঁ! তখন কত কষ্ট পাইয়াছি,—জ্ঞাতির হিংসানলে কতই দগ্ধ হইয়াছি, প্রিয়তমার কঠিন বাক্যবাণে কতই মর্ম্মাহত হইয়াছি, পিতার কটুভর্ৎসনায় কতই রোদন করিয়াছি, পুত্রের অপব্যবহারে কতই মনোবেদনা পাইয়াছি, সংসারে ধোবার বাটী বহিতে গাধা খাটুনী খাটিয়া কতই মর্ম্মযাতনা পাইয়াছি, সংসারের প্রতি পদবিক্ষেপে পতিত হইয়া কাতরে কতই কাঁদিয়াছি, দারিদ্র্যকুলীশের ভীষণ আঘাত বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছি, সমাজ-পীড়িত আমি, সমাজের কত পদাঘাতই সহ্য করিয়াছি,—প্রিয়তমার পবিত্র অঞ্চল অসার নয়নাসারে গোপনে কতই অভিসিক্ত করিয়াছি, সে সকল কথা এখন ভুলিয়া গেলাম! দুঃখের কথা মনে হইল না। সুখের চিত্র কত ভাবেই যে হৃদয়ক্ষেত্রে সমুদিত হইল, আশার কত রংয়ের কত ভাবের মনোরম চিত্রই যে হৃদয় ফলকে প্রতিভাত হইল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাই এই পোড়া মুখে হাসি ফুটিল, তবুও আমি একা।

দুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়া সুখের কথা মনে হইল। জ্ঞাতিগণের অযাচিত অনুগ্রহ, পিতার সোহাগ আদর, পুত্রের অপরিসীম ভক্তি, পত্নীর প্রগাঢ় প্রণয়ের পূর্ণ আলিঙ্গন, সংসারের নূতন নূতন রংয়ের ছবি, আমার চক্ষুর সম্মুখে! সব কথা ভুলিয়া গেলাম!—দুঃখের কথা ভুলিলাম, জননী-জঠরে মহামায়ার সম্মুখে দিব্য করিয়াছিলাম, "মা! তোমাকে কখন ভুলিব না। প্রত্যেক কার্য্যে তোমার চরণ স্মরণ করিয়া—তোমার শ্রীপদ লক্ষ্য করিয়া ঐ পদপ্রসাদ লাভ করিব। মা! তোমাকে জীবনে কখন ভুলিব না, একথাও বিস্মৃত হইলাম। সকলই ভুলিলাম।—মনে হইল,

কেবল সুখ! শান্তি! হর্ষ!—কিন্তু তথনও আমি একা!—আবার সেই আমি একা,—সেই অবলম্বনহীন একতাভাব হৃদয়ে কেবল জাগিতেছে। এত আনন্দ—এত হর্ষ,—এত সুখ; কিন্তু তবুও আজ আমি একা।

তৃতীয় স্তর।

—:০:—

ভবের বাজার।

আজ আমি ভবের বাজারে। নূতন নয়,—অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য আমার সম্মুখে নহে, আমি পুরাতন।—অনেকবার এই ভবের হাটে কেনাবেচা করিয়াছি, অনেকবার ঠকিয়াছি, অনেকবার জিতিয়াছি, সুখদুঃখ এ অদৃষ্টে অনেকবার ঘটিয়াছে, তবু আমি যেন আজ নূতন! আবার নূতন হইয়া নূতন সাজে সজ্জিত—নূতন বর্ণে রঞ্জিত—নূতন। ভাবে গঠিত হইয়া আজ আবার আমি এই ভবের হাটে যেন নূতনটী হইয়া দর্শন দিলেম। আমার সম্মুখে আজ সবই নূতন! সকলের সম্মুখে আমিও আজ নূতন

সংসারে নূতনত্ব ঘুচিতে পায় না। এই অনিত্যসংসারে নিত্যই নূতন ভাব—নূতন দৃশ্য দেখিতে পাই। পুরাতন ভিন্ন নূতনের অস্তিত্ব থাকে না, বিশেষ জানি, এই নূতন সংসারের সবই পুরাতন—কিন্তু লোকে ভাবে নূতন, লোকে দেখে নূতন, লোকে বলে নূতন! তাই আমিও আজ আবার নূতনটী হইয়া সংসার বাজারে কিনিতে বেচিতে নূতন অগ্রসর, তোমরা কেহ কিছু বেচিবে কি? তোমরা কেহ কিছু লইবে কি?

কেনাবেচা বড় কঠিন কথা। কত কত পাকাপোক্ত দোকানী জিনিস কিনিয়া ঠোকিয়া যায়, কত বোকা—নিতান্ত ন্যাকাবোকা ক্রেতা আবার জিনিস কিনিয়া বেশজিতিয়া থাকে—আমিও পাকাপোক্ত হইয়া—সংসার বাজারের দরদস্তুর শিক্ষা করিয়া, কত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, তবে এই বাজারে দেখা দিয়াছি। এখন কিনিব কি?

পরের জন্য আমি ভাবি না। স্ত্রী, পরিবার, পুত্রকন্যা, যাহারা—যাহারা মানবের একত্ব ঘুচাইয়া দ্বিত্ব করে, এক বচন হইতে মানবকে বহুবচনে

সমানীত করে, আমিকে আমার করে, সে সকল সবই আছে, কিন্তু আমার তাহাতে একত্ব ঘুচে নাই। কেনাবেচা তাঁহাদের জন্য নয়। তাঁহারা লোকসানের দায়ী নহেন, কেবল লাভের চুলচেরা অংশ লইতে রাজী আছেন, লইয়াও থাকে; তাই আমি তাঁহাদের জন্য তেমন ভাবি না। আমি এই সংসার বাজারে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব,—নিজের লাভ লোকসান বুঝিয়া লইব। তোমরা আইস আমার পরীক্ষার কৃতকার্য্যতা—এই অপূর্ব্ব ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল দেখিবে আইস।

ভবের হাটে অনেক দোকান। শারি শারি কতরকমের কত ধরণের কত জিনিসের দোকান। ক্রেতাও বিস্তর। প্রাণটী হাতে করিয়া একবার বাজারের হাটহদ্দ দেখিতে অগ্রসর হইলাম।

প্রকাণ্ড বাজার। একটী সিংহ দ্বার। চোগোঁপা দ্বারবানগণের তীক্ষ্ণ লোহিত চক্ষু—এক দৃষ্টিতে প্রবেশার্থীগণের প্রতি নিপতিত—দ্বারবানের দিকে না চাহিয়া—চক্ষু মুদিয়া ভয়ে ভয়ে সিংহদ্বার পার হইলাম। সম্মুখে দুইটী মাত্র পথ! একটীর চারিধারে মনিহারীর দোকান, একটির দুই-পার্শে বড় বড় মহাজনী আড়ত। আড়তের মধ্যে নানারকম জিনিস আছে। ভূষিমালও আছে সোণারূপাও আছে। মনিহারীর দোকানের বাহার বেশ লাল, নীল, সবুজ, কত রকমের নাট্‌কী ফাটকী, দাম কম; ছেলে ভুলুনে সামগ্রী। কত বুড়াও ভুলিতেছে দেখিলাম। আড়তে তত জাঁক জমক নাই, তেমন সাজসরঞ্জাম নাই, তবে জিনিস বড় দামী,—সে দিকে লোকের ভীড়ও কম। সবগুলিই দেখিতে সাধ গেল। নূতন ব্যাপারী, নূতন ক্রেতা, সহজ চক্ষুতে বাহ্যসৌন্দর্য্যের জমকাল ছায়া লাগিবার কথা। দেখিবার সাধ দুইটিই; কিন্তু কেমন যে মন, আগে মনিহারী দেখিতে বাম পথ বহিয়া চলিলাম। দেখিলাম দারুণ হট্টগোল। সকল রকম জাতিই তথায় বিরাজমান। সকল রকম ক্রেতাবিক্রেতা বর্ত্তমান। একস্থানে দেখিতে পাইলাম, পাঁচ বৎসরের বৈদিক ব্রাহ্মণ হইতে অশিতীপর কুলীন-ব্রাহ্মণ; কুলীনমৌলিক কায়স্থ, ছত্রিশ জাতি হাতে সুতা বাঁধিয়া চেলীর কাপড় পরিয়া উপবাসবিশুষ্ক মুখে দারুণ কলহের সূচনা করিতেছে। এক স্থানে দেখিলাম, তুলাদণ্ডে স্বর্ণরৌপ্যের তুলায় কন্যাপুত্র তুলনা হইতেছে। আমার একটু গুণ ছিল, একটু যৎসামান্য গন্ধ ছিল, নিমখাসা রকমের রূপ

ছিল, একটু আধটু রসও ছিল, একটী বৃদ্ধ আমাকে পণে কিনিতে অগ্রসর হইলেন। বিনিময়ে কি দিবেন? জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—একটী বালিকা। আমার প্রয়োজন ছিল না, ব্রাহ্মণের জিদ গুরুতর দেখিয়া, শ্রীহরি! পরেই দেখিলাম,—অদ্ভুত বিপনী! রাজা রাজরা আমীর ওমরা যত পঙ্গপালের মত ছুটাছুটী করিতেছে। গুটীকতক অক্ষর—রাশি রাশি অর্থ বিনিময়ে বিক্রয় হইতেছে। দোকানের শিরোদেশে লেখা আছে, "English policy," আমি ত অবাক! ভাবিলাম, যে বর্ণমালা আমারও আয়ত্ব, তাহাই এত মূল্যে ক্রয় করিয়া, রাজার দল কি সুখ পাইতেছেন। একখানি পেটাও দোকানে ছোট বড় নানাধরণের লাঙ্গুল বিক্রয় হইতেছে। এ সকল বড় লোকের ব্যবহার্য্য, বড়লোকের কাছেই ইহার আদর। আমি দরিদ্র, আমি সে পুচ্ছধারণের অবসর পাইলাম না, অতএব প্রস্থান করিলাম।

এবার যে দোকান দেখিলাম, সেটী বড় চমৎকার সাজানো গোজানো। যেন একখানি মনোহর চিত্রপট।—জগতের সৌন্দর্য্য যেন এইখানে সমবেত হইয়া, সৌন্দর্য্যের পারকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। নিকটে গিয়া একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া, হানিপ চাচার কথা মনে পড়িল। হানিপ চাচা জগতজননী দুর্গা প্রতিমা দেখিয়া বলিয়াছিল, "উপরে চিকণ চাকন, মর্দ্ধি লেখাই খ্যাড়।" এই দোকানের সৌন্দর্য্যও তাই! কেহ বিক্রেতা নাই, নিজেই জিনিষ, নিজেই বিক্রেত্রী,—বিক্রেয় রূপ। সকলে স্ব স্ব রূপের পসরা খুলিয়া, খরিদদার ডাকিতেছে। বিলোলকটাক্ষে মন ভুলাইয়া, আপন আগুণ ঢাকা পাঁশ আগুণের দরে বিক্রয় করিতেছে। রূপের আগুণে কত রূপজমোহপ্রাপ্ত পুরুষপতঙ্গ লাফাইয়া পড়িয়া, দাঁত মুখ খিচাইয়া, দগ্ধ হইতেছে। প্রেমের মরিচীতরঙ্গে জলভ্রমে পতিত হইয়া, বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছে। আমি এই সকল স্তিমিতাক্ষী লক্ষ্মীদিগের কাঁকরচরণে দূর হইতে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। মদে রূপের ছায়াটী মাত্র পড়িয়াছিল, তাই ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলাম।

সম্মুখে আর একটী দোকান। থরে থরে কত রকমের জিনিষ সজ্জিত, লোক নাই। একটী স্তিমিত প্রদীপ হ্রস্বকীরণ বিকীর্ণ করিতেছে মাত্র। জিনিষগুলি বড় মনোরম, বড় মূল্যবান, মমের মত! একটী দ্রব্য লইতে

বাসনা জন্মিল। বিক্রেতার অনুসন্ধান করিলাম, কেহ কোথাও নাই। লোভ ক্রমঃশই বর্দ্ধিত হইয়া, পরিশেষে কি জানি কেন, আমার এই অভি-লষিত দ্রব্যটী গ্রহণ করিলাম। মূল্য দিবার অবসর পাইলাম না। ভয় হইল,—অন্য লোকের সমাগমধ্বনি মুহুর্মুহু কর্ণপথে ধ্বনিত হইল,—সভয়ে সচকিতে দ্রুতপদে প্রস্থান! অনেকদূরে আসিলাম, মধ্যে যে কয়েকখানি মনহারী ছিল, দ্রুতগমনে তাহা দেখিলাম না। অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি, আর কারে ভয়?—তখন যেন মনে হইল, আর কাহাকে ভয়, কিন্তু মন তা মানিল না। তখনি মর্ম্ম যাতনা। তখনি আবার অনুশোচনা। মনে করিলাম, এ ছাইভস্মে আমার প্রয়োজন নাই, ফিরাইয়া দিয়া আসি। তাই বা পারি কৈ? যদি আবার কেহ দেখে? আমি যে দায়ে পড়িয়া চোর হইলাম। লোকের মনে এক একটা রোক আসিয়া আঘাত করে। পাগলের ঝোঁকের মত এই ঝোঁকে পড়িয়া, অনেকেই গর্হিত কার্য্য করিয়া, শেষে অনুতাপে দগ্ধ হন। দৃঢ় হৃদয় যাহাদের, তারা এ ঝোঁক—মনের এ তরঙ্গ দমন করিতে পারে, পাগল আমি—আমার সে ক্ষমতা কোথায়? তাই আজ দায়ে পড়িয়া, এই অনুশোচনায় ভরা হৃদয়ে লইলাম। হায় হায়! ভবের হাটে কেন আসিলাম? এই কি লাভ হইল?

ভয় দূরে গিয়েছে, কেবল অনুতাপ আছে। আবার ভবেরহাটের দোকান পাট দেখিতে চলিলাম। এবার একবারে আমি ফটকের সম্মুখে।

এবার দক্ষিণ ধারের মহাজনী দোকান দেখিতে চলিলাম। সম্মুখেই এক অবাক কারখানা, একটী বাগান।—একই রকমের গাছে কত রকমের ফুল, কত রকমের লতা, কত ধরণের পাতা, কত কেয়ারী, গণিয়া স্থির করি-বার নয়। প্রত্যেক টবের গায়ে, প্রত্যেক কেয়ারীর নীচে নাম লেখা, দর আঁকা। প্রথমেই দেখিলাম,—প্রকাণ্ড প্রাচীন দুরারোহ বৃক্ষ,—নাম সাধনা। বাগান দেখিতে যার সাধ, এই বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া, তাহাকে প্রবেশ করিতে হয়। এইবার বড় বিষম সমস্যা। প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কণ্টকাদি বহুতর, অতিক্রম করিবার উপায় কি?—একবারে ভাবনা চিন্তায় অবসন্ন হইলাম। দেখিবার বাসনা বলবতী, ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে, প্রায় কোন কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না। আমি সাধনাতরুতে আরোহণ করিতে সচেষ্ট

হইলাম। অর্দ্ধাংশ মাত্র আরোহণ করিতে বহুদিন কাটিল, আর ধৈর্য্য থাকিল না,—সেই অর্দ্ধপথ হইতে ঝম্প প্রদানে আবার নিম্নে পতিত হইলাম। অকালপক্ক হইয়া (ইচড়ে পাকা) সেই মধ্যস্থল হইতে ঝরিয়া পড়িলাম। দেখিবার ক্ষমতা জন্মিল, সংগ্রহ করিবার—সেই ফলফুল উপভোগ করিবার ক্ষমতা জন্মিল না, আমি যে ইচড়ে পাকা!

সম্মুখে সাধনা-তরুর অনতিদূরে একটি প্রশান্তমূর্ত্তি নবীন শ্যামলশাখা-পত্র বিশিষ্ট, তরু—নাম গুণ। অনেকগুলি শাখা।—দয়া, স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি শাখার নাম।—সবগুলি শাখাই ফলপুষ্পে শোভিত সবগুলি শাখাই অক্ষত, অভগ্ন, যেন নূতন—নূতন—নূতন। ফলসংগ্রহে প্রবৃত্তি জন্মিল, শত চেষ্টা করিলাম, সহস্র আয়াসে বাহু প্রসারণ করিলাম ফল তবুও দূরে। কত লোক আসিল, কত ফলসংগ্রহ করিল, আবার আমার মত কত হতভাগ্য বাহুপ্রসারণ করিয়া নিরাশ হইল। কতখর্ব্ব লোকের ক্ষুদ্রহস্ত সেই সুদুর্লভ ফল আহরণ করিল, আমি সুদীর্ঘ বাহু যুগল প্রসারণ করিয়া—প্রাণপণে দীর্ঘতর দেহ দীর্ঘতম করিয়াও ফলস্পর্শ করিতে পারিলাম না, এত এক বিষম লেঠা। বনে বড় কষ্ট হইল, ভাবিলাম হায় হায়। কেন সাধনা-তরুর সুদূর সীমা অতিক্রম করিলাম না, কেন অর্দ্ধপথে প্রতি নিবৃত্ত হইলাম। ভাগ্য মন্দ, তাই অদৃষ্টে এই দুঃখ। ভাগ্যের দোষ দিয়া—ভাগ্যের উপর—অকৃতকার্য্যতার পরিণাম স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, সম্মুখে দিব্য কুসুমকুঞ্জ। এমন কুসুম কখন দেখি নাই, এমন সৌরভ কখন নাশাপথে প্রবিষ্ট হয় নাই, এমন কুসুমসৌন্দর্য্য কখন নেত্রগোচর করি নাই। অনুকুল পবন অনুকুল পবনে প্রবাহিত হইয়া নিকটস্থ জনগণকে পুলকিত করিল,—আমি শুনি-লাম সৌরভ চমৎকার,—দেশব্যাপী,—বহুক্ষণ স্থায়ী, উপভোগ করিলাম ক্ষণকালমাত্র। নাসিকা প্রসারিত করিয়া কতই আকর্ষণ করিলাম, যতটুকু পূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত সৌরভ সম্ভোগ অদৃষ্টে ঘটিল না। কত চেষ্টা করিলাম, কতই আয়াস স্বীকার করিলাম, আশা আর পূরিল না আর যে কখন পূরিবে—তাহাও এ হতভাগ্য আর বিশ্বাস করে না। কুঞ্জের নাম,—যশোনিকুঞ্জ। এ কুঞ্জ চিরদিন সমান আবরণে আবৃত। প্রতিদ্বন্দী তপনের ঘোর উত্তাপে এ কুসুম শুকায় না, কুযশ পবনে এ কুসুম

আন্দোলিত হয় না, কালের কঠোর তাড়নে এ কুসুম বৃন্তচ্যুত হয় না,—এ কুসুম অশোষ্য—অবিকৃত—অনন্তকালস্থায়ী। এ জীবনে এ কুসুমসৌরভ উপভোগ করিতে পারিলাম না, পর জন্মে যদি পারি, সে জন্য প্রস্তুত হইব মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

সম্মুখে এক ভুষিমালের গুদাম। গুদামের উপরে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে, "যশের বিপনী। যে যেখানে থাক, সুলভ মূল্যে গ্রহণ কর, বিলম্ব করিলে পাইবে না।" আবার যশের দোকান কেন? যশোনিকুঞ্জ থাকিতে আবার যশের বিপনী কেন?—বুঝিলাম না। সুলভে একবার যশ কিনিতে সাধ গেল। জিনিস দেখিলাম দিব্য চমৎকার,—দূর হইতে দেখিতে মন্দ নয়,—নিকটে গিয়া দেখি, ধূলায় ভরা। কালপবনে কেবল উড়াইয়া লইয়া সেই ভুষিমাল ভূষিতে মিশাইতেছে। ভক্তি উড়িল, আর এ পোষাকীযশে কাজ নাই ভাবিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলাম।

দেখিতেই সময় গেল। কিনিব তবে কখন? সময় ত ফুরাইয়া আসিল,—আমার এ হাটবাজার ভাঙ্গিবার কালডঙ্কা পড়িল, তবে কিনিব বেচিব কখন? এদিকে আমার তলব হইয়াছে যে! এমন নেহাত বোকা ব্যাপারী আর কেহ কখন দেখিয়াছ কি?

মনে মনে স্থির করিলাম আর অধিক দোকান দেখিব না, দুই এক খানি দেখিয়া নিজের কেনাবেচা সারিয়া প্রস্থান করিব। কেহ না দেয়, দ্বিগুণ মূল্যে কিনিব, কেহ না লয় অর্দ্ধ মূল্যে ছাড়িব। অধিক দেখিয়া ধাঁধায় পড়িয়াছি, আর অধিক নয়—দুই একটী মাত্র।

সম্মুখে এক নিবীড় অন্ধকার পূর্ণ গৃহ। আলোক নাই, কিন্তু লোকের ভীড় বিস্তর। বহু কষ্টে কাষ্ঠফলক পাঠ করিলাম,—"অর্থ! অর্থ! অর্থ! এখানে ধর্ম্মের বিনিময়ে অর্থ বিক্রয়। যাহার ধর্ম্ম আছে, বিক্রয় কর, প্রচুর অর্থ পাইবে!" আমার ধর্ম্ম ছিল না, অর্থের আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু নিজের পয়সা খুলিয়া বহুযত্নে খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলাম, ধর্ম্ম বড় অধিক নাই। একপার্শে একটি কানাভাঙ্গা ছাতাপড়া কাচের বোতলের এক কোণে একটু পড়িয়া আছে মাত্র। সেটুকু ঘর করিতে থাকা চাই বলিয়া আর সে দোকানে ঢুকিলাম না।

সম্মুখে প্রকাণ্ড বিপনী। সাজ-সরঞ্জাম নাই, ব্যবহার বিলাসিতা নাই,

কেবল জিনিসের জৌলসে ঘর রোসনাইময়! বড় বড় ডাগর ডাগর সোণার অক্ষরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লেখা "ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! একটু কিনিতে সাধ গেল। কিন্তু তেমন উপযুক্ত পণ নাই। বিক্রেতার চরণ ধরিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া একটু ভিক্ষা চাহিলাম, কত মিনতি করিলাম, কত চক্ষুজলে বক্ষঃ ভাসাইলাম, কত দুঃখকাহিনী আত্মগ্লানী জানাইলাম, বিক্রেতার দয়া হইল না। তিনি বজ্রগম্ভীরে বলিলেন, "নিয়ম নাই। উপযুক্ত পণের কপর্দ্দক মাত্র সংকুলান না হইলেও, এ ধন প্রদত্ত হয় না। ধন আমার নহে, দানের উপযুক্ত নহে,—ধন সাধারণের। যাহার পণ আছে, সামর্থ্য আছে, ধন তাহারই তোমার পণ থাকে, তুমি সমর্থ হও, সেই অমুল্য অতুল্য নিধি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও।" আমার ত সে সকল কিছুই নাই—বিক্রেতার চরণ ধরিয়া সাধিতে গেলাম, দ্বারবান "দূর দুর করিয়া তাড়াইয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলাম।

ঘড়ি বাজিল, ঢং ঢং ঘড়ি বাজিল। কে যেন আমাক অলক্ষ্যে সবলে সেই ভবেরবাজার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। কেনা হইল না, বেচা হইল না, দেখা হইল না, সব শুনা হইল না, ভবের বাজারের কপাট বন্ধ হইয়া গেল।—হরি!—হরি!—আজ আমি একাকী। এই নরাধম পাপাধম অধমের অধম পাতকী আজ একাকী। আমি যে একা সেই একা।

চতুর্থ স্তর।

বিচার।

এত দিন সংসারে তবে আমি করিলাম কি? সংসারে থাকিয়া আমি করিয়া আসিলাম কি?—আজ তারই আমাকে পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষা মন্দির কালনিকেতন, পরীক্ষক কাল, শাস্তিদাতা মহাকাল, পুরস্কারদাতা বিধাতা। যাই তবে, সেই পরীক্ষার আয়োজন করি। পরীক্ষা অনেক হইয়াছে, পরীক্ষা পদে পদে দিয়াছি, দণ্ডপুরস্কারও পদে পদে পাইয়াছি। কত সুখের হাসি হাসিয়াছি, কত দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছি,

ততঃ সমভবদ্‌ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভূর্দেবতৈঃ সহ।

কত আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়াছি, কত শোকসাগরে ভাসিয়াছি, কত আশার প্রদীপ জ্বালিয়াছি, কত মর্ম্মযাতনা—আত্মগ্লানির ভীষণ অনলে পুড়িয়াছি, তবে এ আবার নূতন পরীক্ষা কেন? এই পরীক্ষাই শেষ পরীক্ষা।—এই পরীক্ষাই সার পরীক্ষা।

দেখিলাম, এক অজ্ঞাত অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থান। অন্ধকার জ্যোতির গতি প্রতিহত করিয়া, শূন্যে শূন্যে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। যে দিকে চাই, সভয়ে সন্দেহে সাগ্রহদৃষ্টিতে যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই ঘোর ঘোরতর অন্ধকার! আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে এক প্রকার বিভীষিকাময়ী নীল আলোক স্থানে স্থানে প্রজ্জ্বলিত হইয়া, সেই অন্ধকারের নিবীড়তা বৃদ্ধি করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ভীষণ ধ্বনি. চতুর্দ্দিকে অস্ফুট কাতরোক্তি, ভীম ভৈরব হুঙ্কার, প্রাণ তরাসে কাঁপিয়া উঠিল। নাসারন্ধ্র এক প্রকার পূর্ব্বানাঘ্রাত নিকট গন্ধে রুদ্ধ হইল! আমি কাতর, অতি কাতর, হৃদয় অবসন্ন—যন্ত্রণায় প্রাণ যারপরনাই ক্ষীণ, যাই যে! অন্যত্র গমনের অবসর নাই, ক্ষমতা নাই! অনির্দ্দিষ্ট দেশে কোন অলক্ষিত শক্তিতে পরিচালিত হইয়া চলিয়াছি! সম্মুখে মহান পুরীষ হ্রদ, নাম রৌরব! কত শত শত ছিন্নশীর, বিগতহস্ত, খণ্ডিতনাশ, বিভিন্নতালু, অগণ্য পাপী সেই পুরীষ হ্রদে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। আমি অতর্কিত ভাবে অলক্ষ্যে এক বারে সেই রৌরব সন্নিধ্যে। সম্মুখে মহাকাল! আতঙ্কে হৃদয় কম্পিত হইল! পদ্মপত্রের বারিবিন্দু মৃদুল পবন সংঘাতে যেমন কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় আমার তেমনি কাঁপিল। আতঙ্কে সভয়ে সকাতরে ডাকিলাম, “মা ব্রহ্মাণ্ডময়ি দনুজদলনী দুর্গে! মা অনন্তরূপিণী অনন্তগুণশালিনী অনন্ত সন্তানপরিপালিনী চিন্ময়ি! মা চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী! ভক্তবৎসলে মা আমার! পরিত্রাহি! পরিত্রাহি! প্রসীদ! প্রসীদ! কাতর সন্তানকে পরিত্রাণ কর মা! কাতরের কাতর উক্তি মা শুনিলেন না,—মহাকাল সদম্ভে সগর্ব্বে কতই যেন কঠিন কঠোরস্বরে কহিলেন, “পাপি!—” আরও ভয় হইল। মনে জানিতাম, কখন জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ করি নাই, যদি কখন পাপচিত্র ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তখন অনুতাপের প্রখর অগ্নিতে হৃদয়চিতা প্রজ্জলিত করিয়া, অনুশোচনার প্রবল প্রবাহে ধৌত করিয়া, সেই পাপের যথোচিত শাস্তি ভোগ করিয়াছি,

তবে আবার এ সম্বোধন কেন? মহাকাল কহিলেন, পাপি! তোমার মর্ম্ম-ভেদী কাতরোক্তি জননী শুনিবেন কেন? তুমি পাপী, সংসারে অনেক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার শাস্তি ভোগ কর। পরে মা তোমার প্রতি সদয়া হইবেন। পাপমোচন হইলে, তোমার অভীষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। এখন শাস্তি ভোগ কর।" মহাকালের শেষোক্তিতে আশান্বিত হইয়া কহিলাম, "আমি ত কখন পাপ করি নাই, তবে আমার আজ এ শাস্তি কেন?" মহাকাল কহিলেন, "তোমার পাপের অবধি নাই। বারাঙ্গনায় আসক্তি তোমার প্রথম পাপ।"

আমি। আমি কখন বারাঙ্গনার গৃহেও ত পদার্পণ করি নাই?

মহাকাল। সত্য। পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলেও, সেই পাপ কার্য্য মনে হইলেই পাপ। এই পাপে তোমার রৌরব দর্শন। দ্বিতীয় পাপ অপহরণ। মনে হয়, একদা অধিকারীকে না বলিয়া, কোন দ্রব্য আত্মসাৎ কর। এই পাপে তোমার অসীপত্র দর্শন। চল, তোমাকে অসীপত্র দর্শন করাই।" আমার সকল কথা মনে হইল। মহাকালের সঙ্গে অসীপত্র দর্শন করিলাম। প্রকাণ্ড অন্ধকার গৃহ। দূরে হইতে পাপীর আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইল। মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মহাকাল কহিলেন, "তুমি পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, একদা সুরাপানে অভিলাষ জন্মিয়াছিল, আর ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, নিজের স্বার্থসাধনের জন্য অপরের মনে বিষম ব্যথা দিয়াছিলে, এইজন্য তোমার বৈতরণী দর্শন।" বৈতরণী দেখিলাম। প্রকাণ্ড অগ্নিনদী। অগণ্য পাপী সেই অগ্নিপ্রবাহে ভাসমান। উপরে শবভুক শকুনী গৃধিনী নখরদ্বারা কাহার কর্ণ, কাহার চক্ষু, কাহার মস্তক কাহার বা তালু নখরে বিদীর্ণ করিয়া আহার করিতেছে। পাপীগণের কাতরোক্তিতে শ্রবণযুগল বধীর হইল। সরোদনে কহিলাম, "আবার যদি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আবার যদি ধরাধামে গমন করিতে হয়, তাহা হইলে, এমন পাপকার্য্য আর কখন স্মৃতিপথেও আনিব না।" মহাকাল আরও কহিলেন, "পাপি! আরও শুন, মাতাপিতার প্রতি এক দিনের জন্য ভক্তির ত্রুটী করিয়াছ, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, সুহৃদের হিতবাক্য তৃণতাচ্ছিল্যে পরিত্যাগ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে আজ কুম্ভিপাকে

নিক্ষেপ করিব।" মহাকাল আমাকে সঙ্গে করিয়া কুম্ভিপাকে লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড বহ্নিকুণ্ড। অসংখ্য প্রজ্বলিত ঘৃতপূর্ণ কটাহ। পাপীগণ এই কটাহে অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছে। আমি কাতরে কহিলাম, "মহাকাল! ইহা হইতেও গুরুতর অনুতাপবহ্নিতে আমি দিবা রজনী ভর্জ্জিত হইয়াছি, তবে আবার এ দণ্ড কেন? মহাকাল আমার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। সবলে সেই কটাহে নিক্ষেপ করিলেন। এ সময়—এই নিদারুণ সঙ্কটে আমার মা কোথায়? কোথায় মা! কোথায় ভক্তহৃদয়বাসিনী মা আমার কোথায়? মা মা বলিয়া কতই কাঁদিলাম, কতই ডাকিলাম, মা আসিলেন না,—মা আমায় কৃপা করিলেন না। আমি সেই ভীষণ ঘৃতপূর্ণ কটাহে পড়িয়া, অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছি।—এ যন্ত্রণা আর কি কখন ঘুচিবে না? এ মর্ম্মান্তিক মনস্তাপ আর কখন কি নিবারণ হইবে না? কাতরে আর কত ডাকিব,—

ত্রাহিমে ত্রাহিমে দুর্গে ত্রাহিমে ভবভাবিনী।
দুস্তরঘোরসংসারে ভারত্রিতাপনাশিনী॥

পঞ্চম স্তর।

কয়েকটি থিওরি।

আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে। জন্ম জন্মান্তরের পরিবর্ত্তনে—সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে। আগে যতটা ভয় ছিল, এখন আর ততটা নাই। জন্মান্তরে আগে ভয় ছিল, মৃত্যুর নাম শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, এখন আর ততটা ভয় করি না। জন্মান্তরে কৌতুহল হয়, নূতন লীলা খেলার সূত্রপাত করিতে ইচ্ছা হয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে। আমি এখন সংসারে নাই, কাল নিকেতনে। নিত্য নিত্য নূতন জীবের সমাগম, নিত্য নিত্য পুরাতনের অন্তর্দ্ধান। এখানে যারা নূতন, সংসারে তারা পুরাতন, এখানে যারা পুরাতন, সংসারে আবার তারা নূতন।

পরিবর্ত্তনও কম নয়। দেখিলাম যিনি অগণ্য দাসদাসীসেবিত বহুমান্যাস্পদ গৌরী সেনের পুত্র ছিলেন, ভোগ বিলাসে যাঁর চিত্ত সদাই

অনুরক্ত ছিল, তিনি আবার রামদাস বাবুর অশ্বরক্ষকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে চলিয়াছেন। সংসারে যিনি শঙ্করাচার্য্যের পুত্র সাধুর শিরোমণি ছিলেন, তিনি হরিঘোষের বুধি গাইয়ের গর্ভে মঙ্গলা রূপে জন্মগ্রহণ করিতে চলিয়াছেন, যাহার দর্পে গগণ কাঁপিত, সাগর শুকাইত, সেই নেপোলীয়নের বংশধর আজ হীরা মালিনীর মেনি বিড়াল হইবার জন্য বাহালী পরওয়ানা পাইয়াছেন, যিনি নগণ্য ভিক্ষু বিশুযুগীর পুত্র গোবরা যুগী ছিলেন, মাথায় মোট বহিয়া দ্বারে দ্বারে দেড়গজি গামছা বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার প্রেতআত্মা আজ রুদেবোর সিংহাসন লাভের জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়াছেন। যিনি এতদিন রামরজকের বস্ত্রভারবাহী ছিলেন, তিনি এবার পেহ্লাদী বৈষ্ণবীর সখের হীরামন হইবার দাবী করিতেছেন আমি দেখিলাম, এরই নাম পুনর্জ্জন্ম! সংসারের কর্ম্মানুসারে আর বিধাতার বিধানানুসারে জীবের এইরূপে উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে। বৃক্ষ পতঙ্গ হইতেছে, পতঙ্গ মাতঙ্গ হইতেছে, লতা জন্তু হইতেছে, পক্ষী মনুষ্য হইতেছে। অধম উচ্চ হইতেছে, উচ্চ অধমের অধম হইতেছে।

আগে বলিয়াছি ত, ব্রহ্মাণ্ড শিল্পশালায় পাঁচটী স্তম্ভ। সেই পাঁচ স্তম্ভের সমবায়ে জীবদেহ, দেহশেষে আবার সেই সেই পঞ্চতেই বিলীন হয়। শেষে যে যে উপাদানে আমার দেহ গঠিত ছিল ধ্বংসকালে সেই সেই উপা-দানে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে যাহার, তাহাতেই মিশাইল। আবার তাহাতেই অন্য দেহ সৃষ্ট হইল। আমার দেহে পূর্ব্বজন্মে যে যে উপাদান ছিল সেই সেই উপাদান এ জন্মে যে যে জীবদেহে বা যে যে স্থাবরজঙ্গমাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই সেই সত্বাই আমার পুনর্জ্জন্মের ফল। লোকে জানিতে পারে না, নতুবা কে বলিতে পারে, আমার পূর্ব্বদেহস্থ উপাদান তোমার শরীরে নাই? হয় ত নেপোলিয়নের উপাদান তোমাদের দেহে থাকিতে পারে, হয় ত শিরাজের উপাদান তোমার সকের ঝুমুরচাঁদ কুকু-রের দেহে থাকিতে পারে, হয় ত উইলিয়মের উপাদান রামসিংহ জমীদারের পোষা মেষসাবকের দেহে থাকিতে পারে। আবার আমার দেহে হয় ত রামাবতারের উপাদান থাকিতে পারে। তবে কে বলিবে যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্মের ফল শেষোক্তগুলি নহে?

এতক্ষণ যে মহাকাল, মহানিকেতন বলিয়া কতকগুলি কথা বলিলাম,

তাহাদের বাসস্থান কোথায়? এ কথা কি কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন? আমি ত জানি, এদের আদি নিবাস যেখানে সেখানেই হউক, উপনিবেশ মনুষ্যের হৃদয়ে। শান্তি পাই, যন্ত্রণায় দগ্ধ হই, অনুতাপে জ্বলি, অনুশোচনায় পুড়ি, চিন্তায় ডুবি, সবই মনে মনে। অনুতাপ, শোক, দুঃখ, ভয়, অভিমান সবই ত ভোগ করি মনে। মনের কষ্টই ত কষ্ট! এ কষ্টের অধিক কষ্ট আর কি আছে? এ শাস্তির অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আর কি হইতে পারে? জীব ভোগে—দুঃখ পায় মনে। তাই জানি, শাস্তিদাতা জীবের হৃদয়েই বিরাজ করেন। সুখদুঃখ দান করে,—প্রবৃত্তি অনুসারে।

ষষ্ঠ স্তর।

এই যে আমার মা।

আমার পাপরাশীর মোচন হইয়াছে। অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, অনুশোচনায় জর্জ্জরিত হইয়া, কালের প্রখর শাসনে শাসিত হইয়া আমি আজ নিষ্পাপ। তাই মা আমায় আজ কোল দিয়াছেন, আমি আজ মায়ের ক্রোড়ে মা আসিয়াছেন,—মা আমায় কোলে স্থান দিয়েছেন, আমি জগতকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। জগতকে হৃদয় ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। এখন আর আমি একা নাই। আজ আমি বহু। আমার একত্ব ভাব ঘুচিয়াছে, আমি আজ বহু। আমি আজ সকলের—সকলেই আমার আমি মায়ের, মা আমার। তাই আমি আজ বহু! আবার পারিবারিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আবার মায়ামোহে উন্মত্ত হইয়া সংসারে সংসারী সাজিতে প্রস্তুত হইয়াছি।—আমার চারিদিকে এখন আবার সেই বন্ধন এখন আমি বহু! এখন বুঝিয়াছি,—পরকাল কি?—নির্ব্বাণ কি? সমাধীই বা কি? কেবল আবর্ত্তন।—কেবল সংঘর্ষণ আর সংগঠন।—হরি হরি! আমি আজ বহু! একত্বই পাপ, দ্বিত্বই দুঃখ। পারি যদি একথা পরে বলিব। এখন এই মাত্র বলি আমি আজ বহু! সংসার আমার। আমি সংসারের। নির্ব্বাণ, সমাধি, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ নরক, সবই এখানে আছে। যদি কেহ দেখিতে চাও, তবে এই পাগলের সহযাত্রী হও। আশা পূরিবে।

তীর্থ তত্ত্ব।

উদ্দেশ্য।

হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস, তীর্থযাত্রা সমধিক পুণ্যজনক। (১) এই বিশ্বাসেই হিন্দু বয়সানুসারে তীর্থভ্রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। যাঁহারা তীর্থভ্রমণ কি দেবদর্শন পুণ্যজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, অন্ততঃ দেশী ভ্রমণ ও তথাকার বিবিধ আচারব্যবহার দর্শনে বহুদর্শিতা লাভ এবং দৈহিক উন্নতির জন্যও তীর্থভ্রমণ আবশ্যক। দেশভ্রমণের উপকারিতা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করেন না।

তীর্থযাত্রার আবশ্যকতা বুঝিলেও এবং তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা জন্মিলেও কয়েকটি কারণে সে আশা পূর্ণ হয় না। কোন্ দেশে কোন্ পথে কোন্ তীর্থ তবস্থিত, তথায় গমন করিতে হইলে কিরূপ অর্থের প্রয়োজন, এগুলি সকলে পরিজ্ঞাত নহেন। যে সমস্ত ব্যক্তি তীর্থযাত্রীর সহযাত্রীরূপে তাঁহাদিগকে তীর্থদর্শনে লইয়া যায়, তাহারা অজ্ঞযাত্রীগণকে প্রবঞ্চিত করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে। আবার যে সমস্ত ব্যক্তি তীর্থক্ষেত্রে তথাকার আবশ্যকীয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া দেয়, তাহারা নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়া যাত্রীদিগকে অনর্থক বিপন্ন করিয়া তুলে। এমন লোকের সংস্কার যে, যিনি যত অর্থই ব্যয় করুন, তীর্থক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ করিতেই হইবে। আমরা জানি, গয়ালী পাণ্ডাদিগের নিকট অন্ততঃ একটী টাকাও ঋণ না হইলে তীর্থযাত্রা ও দেবদর্শন বিফল হয় বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে। এই সমস্ত কারণে, যাহাতে সকলেই স্বয়ং ইচ্ছামত

---

(১) মাতৃবধ পাপে মুক্ত হতে ভৃগুরাম।
ভ্রমিলেন ভারতে তীর্থ অবিশ্রাম॥
ব্রহ্মবধ পাপক্ষয় করণ কারণ।
হলধর করিলেন তীর্থ পর্য্যটন॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির কুন্তির তনয়।
ইন্দ্রাদেশে ভ্রমিলেন তীর্থ সমুদয়॥
তীর্থ দর্শন।

তীর্থস্থানে গমন ও তথাকার উপযুক্ত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, সেইজন্য আমরা এই তীর্থতত্ত্ব প্রচারিত করিলাম। আরও বক্তব্য এই যে, ইহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইবে, তাহার অনেকগুলি আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি, এবং কতগুলি আমা অতি-বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। পাঠক জানিবেন, ইহা সমস্তই সত্য। অতিরঞ্জিত বর্ণনা দ্বারা ইহা কলঙ্কিত করি নাই। আমা-দিগের বিশ্বাস, এতদ্দর্শনে সকলেই তীর্থ যাত্রা করিতে পারিবেন এবং ইহার লিখিত ব্যয়ই সেই সেই তীর্থ যাত্রা যথেষ্ট বলিয়া জানিবেন। তবে অধিক ব্যয় করিতে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

—

কালীঘাট।

সন ১২৯৪ সালের ১৫ই বৈশাখ আমরা তীর্থযাত্রা করি। তীর্থযাত্রার আরম্ভ কালীঘাটে। ১৫ই বৈশাখ আমরা কলিকাতা হইতে প্রাতে কালী-ঘাট যাত্রা করি। ঘোড়ার গাড়ীতে বা ট্রামওয়ে কালীঘাট যেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। এখানে পৌছিলেই অসংখ্য লোক টানাটানি কোরে বাসায় নিয়ে যায়। প্রত্যেক দোকানদারের অধীনে যাত্রী ধরবার জন্যে ৪।৫ জন লোক থাকে। তারা আড্ডায় আড্ডায় দাঁড়িয়ে থাকে, একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালেই যাত্রী ধোরে টানাটানি আরম্ভ করে। তার মধ্যে ইচ্ছামত একজনের সঙ্গে গেলেই হলো। আমরা একজন পরিচিত দোকানীর ঘরে জিনিসপত্র রেখে গঙ্গাস্নান কল্লেম। কালীঘাটের নীচেই আদ্যগঙ্গা। আদ্যগঙ্গা তেমন প্রশস্ত নয়, জলও অতি পরিষ্কার, কিন্তু তাতে জোয়ার ভাটা হয় বলে ততটা দুর্গন্ধ থাকে না। স্নান কোরে ভিজে কাপড়েই কালীদর্শন করা উচিত। আমরা ভিজে কাপড়েই ডালা, ফুল, ডাব, চিনি নিয়ে কালীদর্শনে যাত্রা কোল্লেম। একজন নগদা পুরোহিত আমাদের চিরপরিচিত কুল-পুরোহিত হতেও যেন বেশী যত্ন কোরে—পূজার জিনিসপত্র নিজেই সব হাতে কোরে—আমাদের আগে আগে চোল্লেন।

কালী মন্দির প্রকাণ্ড। অতি পুরাতন। তেমন শিল্প নৈপুণ্য না থাকলেও মন্দিরটি যে বেশ শক্ত, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। মন্দিরের সন্মুখে চাঁদ্‌নী। কতগুলি ভক্ত সেই চাঁদ্‌নীতে বোসে হোম, জপ ও পূজা কোচ্চেন। মন্দিরের রক প্রায় তিন হাত কি সাড়ে তিন হাত উচ্চ। পুরোহিত আমাদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ব্ব দরজা দিয়ে গহ্বরে নেমে গেলেন। দরজায় প্রত্যেকে এক একটি পয়সা দর্শনী দিলেম। গহ্বরের অর্দ্ধাংশ রেল দিয়ে ঘেরা। আমরা রেলের পাশে দাঁড়িয়ে অঞ্জলী দিলেম। "সৃষ্টি স্থিতি বিনাসিনীং শক্তিভূতা সোনাতনী" বলে একটি বালক আমাদের মন্ত্র পাঠ করালে। আমি নিজের জানা মন্ত্রে মায়ের চরণে অঞ্জলী দিলেম। পুরোহিতের হাতে শালপাত ঢাকা ডালা ছিল, এতক্ষণ তার মধ্যে কি আছে দেখি নাই। এখন দেখি, চারিটি সন্দেশ, দুখানি পসা কলা কাটা, এই পর্য্যন্ত। দেখে ত অবাক! আমাদের ১।০ পাচ সিকার ডালা। এ ডালার দাম বড় জোর ৵০ দুই আনা মাত্র। মুখ ফুটে আর কিছু বল্লেম না। শেষে জান্‌লাম এদের এই রকমই গতিক।

দেবীর কেবল মুখ খানি পাথরের। হাত দুখানি সোনা দিযে মোড়া। ছাতা, মুকুট, অলঙ্কার, সবই সোণার। দেবী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা। রূপের এমন মাহাত্ম্য যে, দেখ্‌লেই ভক্তি হয়। প্রাণের মধ্যে যেন শান্তি দেখা যায়। বেশ কোরে দেখে, যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে এলেম। মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করা হলো। তার পরে পূর্ব্ব দরজা দিয়ে বেরিয়ে নকুলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শনে গেলেম। কালীবাড়ী হোতে এ মন্দির অধিক দূরে নয়। এখানে তেমন জাঁক জমক নাই। চারিদিক খোলা এক মন্দির। সেই মন্দিরের মধ্যে গহ্বর। তার মধ্যে প্রকাণ্ড গৌরীপট্টের উপর বাণলিঙ্গ, নকুলেশ্বর মুর্ত্তি। মন্দিরের সাম্‌নের দোকানে সিদ্ধিজল কিনে শিবের মাথায় ঢাললেম।—প্রণামী দিলেম। কুমারী বিদায় কোল্লেম। কালীবাড়ী হতে নকুলেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত শারি শারি অন্ধ, খঞ্জ, দীনদুঃখীরা বোসে ভিক্ষা কোচ্চে। ছাঁটা কাঙালীও কম নয়। পুনর্দর্শন কোত্তে কালীবাড়ীতে যেতে কাঙালীরা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মহা টানাটানি আরম্ভ কোল্লে। গলদ্ ঘর্ম্ম যাই যাই হয়ে যথা সাধ্য দান কোল্লেম। গরমে প্রাণ যায় আর কি? আমরা পয়সা দিয়েছি এই খবর

চারিদিকেই যেন নিমিষের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। অমনি দেশের বামন ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফেল্লে। কেউ বা মায়ের প্রসাদী সিন্দুর নাকে গালে, মুখে, সর্ব্বাঙ্গে লেপন কোরে দিলে, ছোট ছোট মেয়েরা কাপড় ধোরে—কাছা ধোরে টান্‌তে লাগ্‌লো। চারিদিকে যেন একটা মোহা গোল পোড়ে গেল। সে গোল যে সহজে মিটবে, সে অসংখ্য লোকব্যূহ হতে আমরা যে এ মাত্রা রক্ষা পাব, সে ভরসা ছেড়ে দিলেম। দেবস্থানে দান কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু প্রাণ বাঁচাই না পুণ্য করি? মহা বিপদ! কি করি, যথাসাধ্য তাদের দিয়ে তাড়াতাড়ি আর একবার মায়ের দিব্যমূর্ত্তি দর্শন কোরে প্রস্থান। ইচ্ছা ছিল আরও একটু অপেক্ষা করি, আরও একবার দেবমূর্ত্তি দর্শন করি, মনের ব্যথা আর একবার জানাই, কিন্তু ভিক্ষুকের ভয়ে সে আশাই মনেই রইল। তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাসায় এলেম সেখানেও কি নিস্তার আছে? গতিক বড় ভাল নয় বুঝলেম। এতগুলি কাঙালীকে সন্তুষ্ট করা আমাদের অসাধ্য, দেবস্থানে লোকের মনঃক্ষুণ্ণ করাও ভাল নয়। এই ভেবে সামান্য জলযোগ কোরে—দোকানীকে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে রওনা হলেম।

তারকেশ্বর।

সে দিন কলিকাতায় এসে থাক্‌লেম। পর দিন প্রাতে হাওড়া ষ্টেশনে ৭৷৷৹ টার গাড়ীতে তারকেশ্বর রওনা হলেম। তারকেশ্বররেল ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে সেওড়াফুলি ষ্টেশন হোতে বেরিয়েছে। তারকেশ্বর পৌঁছিতে কিছু বেশী ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। হাওড়া হতে ভাড়াও বেশী নয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ।৵১০ সাড়ে আট আনা মাত্র। আমরা প্রায় ১১টার সময় তারকেশ্বরে পৌঁছিলেম। তারকেশ্বরের মন্দির ষ্টেশনের অধিক দূরে নয়। ষ্টেশন হতে বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাসাভাড়া দেবার জন্যে অনেক লোক ষ্টেশনে এসে যাত্রীদের সমাদরে নিয়ে যায়। আমরা একজন দোকানদারের সঙ্গে গিয়ে বাসা নিলেম। তারকেশ্বরের মোহান্তের বাস বাড়ীর সামনেই এক পুকুর আছে। কিন্তু যাত্রীরা যেখানে প্রায়ই স্নান করে না। মন্দিরের পশ্চিমদিকের যে একটী পুকুর আছে, সেই পুকুরে স্নান

কোরে দেবদর্শনে বেরুল্লেম। একজন পুরোহিত সঙ্গে কোরে ওলা, কাঁচা দুধ, সিদ্ধি ও ফুল বিল্বপত্র নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ কোল্লেম।

আমরা যখন পৌছিলেম, তখন ভয়ানক রৌদ্র, কিন্তু তাতে কেষ্টবোধ হলো না। দেবদর্শনে মনের এত চাঞ্চল্য যে, রৌদ্রের কষ্ট লক্ষ্যই কোল্লেম না।

পুরির মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, দেখি তখন ভোগ হচ্ছে। বাদ্যকর কোন স্বতন্ত্র লোক নাই। দুজন ভস্মমাখা পাণ্ডা কাটে ঝুলানো দুটি জয় ঢাকে অনবরত বেত্রাঘাত কচ্চে। মেল নাই, তাল নাই, মাত্রা নাই, বোল নাই, দুজনে পোড়ে দমাদম্ বাজাচ্চে, কিন্তু শুন্‌তে বড় মনোরম। এমন মিষ্টি লাগ্‌লো, যে তাই শুন্‌তেই দাঁড়িয়ে রইলেম। ভোগ শেষ হলে লোকের ভীড় কমে গেল। আমরা ধীরে ধীরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। এত কষ্ট, এত রৌদ্র, সব যেন ভুলে গেলেম। উত্তপ্ত রৌদ্র হতে যেন বরফের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। মন্দিরের সামনেই পাথরের মঞ্চের উপরে পাথরের ষাঁড়। ষাড় পাথরের কিন্তু এমনই ভাবে আছে যে, দেখ্‌লেই বোধ হয়, ষাড় যেন প্রভুর আগমন প্রতিক্ষায় চেয়ে আছে। মন্দিরের সাম্‌নে চাদ্‌নীতে কত শত নরনারী শারি শারি প্রভুর প্রসাদ প্রতীক্ষায় অনাহারে সকাতরে কাতারে কাতারে পোড়ে আছে। প্রভুর দয়া না হওয়া পর্য্যন্ত তারা সেই ভাবেই সেই অবস্থাতেই পোড়ে থাক্‌বে। এমন জাগ্রত দেবতা আর নাই। তা না হলে, এমনভাবে লোক হত্যা দিয়ে পোড়ে থাক্‌বে কেন?

মন্দিরটি প্রকাণ্ড। আগাগোড়া পাথরের গাথুনী। চারিদিকে রক। রকের সম্মুখেই চাদনী। মন্দিরটি দেখ্‌লে বেশ বোধ হয়, ইহা কারুকার্য্যের একটি নিদর্শন। প্রবাদ আছে, এ মন্দির স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। প্রবাদ সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, এ যে একজন নিপুণ কারিগরের কারিগরি, তাতে আর সন্দেহ নাই। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার। এক একটি দ্বারের উপরে এক একটি প্রধান মুর্ত্তি। প্রথম দ্বারের উপর দেখ্‌লেম অন্নপূর্ণা মুর্ত্তি। জগত জননী পরিবেশন কোচ্চেন।—এক হাতে থালা, এক হাতে হাতা, জননী অনন্ত সন্তান সম্প্রদায়ের আহার যোগাচ্চেন, অদূরে প্রসাদ প্রতীক্ষায় কৃত্তিবাস অন্নভিক্ষা কোচ্চেন। চিত্রকরের এমন

নৈপুণ্য যে, কতকাল হয়ে গেছে, তবুও চিত্র যেন এখনও সজীব রয়েছে। দ্বিতীয় দ্বারের উপরে হিমগিরির প্রস্থদেশে বিল্বকুঞ্জে মহাযোগী যোগনাথ মুদিতনেত্রে শক্তির চরণ চিন্তা কোচ্চেন। মহামায়ার অভাবে যেন মহেশ্বর শ্রীভ্রষ্ট হয়েছেন। সেই ভস্ম আছে কিন্তু তেমন দীপ্তি নাই, ললাটে সেই বহ্নি আছে কিন্তু তেমন তেজ নাই, শরীরের স্থূলতা আছে কিন্তু লাবণ্য নাই. মাথায় ফণি আছে, কিন্তু তাদের আর গর্জ্জন নাই। মহেশ্বর যেন অতি মৃয়মান। যেন বিষাদের বিষাদময় মুর্ত্তি। অদূরে নন্দিকেশ্বর দক্ষিণ অঙ্গুলি অধরোষ্ঠে সংস্থাপন করে তপোবনের শান্তিরক্ষা কোচ্চেন। পাছে কোনরূপে যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ হয়, এই ভয়ে নন্দি-কেশ্বর অতি সতর্কতার সহিত দণ্ডায়মান। বিল্বমুলে বৃদ্ধ বৃষ মুদ্রিত নেত্রে রোমন্থন কোচ্চে। উমা মহেশ্বরের বাম পার্শ্বে নতশীরে পুষ্পধার রক্ষা কোচ্চেন। আহা কি চমৎকার! উমা উভয় হস্তে পুষ্পাধার ধারণ কোরে নতশীরে ভুমে রক্ষা কোচ্চেন, দেহযষ্টি ধনুকাকার হয়েছে, শরীর নত করায় বক্ষঃবসন যেন শীথিল হয়েছে, তার মধ্য হতে উদ্ভিন্ন যৌবনের লাবণ্য স্পষ্টই দেখা যাচ্চে।—উমার রাগরক্ত মুখে যৌবন সুলভ ব্রীড়া যেন খেলা কোচ্চে। এদিকে দূরে সমীবৃক্ষের অন্তরালে পুষ্পময় দেহ লুক্কায়িত কোরে মদন ফুলধনুতে ফুলশর যোজনা কোচ্চেন। মুখের ভাব যেন বড় ভীত শঙ্কাযুক্ত বোলে বোধ হচ্চে। তৃতীয় দ্বারে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। পার্ব্বতী ব্যাঘ্রাসনে উপবিষ্টা, ক্রোড়ে কার্ত্তিকেও ও গণপতি। পার্ব্বতীর নেত্রত্রয় হতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হচ্চে। কিন্তু একটু ভাল কোরে দেখলে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়, সেই ক্রোধের মধ্যে যেন হাসির মন্দ মন্দ তরঙ্গ আছে। সন্মুখে করযোড়ে দিগম্বর। ভাবে বোধ হচ্চে, দিগম্বর যেন বল্‌ছেন, "মানময়ি। ক্ষমা কর। আর কষ্ট দিও না। চতুর্থ দ্বারে চতুর্থ মূর্ত্তি হরগৌরী! রম্য সিংহাসনে হরগৌরীর যুগল মুর্ত্তি। যেন আধ পুরুষ—আধ প্রকৃতির সুন্দর সম্মীলন। সংসারতত্ত্বের যেন দেদীপ্যমান উদা-হরণ। চমৎকার চিত্র! আধ হর—আধ গৌরী,—শ্বেতবর্ণ শম্ভু শরীরে গৌরাঙ্গ গৌরীর সম্মীলনে যেন হিমগিরীর উপর বালসূর্য্যের রশ্মী সম্পাত বোলে বোধ হয়। অর্দ্ধাংশ হাড় মালা অর্দ্ধাংশ মণিমালা, অর্দ্ধ জটা অর্দ্ধ কুণ্ডল, অর্দ্ধ—অস্থি অর্দ্ধ কুণ্ডল, চর্ম্ম অর্দ্ধ—বাস, অর্দ্ধ আবৃত—

অৰ্দ্ধ দিগবাস, অৰ্দ্ধ হর—অৰ্দ্ধ গৌরীর সম্মীলনে অপূৰ্ব্ব মাধুরী প্রকাশ কোচ্চে! অদূরে দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতে পশু পক্ষী পৰ্য্যন্ত মোহিত কোরেছেন, নিজে নিজেকে মোহিত কোরে প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হ'চ্চেন। শিল্পি! তুমি যেই হও, আমাদের তুমি অবশ্য নমস্য।

মন্দির মধ্যে রূপার ডেকঢাকা লিঙ্গমূৰ্ত্তি দর্শন কোল্লেম। গহ্বরের মধ্যে ফুল বিল্বপত্রে লিঙ্গমূর্ত্তি দেবদেব তারকেশ্বর বিরাজ কোচ্চেন। মূৰ্ত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত। তেমন কারুকার্য্য কিছুই নাই, কিন্তু সেই রূপেই ভক্তের প্রাণ মুগ্ধ। আমরা যথাবিধি পূজা সমাধা কোরে, মহান্তের দক্ষিণা দিয়ে, বিদায় হ'লেম।

মহান্তের পাণ্ডারা কিছু দুৰ্দ্ধর্ষ। তারা দীনদুঃখী বুঝে না, কাতরের দুঃখের কথা শুনে না, নিয়মিত দক্ষিণা (ইংরাজীতে টেক্স) নিয়ে তবে যাত্রী ছেড়ে দেয়। প্রাণের দায়ে দয়াময়ের কাছে এসে, যাত্রীরা নির্দ্দয় পাণ্ডাদের হাতে অনর্থক কষ্ট পেতে দেখে, বড় কষ্ট হ'লো।

যিনি দয়াময়, দীনের প্রভু, তাঁর পাণ্ডারা এমন অত্যাচারী?

আমরা সে দিন সেখানে কাটালেম, পর দিন প্রাতে আবার রেলপথে সেওড়াফুলি এলেম।

বৈদ্যনাথ। (১)

সে দিন সেওড়াফুলিতেই থাকা হ'লো। পরদিন সকালেই আবার ষ্টেশনে এসে বৈদ্যনাথ যাত্রা কোল্লেম। সে দিন গাড়ীতেই কাটালেম।

---

(১) বৈদ্যনাথের প্রার্থনা মন্ত্র,—
ওঁ ত্বদালোকমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
প্রসন্নো ভবমে শ্রীমন্ সদ্গতিং প্রতিং পদ্যতং
বৈদ্যনাথের ধ্যান,—
ওঁ অমল কমলকান্তি নীলবর্ণং সুবেশং।
কুচধর বরমাক্ষি পদ্মপত্রায়তেক্ষং।
সুরচিতমতি সৰ্ব্বং পঞ্চ চূড়ং কুমারং।
কুমতিদহনদক্ষং বৈদ্যনাথং ভজামি।
নমস্কার মন্ত্র,—ওঁ বৈদ্যনাথায় নমঃ।

তার পর দিন সকালে আমরা বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে পৌঁছিলেম। হাওড়া হ'তে বৈদ্যনাথ তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২৸৵০ মাত্র। এখান হ'তে দিওঘর পর্য্যন্ত শাখা রেলওয়ে নিজ বৈদ্যনাথ পৌঁছিতে আরও প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। বৈদ্যনাথ হ'তে দিওঘর ভাড়া ৵০ আনা। এই দিওঘরের নিকটেই বৈদ্য-নাথ। আগে এই শাখাপথ ছিল না বোলেই, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের ষ্টেশনের নাম বৈদ্যনাথ হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১২টা বেজে গেল। এখানে বেশ বাসা পাওয়া যায়। বাসা স্থির কোরে শিবগঙ্গায় স্নান কোরে এলেম। স্নানাদি শেষ হ'লে, দেবালয়ে প্রবেশ কোল্লেম। মন্দরটী দেখতে বড় চমৎ-কার। সারি সারি তিনটী মন্দির, সেই মন্দিরের মধ্যে বেশ বিস্তৃত চাঁদনী। মন্দির তিনটীর উপরে বড় বড় সোণার কলস, তার উপর আবার লাল রঙের পতাকা। দেখতে অতি সুন্দর। বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তি। দেখলে বেশ ভক্তি হয়। এখানে কাঙালীর তেমন ভিড় নাই। পুরোহিত সঙ্গে—যথাসাধ্য উপচারে পূজা শেষ কোল্লেম। এখানে যাত্রী বিস্তর। মন্দির সম্মুখে অসংখ্য যাত্রী অভীষ্টফল কামনায় দেবাদিদেবের নিকটে—অনাহারে শবের মত পোড়ে আছে। চারিদিকে শৈবগণ মহারোলে চাঁচা গলায় "হর হর বম্ বম্" ধ্বনিতে মন্দির কম্পিত কচ্ছে। সেই সব দৃশ্য দেখলে নিতান্ত পাষণ্ডের মনেও ভক্তির উদয় হয়। পূজা শেষ ক'রে, বাসায় আস্‌তে ৩টে বেজে গেল। আহারাদি হ'তে অপরাহ্ণ হ'য়ে গেল। সন্ধ্যার সময় বৈদ্যনাথের গ্রাম দেখতে বেরুলেম। গ্রামের সমৃদ্ধি কিছুই নাই, কেবল বৈদ্যনাথের জন্যই নিকটে যে যে দোকান আছে, তাতেই যা একটু জম্‌কাল দেখায়। নতুবা একে সহর বোলতে পারা যায় না।

বেড়িয়ে এসে, বৈদ্যনাথের আরতি দেখতে গেলেম। চারিদিকে নানা রকম বাজনা বাজছে, পাণ্ডারা সরুমোটা গলায় নানা ছাঁদে চীৎকার কোরে "হর হর বম্ বম্" বোলে প্রভুর নাম উচ্চারণ কোচ্চে। ধুনা, গুগগুলের গন্ধে মন্দির অন্ধকার,—অসংখ্য যাত্রীর বিষম ভিড়। সময় সময় মনে হ'লে, বিধর্ম্মের শত অত্যাচারে আজিও হিন্দুর কোন ক্ষতিই হয় নাই বোলে বোধ হয়।

আরতি দেখে, বেশ আনন্দিত হ'লেম। বৈদ্যনাথের চরণে প্রণাম কোরে

অন্যান্য দেবতা দর্শন ও প্রণাম কোরে বাসায় এলেম। ভোরেই এখানকার গাড়ী ছাড়ে। পাছে শীঘ্র ঘুম না ভাঙে এই ভেবে দোকানীর দেনা পাওনা চুকিয়ে, সকাল সকাল আহারাদি শেষ কোরে শুলেম্।

নিদ্রা হলো না। ভয়ানক মশার উপদ্রব। সমস্ত রাত বাইরে বোসে বোসে কাটালেম। অদূরে বৈদ্যনাথের মন্দিরে থেকে থেকে নিদ্রাবিমুখ ভক্তগণের মুখে "হর হর" ধ্বনি শুন্‌তে শুন্‌তে রাত কাটালেম। প্রভাত হতেই হাত মুখ ধুয়ে ষ্টেশনে এলেম! যথাসময়েই গাড়ীতে উঠে বৈদ্যনাথ ছাড়িলাম। এখানে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কোত্তেই হাওড়ার গাড়ী এসে পৌঁছিল। সেই গাড়ীতে উঠে একেবারে গয়া রওনা হলেম।

গয়া।

বৈদ্যনাথ হতে বাঁকিপুর ১৸১০ আনা দিয়ে টিকিট নেওয়া হলো। আমরা সন্ধ্যার সময় বাঁকিপুর পৌঁছিলাম। এখান হতে পাটনা গয়া ষ্টেট রেলওয়ের গাড়ী উপস্থিত ছিল। বাঁকিপুর হতে ৶০ আনা দিয়ে পুনপুন যাত্রা কোল্লেম। রাত ৮টার সময় আমরা পুন্‌পুনে পৌঁছিলেম। শুনে ছিলেম, এইখানে আগে পিণ্ডদান কোরে গয়া যাত্রা কোত্তে হয়। কাজেই এখানে এসে সে রাত্রি থাক্‌লেম। পুন্‌পুন অতি জঘন্য স্থান। বাসা খুঁজে নিতে ত প্রাণান্ত। সময় সময় যাত্রী আনতে দুই একজন লোক ষ্টেশনে আসে বটে, কিন্তু রাত্রে আর জনমানবের সংস্রব দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ষ্টেশনে নেমে রাত্রে বড় বিপদেই পোড়্‌লেম। কোথায় যাই, কোথায় বাজার ঘাট, কোথায় বাসা পাওয়া যায়, কিছুই জানি না। ভেবে চিন্তে একটি রেলের বাবুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! অনুগ্রহ কোরে যদি একটা কথা শুনেন, বড়ই বাধিত হই। আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথায় কিছু জানি না,—" বাবুটি আমার কথায় বাধা দিয়ে—এক চোকে অাজ্ঞার চাউনীতে চেয়ে বোল্লেন, "কি তোমার আবশ্যক, বল না। অত ভূমিকা শুনবার আমার Time নাই।" আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লেম, "আজ্ঞা না। তা বোলছি না। এখানে বাসা কোথায় পাওয়া যায়, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চি। বাবু আমার কথা না শুনেই চোলে যেতে যেতে বোল্লেন, "ঐদিকে দেখে

Fair premises gratify fools.

নেওগে যাও। আমি ত পাণ্ডা নই যে বাসা দেখিয়ে দিব।” বাবুর সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত হয়ে ষ্টেশন থেকে বেরুলেম। অনেক খুঁজে পেতে শেষে বাসা পেলেম। রাত্রি অনাহারেই কেটে গেল। সকালে উঠে স্নান কোরে একজন পুরোহিত নিয়ে গ্রামের প্রান্তভাগে ঠাকুর দেখ্‌তে গেলেম।

শারি শারি গোটাকত মন্দির। একটিতে রামসীতা, একটিতে একটি শিবলিঙ্গ, আর একটিতে একখানি পা আঁকা পাথর। পুরোহিত সেই পাথরের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাদের প্রণাম কোত্তে বোল্লেন। আমরা প্রণাম কোরে বোসলেম। পুরোহিত সমস্ত আয়োজন কোরে পিণ্ডদান করালেন। পুরোহিত বোল্লেন, “আসল গদাধরের পাদপদ্ম এই,—হরদয়াল মিশ্র নামক একজন ভক্তকে সন্তুষ্ট কর্ব্বার জন্য গয়াধামে আর একখানি পা অর্পণ কোরেছিলেন। এইখানে দক্ষিণ পদ, আর গয়ায় বাম পদ।” এই রকমে এখানকার তীর্থের অনেক মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কোল্লেন। শেষে পুরোহিত ঠাকুরকে বিদায় দিয়ে আমরা বাসায় এলেম।

ক দিনের পরিশ্রম, অনাহার, কষ্টের এক শেষ, তাই সে দিন আর বেরুলেম না। সকাল সকাল আহারাদি সেরে বিশ্রাম কোল্লেম। একটা কথা বোল্‌তে ভুলে গেছি। আমরা একজন হিন্দুস্থানীর বাড়ীতে আছি। হিন্দুস্থানী বড় ভদ্রলোক। আমাদের অতি যত্নে রেখেছিলেন, তাঁর মত লোক মেলা ভার।

সকালেই পুনপুন থেকে ॥৶০ আনা দিয়ে টিকিট কিনে সকালেই গিয়া রওনা হলেম। পুন্‌পুন্ হতে গয়া পর্য্যন্ত পথের দৃশ্য বড় মনোহর। চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় সেই পাহাড়ের গায়ে যে সব নদ নদী নির্গত হয়েছে, তার শোভা আবার আরও সুন্দর। দুর হতে বোধ হয়, যেন পাহাড়টিকে স্থির রাখ্‌বার জন্যে কে রূপার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা গয়া ষ্টেশনে এসে পৌছিলেম। বেলা তখন প্রায় ১২টা। ষ্টেশনের ১ মাইল পূর্ব্বে গয়া সহর। ষ্টেশনেই গয়ালীরা যাত্রী ধোত্তে আসে। আমরা তাদেরই একজনের সঙ্গে পদব্রজে তার বাড়ীতে এলেম। লোকটি বেশ খাতির যত্ন কোল্লে। একটা ছোট একতালা ঘর আমাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলে। আহারাদির আয়োজন হলো, আহারাদি আর বিশ্রাম কোত্তেই সে দিন কেটে গেল।

পরদিন গয়ালীর সঙ্গে সকলেই বেরুলেম। সহরের পূর্ব্বদিকে ফল্গুনদী। নদী সমান্য প্রশস্ত নয়, কিন্তু জল বড় গভীর নয়। দুই ধারে দুটি ক্ষীণ ধারা মাত্র প্রবাহিত হচ্চে। জল অতি পরিষ্কার। সেই কাচের মত পরিষ্কার জলের মধ্যে ছোট ছোট মাছের গতিবিধি অতি সুন্দর দেখা যায়। আমরা যথা নিয়মে মন্ত্র পাঠ (১) কোরে স্নান কোল্লেম। আবার একবার মন্ত্র পাঠ কোয়ে পুনরায় ডুব দেওয়া হলো। (২) পুনরায় আর একটি মন্ত্র (৩) পাঠ করে ডুব দেওয়া হলো। তৎপরে গোত্র ও নামাদি কোলে শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন কোল্লেম।

ফাল্গুর পূর্ব্বকূলে পাহাড়ের কাছে অনেকগুলি দেবালয় আছে, সীতা দেবী তার মধ্যে প্রধান। রাজা দশরথ হাত বাড়িয়ে এই খানেই পিণ্ড গ্রহণ কোরেছিলেন। এই জন্য সকলেই এখানে পূজা না দিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যথাসামর্থ পূজা দিয়ে সেদিন বাসায় ফিরে এলেম। এই

(১) মন্ত্র যথা,—আদ্যেত্যাদি সমস্তপিতৃণাং বিষ্ণুলোকাবাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তে ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।

(২) ওঁ নমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠয় দণ্ডিনে।
রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ॥
সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা গরিয়সী।
সন্নিধানী ভবত্বত্র তীর্থপাপ প্রণাশিনি॥
ওঁ সাগরস্বন নির্ঘোষ দণ্ড হস্তা সুরান্তক।
জগত স্রষ্টর্জ্জগদর্দ্দিন্নমামি ত্বাং সুরেশ্বর॥
তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র মহাকায় কাল্লান্ত দহনোপম।
ভৈরবায় নমস্তভ্য মনুজ্ঞাং দাতু মর্হসি॥

(৩) ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নান মাদৃতং।
পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তি মুক্তি প্রসিদ্ধয়ে॥

পিণ্ডদানের পর পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কোরে প্রণাম কোল্লেম। শেষে
ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহ।
তৃপ্তি মায়ান্তুপিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে।
মাতামহস্তৎ পিতা চ পিতা তস্যাপি তৃপ্যা তু।

ইত্যাদি পাঠ কোরে সপ্তকুলের পিণ্ডদান শেষে কোল্লেম। ক্রমে ক্রমে ষোড়শ পিণ্ডদান ও শ্রীষোড়শীও করা হলো।

ফাল্গুতীরে শ্রাদ্ধশান্তি সমাধা কোত্তেই সে দিন বেলা প্রায় ১১টা বেজে গেল। কাজেই আর কোথাও সে দিন যাওয়া হলো না। দেশে যাবার তেমন তাড়াও ত ছিল না। তীর্থভ্রমণের সঙ্গে পশ্চিম দেশে কিছু বেশী দিন থাকারও ইচ্ছা ছিল, তাই সে দিন ফিরে বাসায় এলেম।

পরদিন প্রাতে বিষ্ণুদর্শনে যাত্রা কোল্লেম। যে গদাধরের পাদপদ্মের জন্য গয়ার মাহাত্ম্য, সেইটি দেখাই সকলের আগে উচিত। তাই পরদিন সকালেই স্নান করে গয়ালীঠাকুরের সঙ্গে যাত্রা কোল্লেম। গদাধরের মন্দিরটি বড় সুন্দর। সমস্তই পাথরের গাঁথনী। চূড়ায় নানাবর্ণের নিসান। মন্দিরের সাম্‌নে বেশ বড় চাঁদনী। শত শত ভক্ত সেই চাঁদনীতে বোসে জপ কোচ্চে। মন্দিরের চারিদিকে চকবন্দী। সেই সব ছোট ছোট ঘরে অনেক দেবদেবী। এক একজন ধরাচূড়াপরা পূজরী সেই সব দেবদেবী আগুলে বোসে আছে। বিষ্ণু মন্দিরে অনেক লোক। শুন্‌লেম সময় সময় এত ভীড় হয় যে, একদিনে সকলের শ্রাদ্ধশান্তি কর্ব্বার সুবিধা হয় না। মন্দিরের চাঁদ্‌নীতে বোসে গয়ালী ঠাকুরেরা চোকবুজে ছত্রিশজাতির দান গ্রহণ কোচ্চেন।

আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কোরে বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন কোল্লেম। চার দিক রূপা মোড়া এক থাতের মধ্যে গদাধরের পদচিহ্ন রয়েছে, এ চিহ্ন ভাল কোরে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, সেই পাদপদ্ম কোন নিপুণ শিল্পির খোদা (৪) পাদপদ্ম এমন ভাবে খোদা যে, সহজে তা মানুষের খোদাই বোলে বুঝতে কষ্ট হয়। আমরা গয়ালী ঠাকুরের অনুমতি মতে সেই পাদপদ্মে পিণ্ডদান কোল্লেম। এখানে ভিখারীর তেমন পীড়াপীড়ি নাই কিন্তু নিতান্ত সহজে বেরিয়ে আসবারও উপায় নাই। আমরা শক্তি অনুসারে ভিক্ষুকদের বিদায় কোরে বাসায় এলেম। বাসায় আস্‌তে বেলা ১টা বেজে গেল। অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছিল। পাড়ে ঠাকুরের রান্না আতপ চাউলের অন্ন খেয়ে আরও কষ্ট বাড়লো। করি কি, উপায় নাই। তাই একরকম কোরে নাকে মুখে গুজে সেদিন কাটালেম।

(৪) কিন্তু ভাই সত্যকথা কহিতে ডরাই।
মানুষে খুদেছে চিহ্ন সন্দ তাতে নাই॥ তীর্থদর্পণ।

আমাদের বাসার প্রায় পাঁচ মাইল দূরে প্রেতপর্ব্বত। পরদিন স্নানাদি সেরে, ঘোড়ার গাড়িতে প্রেতপর্ব্বতে গেলেম। পিতৃপুরুষের সম্ভবতঃ প্রেতত্ব নাশ কর্ব্বার জন্য এই শীলায় পিণ্ডদান কোত্তে হয়। আমরা পাহাড়ের অতি নিকট পর্য্যন্ত গিয়ে গাড়ি হতে নামলেম। পাহাড়ের নীচে ঈশান কোণে ব্রহ্মকুণ্ড নামক ছোট একটী পুকুর আছে। গয়ালীর আদেশে আবার সেখানে স্নান ও তর্পণ করা হলো। তারপর সেই কুণ্ড হতে শ্রাদ্ধের জন্য জল নিয়ে আমরা উপরে উঠলেম। পাহাড়ে উঠিতে বড় কষ্ট হলো। সুখের বিষয়, পাহাড়ে উঠবার বেশ সিঁড়ি আছে। উপরে একটী ছোট মন্দিরের মধ্যে একখানি রূপার পাত মোড়া শীলা আছে। সেই শীলার নামই প্রেতশীলা। সেইখানে যথানিয়মে শ্রাদ্ধ করা হলো। মুষ্টি পরিমাণে তিল, ঘৃত, দধি, মধু আর ছাতু দিয়ে পিণ্ড প্রস্তত কোরে সেই প্রেত শীলায় নিক্ষেপ করা হলো। এখানেও ষোড়শ পিণ্ড ও স্ত্রীষোড়শী করা হলো। পিণ্ডদানকালে পিতৃপুরুষের যথাস্মরণ নাম উচ্চারণ কোরে, পিণ্ডদান ও তাঁদের মুক্তির প্রার্থনা করা হলো। (৫) তারপর যথাশক্তি দানাদি কোরে, আমরা পাহাড় হতে নেমে এলেম।

প্রেতশীলা পর্ব্বত এই পাহাড়ের সংলগ্ন। কিন্তু উপর দিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আমরা নেমে আবার আর এক সিঁড়ি দিয়ে প্রেতশীলায় উঠলেম। প্রেতশীলা প্রেতপর্ব্বতের মত উচ্চ নয়! এখানে উঠে আবার শ্রাদ্ধ শান্তি হলো। অধিকের মধ্যে একটী নূতন ভাঁড় ভাঙলেই হলো। গয়ালী ঠাকুর বোল্লেন, “এই ভাঁড়টী ভাঙলেই যদি কেউ পিতৃপুরুষের ভূত থাকে, তবে সে অক্ষয় স্বর্গলাভ কোর্ব্বে।” কথাটা শুনে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হলো। মনে বেশ জানি, প্রেতশীলা আর গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান কোল্লেই ফল লাভের কোন অন্তরায় ঘটে না। কেবল দেখবার জন্যই গয়ালী ঠাকুরের সকল বুজরুকী বুঝেও যেন বুঝচি না।

প্রেতশীলার নীচে ছোট ছোট দুটি-পুকুর। অতি অপরিষ্কার জল। পচাপাতার দুর্গন্ধে নিকটে যায়, কার সাধ্য? কিন্তু করি কি। গয়ালী প্রভু

(৫) ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তি মায়ান্তু শক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ॥

সেই হ্রদ দুটীর একটীকে প্রভাসহ্রদ আর একটীকে রামতীর্থ নামে ব্যাখ্যা কোল্লেন। মহাভারতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে—বিদ্যার দৌড় দেখিয়ে আরও বোল্লেন, "এই হ্রদের তীরে রাম পিতার শ্রাদ্ধ করেন, আর এই প্রভাসতীরে কৃষ্ণ যজ্ঞ করেন।" গয়ালী ঠাকুরের কথা কতদূর বিশ্বাস কোল্লেম, তা আমিই জানি। প্রকাশ্যে কোন কথা না বোলে, সেখানকার কার্য্য সমাধা কোল্লেম। গয়ালী ঠাকুর সেই পচা হ্রদে ডুব দেওয়াবার জন্যে অনেক জিদ কোল্লেন, আমরা কেবল সেই কথাটা রক্ষা কোত্তে পাল্লেম না। বাঙ্গালীর কুইনাইনের ধাতু বিগড়ে যেতে বড় বেশী সময় লাগে না। কেবল রামতীর্থ তীরে মন্ত্র পাঠ (৬) কোরে মাথায় একটু জলের ছিটা দিলেম মাত্র। তারপর রামচন্দ্রকে উদ্দেশে নমস্কার (৭) কোরে এবং প্রেতলোকের ও প্রভাসেশ্বরকে মনস্কার কোরে (৮) সেদিনকার মত বাসায় এলেম।

গয়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ব্রহ্মযোনী পর্ব্বত। পরদিন আমরা ব্রহ্ম-যোনী পর্ব্বত দেখতে গেলেম। এই পর্ব্বতে উঠবার বেশ সিঁড়ি আছে, কিন্তু তর্তগুলি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠা বড়ই কষ্টকর। নামবার সিঁড়ির সংখ্যা গণে ছিলেম, ৪৪০টী। আমরা ৩।৪ বার মাঝে মাঝে বোসে তারপর পর্ব্বতের উপরে উঠলেম। পাহাড়ের উপরে ব্রহ্মযোনী নামে একখানি পাথর আছে। এই পাথরের নীচে এমন একটী বাঁকা গর্ত্ত আছে যে, একজন লোক তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে গলে যেতে পারে। প্রবাদ আছে যে, একবার এই ব্রহ্মযোনী দিয়ে গোলতে পাল্লে, আর তার পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুনর্জ্জন্ম হোক আর নাই হোক, সে পাথরের মধ্যে দিয়ে গলা আমাদের সাহসে কুলাল না। পুনর্জ্জন্ম না হবার আশায় পাথর চাপা পোড়ে কি এ জন্মটাও নষ্ট কর্ব্বো?

---

(৬) ওঁ জন্মান্তরশতং সাগ্রং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতু রাম তীর্থাভিষেচনাৎ॥

(৭) ওঁ রাম রাম মহাবাহো দেবনাম ভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং॥

(৮) ওঁ আপস্তমসি দেবেশ জ্যোতিষাম্পতিরেবচ।
পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্ কায়কর্ম্মজং॥

Grasp all, lose all,

ব্রহ্মযোনীর নিকটেই ধর্ম্মারণ্য। আমরা ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ কোরে মাতঙ্গবাপীতে আচমন মন্ত্র পাঠ কোল্লেম। তার পর মাতঙ্গেশ্বর নামক শিব লিঙ্গের পূজা দিয়ে কৃতাঞ্জলী পুটে মন্ত্র উচ্চারণ কোরে প্রণাম কোল্লেম। (৯) মাতঙ্গবাপীর উত্তরে ব্রহ্মকূপ। তারপর আমরা সেখানে গেলেম। সেখানে স্নান তর্পণের বিধি ছিল, কিন্তু পিতৃকুল উদ্ধারের চেষ্টায় নিজে শুদ্ধ উদ্ধার হবার সম্ভাবনা জেনে, প্রত্যেক পচা পুকুরে স্নান করাটা রহিত কোরে দিলেম। কেবল আচমন আর মাথায় জলের ছিটা, এই ব্যবস্থা কোল্লেম। সেখানে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা হলো।

এস্থলে একটী কথা বোলে রাখি, সাধারণ তীর্থযাত্রীরা সকলেই যে এই স্থানে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করেন, তা নয়। প্রধান স্থানের কার্য্য গুলি শেষ কোল্লেই তীর্থফল লাভ হলো। আমরা কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই যেখানে একটু মাত্র দেবত্বের গন্ধ আছে, সেখানেও গেছি, এবং যথাবিধ কার্য্য সমাধা কোরেছি।

ব্রহ্মকূপের অতিদূরে আর একটী পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম ব্রহ্মসরসী। প্রবাদ, এই সরসীতে ব্রহ্মা একদিন স্নান করে স্বীয় অকথ্য পাপ হতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। এর তীরেই আবার ব্রহ্মযুপ। ব্রহ্মযুপ কেবল প্রদক্ষিণ কোল্লে দশাশ্বমেধ ফল লাভ। আমরা সাতবার প্রদক্ষিণ কোল্লেম। সেদিন এই পর্য্যন্ত।

পরদিন আমরা অক্ষয় বট দেখতে গেলেম। অক্ষয় বট একটী পুরাতন শাখাপত্রহীন বট গাছ। সেই গাছের অদূরে একটী পুকুর, নাম রুক্মিণী তীর্থ। জল অতি সামান্য। শুনলেম, আগে এ পুকুরের জল আরও খারাপ ছিল। একজন বড়দরের জমীদার পুকুরের পঙ্কোদ্ধার কোরে দিয়েছেন, তবুও জল বড় বেশী হয় নাই। (১০) আমরা সেই জলে আচমন কোরে তর্পণ কোরলেম। পুকুরের অধিকারী কড়ায় গণ্ডায়

(৯) ওঁ প্রমাণং দেবতাঃ সন্ত লোকপালশ্চ সাক্ষিণঃ।
ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥

(১০) সেটী রুক্মিণী তীর্থ ২
উঠে পিত্র মুখে জল দিলে।

আপন পাওনা গণ্ডা বুঝে নিলেন। আমরা তর্পণ সেরে মাটীর ঘটে জল নিয়ে অক্ষয়বটের ছায়ায় এলেম। এখানেও শ্রাদ্ধশান্তি কোত্তে হলো। পরে অক্ষয়বটকে পূজা ও নমস্কার করলেম। (১১) তারপর পিতৃগণের অক্ষয় স্বর্গ কামনায় অক্ষয়বটের নিকটে প্রার্থনা করা হলো। (১২) পরে কল্পনায় গদাধরকে অক্ষয়বটে সমানীত কোরে পূজা আর প্রার্থনা কোল্লেম। (১৩) তার পর গয়ালী ভোজন করান হলো। এখানে ভিক্ষুকের বড় উপদ্রব। চারিদিক হতে গয়ালী ঠাকুরের দল ফুলের মালায় হাত বেঁধে হাত পাতলেম। চোকের সামনে শতাবধি হাত দেখে প্রাণ ত উড়ে গেল। এতগুলি হাতের উপরে এক একটী চেপুয়া দিয়ে, তাড়াতাড়ি প্রস্থান কোল্লেম। পয়সার গন্ধে গাড়ীর পেছুনে পঙ্গপালের মত ভিক্ষুক আর বাজানদারেরা বাজাতে বাজাতে ছুটলো। আমাদের দেশে হলে, আমাদের সকলকে বিয়ের বর বলে মনে করতো। আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে বাসায় এলেম। ভিক্ষুকেরা নিরাশ হয়ে, সাধুভাষায় সাদর সম্ভাষণ কোত্তে কোত্তে প্রস্থান কোল্লে। পিতৃপুরুষের উদ্ধার কোত্তে এসে হাতে হাতে ফল পেলেম। করি কি, শ্রীহরি স্মরণে কাণে আঙ্গুল দিয়ে বাসায় এলেম।

তার পরদিনে সাবিত্রী তীর্থ দেখতে গেলেম। সাবিত্রীও একখানি শীলামাত্র। সেখানেও আগের মত শ্রাদ্ধ তর্পণ কোল্লেম। গয়ালীর মুখে শুনলেম, গয়ার তীর্থ সংখ্যা করা সহজ নয়। এখানে প্রায় শতাধিক তীর্থ দেখবার আছে। কিন্তু সে সব শুনতে যেমন, দেখে সে রকম তৃপ্তি-

আচমন করিতে খানিক ফেলেছিলাম গিলে—
মরি শেষে বসি করে।

তীর্থতর্পণ।

(১১) ওঁ একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া।
বালরূপ ধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগ শায়িনে॥

(১২) ওঁ সংসারবৃক্ষ শস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয় বটায় তে॥

ওঁ কল্পৌ মহেশ্বরা লোকা যেন তস্মাৎ গদাধরঃ।
লিঙ্গরূপো ভবেত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহং॥

লাভের উপায় নাই। কোন স্থানে এক যায়গায় সিন্দুর মাখা পাথর বাড়ীর এক কোণে রেখে প্রকাণ্ড এক নাম দিয়ে পয়সা আদায়ের ফন্দি করেছে, কোনখানে একটা গাছের গোড়া ঘিরে রেখে সেখানেও ঐ রকম কাণ্ড বাধিয়ে পয়সা রোজগার কোচ্চে। তাই সে সব দেখা আর তত আবশ্যক মনে কোল্লেম না।

যাত্রীদেরও সে সব দেখায় কোন কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। তবে নাম গুলি শুনে রাখা আবশ্যক বিবেচনা কোরে গয়ালীর কাছে একটা লম্বা চৌড়া ফর্দ্দ কোরে নিলেম। যে গুলি শুন্‌তে ভাল। (১৩) সে দিন বাসায় এলেম।

তার পর দিন রামশীলার পাহাড় দেখতে গেলেম। সহরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ফল্গুর ধারেই রামশীলা পর্ব্বত। পর্ব্বতে উঠবার জন্য আগে তেমন ভাল পথ ছিল না। শুন্‌লেম কয়েক বৎসর হলো, একজন ধনাঢ্য রাজা এই নূতন পাথরের সিঁড়ি কোরে দিয়েছেন। এ সিঁড়ি বেশ প্রশস্ত কিন্তু ৩৬০ সিড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠা কি সহজ কথা? আমরা অনেক কষ্টে উপরে উঠ্‌লেম। এখানকার দেবতার মধ্যে রাম ও মহাদেব প্রধান। সিঁড়ি ভাল, মন্দির ভাল, কিন্তু এখানে লোকের ভীড় কম। দুই একটি পয়সাতেই সকলে সন্তুষ্ট। আমরা যথাবিধি পূজা সেরে নেমে এলেম।

---

(১৩) গয়ালীঠাকুরের কাছে দেবতাদের ও দেবস্থানের যে একটা ফর্দ্দ কোরেছিলেম, পাঠকের তৃপ্তির জন্য সে গুলি এখানে উল্লেখ কোল্লেম। যথা,—গায়ত্রী, বৈতরণী, শিলা, লেলিহাণ, ভারতাশ্রম, মুণ্ডপৃষ্ঠ. আকাশ গঙ্গা, দেষনদী, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা. গদালোল, কোটী তীর্থ, রুক্মিণীকুণ্ড, দশাশ্বমেধ, হংসতীর্থ. মুণ্ডকুণ্ড. তারকেশ্বর, গয়াকুপ, গৃধ বট, বশিষ্ঠতীর্থ, বশিষ্ঠেশ্বর, ধেনুকারণ্য, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, কোটিশ্বর, চণ্ডিকা, চণ্ডীশ, গয়াগজ; গয়াদিত্য, ভরতাশ্রম, রামেশ্বর, উদ্যন্তকুণ্ড, অগস্ত্যপদ, গয়াকুমার, সোমকুণ্ড, কাকশীলা, বটেশ্বর, কপিলানদী, কপিলেশ্বর মাহেশ্বরীকুণ্ড, মঙ্গলা, গৌরী, প্রেতকুট, শিবপুর, মুলক্ষেত্র, মোক্ষেশ্বর, গণেশ, মুণ্ডেশ্বর, বায়ুতীর্থ. কোটীতীর্থ, অগ্নিধারা, স্বযুম্না, ক্ষেত্রপাল, বলভদ্র, পুরুষোত্তম, মাধব, মহালক্ষ্মী, কপর্দী, বিনায়ক, সোমনাথ, কার্ত্তিকেয়, সৌভাগ্যকুণ্ড। এ ছাড়া আরও অনেক দেবতা আছে। অনেক গাছ, পুকুর, শীলার নাম অনাবশ্যক বোধে লিখ্‌লেম না। তবে এর মধ্যে প্রধান গুলিও বাদ গেল না।

If you dont take paius Paius will take you.

আর এখানে থাকা নয়। এখানকার জলবায়ু বড় খারাপ, খাবারও বড় কষ্ট। বেশী দিন থাক্‌লে পীড়া হবার সম্ভাবনা। তাই এ কদিনের দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে—গয়ালীকে বিদায় কোরে—তাদের পাকা খাতায় নাম লিখিয়ে দিয়ে কালই রওনা হব স্থির কোল্লেম। এখানকার যে কার্য্য, তা ত একরকম শেষ হলো, তবে অনর্থক এমন অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার আবশ্যক কি?

কাশীযাত্রা।

পরদিন আহারাদি শেষ কোরে ১২টার সময় গয়া ষ্টেশনে এসে বাঁকী-পুর রওনা হলেম। এখানে অনেকক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করে। বাঁকীপুর হতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া ১৷৵১০ আনা মাত্র এখানে প্রায় একঘণ্টাকাল অপেক্ষা কোরে গাড়ী বদল কোরে মোগল সরাই যাত্রা কোল্লেম। সমস্ত রাত্রির পর সকালে আমরা মোগলসরাই এলেম। সেখান হতে ৴১০ টিকিট কিনে গঙ্গার রাজঘাট ষ্টেশনে এসে নাম্‌লেম। গঙ্গার এপার থেকে কাশীর শোভা অতি মনোহর। বড় বড় বাড়ী গঙ্গাতটে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা কাশীবাসীর পাপরাশি ধ্বংশ কর্ব্বার জন্য অর্দ্ধ চক্রাকারে কাশীকে বেষ্টন কোরে উত্তরবাহিনী হোয়ে প্রবাহিত হোচ্ছেন। থরে থরে পাথরের বাড়ীর পর পাথরের বাড়ী এমন ভাবে সাজানো, যে দেখলে নয়নমন পরিতৃপ্ত হয়। পাথরের সিঁড়ির পর সিঁড়ি গঙ্গার জল থেকে ক্রমে ক্রমে উপরে উঠেছে। দেখতে বড়ই চমৎকার। প্রথম দর্শনে কাশীর দৃশ্য দুর হতে দেখলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। আমরা ষ্টেশন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ীতে বাঙ্গালীটোলায় এলেম। বাঙ্গালী-যাত্রী সচরাচর বাঙ্গালীটোলাতেই বাসা করেন। আমারাও বাঙ্গালীটোলায় বাসা নিলেম। এখানে বাসা অতি সস্তা। দোতালা বাটী—তিনটী ঘর আমরা মাসিক ৪ টাকা মাত্র ভাড়ায় পেয়েছিলেম। আমাদের বাসা দশাশ্বমেধ ঘাটের ঠিক উপরে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার স্নিগ্ধ বায়ু আমাদের শান্তি দান

কত্তো। এমন পবিত্র স্থান আর নাই। তবে তীর্থস্থানের যে একটা অপবাদ আছে, সে অপবাদ দূর কর্ব্বার উপায় নাই। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে নিজে মন্দ, কেবল কাশী কেন, জগতের সব জায়গাতেই সে পাপের স্রোত দেখতে পায়। আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদের সে সব পাপের সমালোচনে প্রয়োজন কি?

আমরা সে দিন আর কোথাও বেরুলেম না। ক দিনের পরিশ্রম, তার উপর আবার গঙ্গায় আহারাদিরও কষ্ট হয়েছিল, এখানে এসে যেন একটু শান্তি পেলেম। পাঠক আমাদের পেটুকই বলুন আর যাই বলুন, খাদ্যসুখ এখানে বেশ। আজ অনেক দিনের পর ভাল কোরে আহারাদি সেরে সন্ধ্যার সময় গঙ্গাদর্শন ও সন্ধ্যাকালে গঙ্গার শোভা দেখে বাসায় ফিরে এলেম। সন্ধ্যার পরই ক্ষুধা অনুসারে জলযোগ কোরে নিদ্রায় অভিভূত হলেম। রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল, বোল্‌তে পাল্লেম না। সন্ধ্যার পরেই গঙ্গাপুত্র, ভাট প্রভৃতির সঙ্গে তীর্থের কর্ত্তব্যতা শুনে রেখেছি। তাদের সকালে আস্‌তে বোলে দিয়েছি। আর কোন গোলমাল নাই। তাই রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা গেলেম।

সকালে পাণ্ডা নিদ্রাভঙ্গ করালে। আমরা প্রত্যুষেই হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি পাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। বেলা তখন ৬টা. সর্ব্ব প্রথমে আমরা মণিকর্ণিকার ঘাটে গেলেম। গঙ্গা হোতে প্রায় ১০০ শত হাত দূরে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী পাঁকে পোরা,—এক কোণে অতি সামান্য জল। তাও আবার ফুল বিল্বপত্র পচে এমন দুর্গন্ধ ছেড়েছে যে, কাছে যায় কার সাধ্য? হিন্দুর অচলা ভক্তি! চারদিক বাধান, উপরে চন্দ্রাতপ, প্রায় কুড়িটি সিঁড়ি ভেঙে আমরা মণিকর্ণিকায় নামলেম নারিকেল, সোপারূপা ফুল বিল্বপত্র হাতে কোরে,—আমরা শারি শারি সোপানের উপর বোস‍্লেম। সেই জলেই আচমন হলো, মন্ত্র (২) পোড়ে সেই রজত কাঞ্চন গঙ্গাপুত্র

১ মণিকর্ণিকার ধ্যান,—

ওঁ চতুর্ভুজা বিশালাক্ষীস্ফুরত্তাম্র বিলোচনা।
পশ্চিমাভিমুখী নিত্যং প্রবদ্ধকর সংপুটা॥
ইন্দীবরবরবতীমালাং দধতী দক্ষিণে করে।
বরোদ্যতকরে সব্যে মাতুলিঙ্গ ফলং শুভং॥

ও যাত্রাওলাদের দিতে প্রকৃত নির্ম্মলসলিলা গঙ্গায় অবগাহন কোর্লেম। দেহ শীতল—মন পবিত্র হলো। তার পরেই বেণীমাধব দর্শন কোরলেম। এমন উচ্চস্থান আর দ্বিতীয় আছে কি না জানি না। বেণীমাধব যেন স্বর্গে আপন মন্দির তৈয়ারী কোরে বোসে আছেন। তিন শ সিড়ি ভাঙতে আমরা তিনবার বোস্‌লেম। অনেক কষ্টে মন্দিরে উঠে আমরা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কোল্লেম। সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূরে গেল। এমন মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে প্রকৃতই ভক্তি রসে হৃদয় আপ্লুত হয়। রাধাশ্যাম মূর্ত্তি পবিত্র—পবিত্রতার আধার। বেণীমাধব দর্শন কোরে তাঁর ধ্বজায় উঠলেম। এ ধ্বজা এত উচ্চ যে, নিম্নে চতুঃক্রোশী কাশীখানি যেন একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বোলে বোধ হয়। লোক জন যেন ছোট ছোট পাখী কি বামন বোলে বিবেচনা হয়। নীচের দিকে চাইলে প্রাণ উড়ে যায়।

তারপর কাশীর জীবন্ত বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলাম। নরকের মধ্যে স্বর্গের স্বর্গীয় মূর্ত্তি আবির্ভাব। জীর্ণ গৃহ—উঠানে গোময় জলের ঢেউ খেলচে, দুর্গন্ধে নিকটে যায় কার সাধ্য? সেই গোবর চোনার সাগরে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ ভাসছেন। উঠানের উত্তর পার্শ্বে একখানি "কৃষ্ণ গৃহ" বা আঁধার ঘর। ঘরখানি এমন অন্ধকার যে, তাতে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা প্রদীপ জ্বোলছে! ঘরের পশ্চিমের দিকে আট হাত পরিসর একটুখানি স্থান ঘেরা, তারই মধ্যে দিগম্বর ত্রৈলঙ্গস্বামী আসীন রয়েছেন। মুখে কথা নাই, দৃষ্টির কোন লক্ষ্য নাই, ভঙ্গির কোন ভাব নাই, ব্যাবহারের কোন অর্থ নাই, নিষ্কাম নিষ্কলঙ্কমূর্ত্তি উপবিষ্ট আছেন। আমরা ভক্তিভাবে প্রণত হলেম (৩)

কুমারী রূপিণী নিত্যং দ্বাদশ বার্ষিকী।
শুদ্ধ স্ফটীককান্তিশ্চ সুনীলস্নিগ্ধমূর্দ্ধজা।
জিত প্রবালমাণিক্য রমণীয়রদচ্ছদা।
প্রত্যুগ্রকেতকীপুষ্প লসদ্ধর্ম্মিলমস্তকা।
সর্ব্বাঙ্গ মুক্তাভরণা চন্দ্রকান্তং শুকাবৃতা।
পুণ্ডরীকময়ীং মালাং স শ্রীকাং বিভ্রতী হৃদি।
ধ্যাতব্যাহস্তেন রূপেন মুমুক্ষুভি রহর্নিশং।
নির্ব্বাণ লক্ষ্মী ভবণং শ্রীমতী মণিকর্ণিকা।

(৩) অল্পদিন হলো, মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী সমাধী প্রাপ্ত হয়েছেন।

Ill weeds grow apace.

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বাড়ী হতে কালভৈরবের বাড়ী এলেম। কালভৈরবের প্রকৃত মূর্ত্তি বুঝ্‌তে পাল্লেম না। মূর্ত্তির কতক সোণা আর কতক ফুল বিল্লপত্র দিয়ে ঢাকা। আমরা যেতেই পাণ্ডাজী মাথার উপর একটু ভস্ম ছিটিয়ে দিয়ে হাতে একগাছা কাল সুতা বেঁধে দিলেন। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, কালভৈর ' কাশীর দ্বারপাল। ভস্ম দিয়ে চিহ্ন কোরে দিলেন যে, দ্বারপাল আমাদের দ্বার-ছেড়ে দিলেন, আর কাল সুতার উদ্দেশ্য আর কখন কোন রোগ বালাই হবে না। আমরা এই অদ্ভুত পেটেণ্ট ঔষধের নাম শুনে হাস্য সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না। যথাশক্তি দক্ষিণা ও প্রণামী দিয়ে বেরুতেই একজন লোক তাড়াতাড়ি এসে গাছা ময়ুরের পাখার ঝাঁটা দিয়ে দমাদম্ ঘা কতক বসিয়ে দিলে। ডেকে বোল্লে "বাবু আপনার আপদ্ বালাই সব ঝাঁটার আগায় বার কোল্লেম, বিদায় করুন।" ঝাঁটা দিয়ে "বিষ ঝাড়ার" কথা চলিত কথায় দেশের মেয়েদের মুখে শুন্‌তে পাই, আর আজ ঝাঁটা মেরে রোগবালাই ঝাড়া দেখলেম। ঝাঁটা খেয়ে যথাসাধ্য পণ দিয়ে ঝাঁটাধারীকে বিদায় কোল্লেম।

আস্‌তে আস্‌তে রাধাশ্যাম, গঙ্গা, পার্ব্বতী, রামসীতা, পাতালেশ্বর দেখলেম। পাতালেশ্বর পাতালের মধ্যে আছেন। প্রায় বিশ ত্রিশ হাত নীচে এক ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড শীলামূর্ত্তি বিরাজ কোচ্চেন। সিড়ি অতি জীর্ণ। কাজেই প্রাণের ভয়ে আর নেমে দেখা হ'ল না। উপর হতে দেখে নীচে প্রণামী দিলেম। পাতালেশ্বরের পাণ্ডা সেই পাতালেই বোসেছিলেন, উপর হতে পয়সা পোড়তে দেখে বেরিয়ে এসে পয়সাগুলি সংগ্রহ কোল্লেন। পাতালেশ্বর দেখে নৃসিংহ দেখলেম। প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কোরে আমরা কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরকে দেখতে চোল্লেম।

প্রথমে জ্ঞানবাপী দেখলেম। দেখলেম, একটী চাঁদনীর মধ্যে বড় গোচের একটি ইঁদারা। ইঁদারার উপরে এক শিক দিয়ে মোড়া। তার উপর আবার কাপড় দেওয়া। লোকে ফুলজল সেই কাপড়ের উপর ঢেলে দিচ্চে। জলটা নীচে পোঁড়চে, ফুলগুলি কাপড়েই থাক্‌চে। বেশী ফুল জল পোড়লে জল শীঘ্র শীঘ্র পোচে উঠে বোলে উপরে কাপড় দেওয়া হয়েছে। চাদনীর পূর্ব্বদিকে এক প্রকাণ্ড লাল রংয়ের পাথরের ষাঁড়। উচ্চ আট হাত আর লম্বা প্রায় ১২ হাতের কম নয়। ষাঁড় বোসে আছে। চাঁদনীর

উত্তরদিকে এক প্রকাণ্ড মন্দির। জ্ঞানবাপী বিশ্বেশ্বরকুণ্ড আর ঐ মন্দিরের আগে বিশ্বেশ্বর বিরাজ কোচ্ছেন। দুর্দ্দান্ত কালাপাহাড় হিন্দু দেব-দেবীর শনি হয়ে যখন ভারতের দেবতাকুল নির্ম্মূল করে, সেই সময় বিশ্বেশ্বর অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে, প্রাণের দায়ে জ্ঞানবাপীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। মন্দিরের সে দিকটা এখনো খানিক ভাঙা আছে।

জ্ঞানবাপীর পাশে উচ্চ মঞ্চের উপরে বোসে জ্ঞানবাপীর অধিকারী জল বিক্রয় কোচ্চেন। বড় বড় ঘড়াপূর্ণ জল আর তাতে ছোট একটী পালা ফেলা আছে। যাত্রীরা এক একটী পয়সা দিয়ে, সেই জল কিনে আচমন কোচ্চে। আমরাও কিনলেম, আচমন কোল্লেম, কিন্তু সত্য কথা বোলতে কি, আচমন কোরে ভক্তির উদয় না হয়ে বমীর উদয় হলো। তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিত্যাগ কোরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে এলেম।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির নিয়ে অনেক স্থানে অনেক তর্ক, বিতর্ক, অনেক প্রবাদ প্রসঙ্গ শুনেছি, আজ চাক্ষুস দেখে, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কোল্লেম। মন্দিরটী তেমন বড় নয়। চাঁদনী মন্দিরের সঙ্গেই জোড়া। মন্দিরের এক পাশের দিকে এক রূপামোড়া কুণ্ডের মধ্যে ফুলজলের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে, লিঙ্গরূপী ভগবান বিশ্বেশ্বর বিরাজ কোচ্চেন। আমরা স্পর্শ কোরে মনের আনন্দে পূজা কোল্লেম। মন্ত্র যা জানি, তাই বোলেই পূজা কোল্লেম। বড় তৃপ্তি বোধ হলো। প্রাণের মধ্যে যেন শান্তি পেলেম। আমরা মায়ার নাগপাশে বদ্ধ জীব, তবুও যেন মনে হলো এ সুখের কাছে সংসারের সুখ নগণ্য। এই খানেই দিবারাত্রি বোসে পূজা করি।

বেরিয়ে এসে মন্দিরের বাহ্যদৃশ্য দেখলেম। মন্দিরের তিন রং। নীচে কাল রংয়ের পাথরে গাঁথা, তার উপর খানিকটা পাথর, আর অর্দ্ধাংশ পাকা সোণার পাতে মোড়া। কতকালের মন্দির, কতকালের সোণার পাত মোড়া, কত ঝড় বৃষ্টি তার উপর দিয়ে চোলে গেছে, কিন্তু সোণার রং একটুও নষ্ট হয় নাই, কি কোথাও একটু অপরিষ্কার হয় নাই। যতদিন যাচ্চে, সোণার রং ততই যেন উজ্জ্বল হচ্চে। শুনলেম, মহারাজ রণজিৎ সিংহের এ কীর্ত্তি। রণজিতের দেবভক্তির এ দৃষ্টান্ত চুড়ান্ত। দুঃখের বিষয় তাঁর অকাল নিধনে মন্দিরের অপরার্দ্ধ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই আছে। মনে কোল্লেম, বঙ্গের ধনপতিগণ যদি তিল তিল পরিমাণে এই কীর্ত্তির সঙ্গে যোগ

দেন, তা হলে এ অপরিসমাপ্ত মন্দির সমাপ্ত হতে কতদিন লাগে? কিন্তু সে দেবভক্তি এখন কি আর আছে?

শুনেছিলেম, কাশীতে ষাঁড়ের বড় উপদ্রব। (১) এখন চোকে দেখে বিশ্বাস হলো। বিশ্বেশ্বরের বড় বড় মোটা মোটা ষাঁড় সেইগুলি সে ভিড়ের মধ্যে দলে দলে বিচরণ কোচ্চে। ফুল বিল্বপত্র চোক বুজে চর্ব্বণ কোচ্চে। বাগে পেলে বিক্রম দেখাতে ক্রটী কোচ্চে না।

আমরা বিশ্বেশ্বর মন্দির হতে অন্নপূর্ণার বাড়ী গেলেম। সেখানেও লোকের ভিড়। প্রকাণ্ড মন্দির—অনেকটা ঘরের মত। সাম্‌নে চাঁদনী। প্রবেশ দ্বারে দেখলেম, চক্ষুহীন, নাসাহীন, বাঁকামুখো এক অতি বুড়ো ষাঁড় দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বারপালের কাজ কোচ্চে। যে যাত্রী খাবার দিচ্চে, ষণ্ডরাজ তাকেই ঢুকতে দিচ্চে, আর যে তা না দিচ্চে, তাকে তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে তাড়িয়ে দিচ্চে। আমরা ব্যাপার দেখে যথাসাধ্য কর দিয়ে, দ্বারীর হাতে অব্যাহতি পেলেম। চাঁদনীতে বড় বড় ঘণ্টা বাঁধা। আমরা ঘণ্টা নেড়ে জগতজননীকে আমাদের আগমন সংবাদ দিলেম। তারপর মন্দিরে প্রবেশ কোরে, স্বর্ণময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি পূজা কোল্লেম। অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দেশের শীতলা ঠাকুরাণীর মতই প্রায় দেখতে। মুখখানিই কেবল বাইরে, আর সমস্ত শরীর ফুল আর কাপড় দিয়া ঢাকা! পাশেই হাতা, থালা, বেড়ী ইত্যাদি রাঁধবার যন্ত্র সব পোড়ে আছে। সাধারণ যাত্রীরা সেই মূর্ত্তি দেখেই, তৃপ্ত হয়ে পূজা অর্চ্চনা কোচ্চে, সেই মূর্ত্তি দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাচ্চে। আমাদের জানা ছিল, প্রকৃত মূর্ত্তি গোপন কোরে, সাধারণকে এই স্বর্ণময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিই দেখিয়ে থাকে। (২) এই

(১) রা—ষাঁর সিঁড়ি আর সন্ন্যাসীর ডরে।
শশব্যস্ত হয় যারা কাশী বাস করে॥
তীর্থ দর্পণ।

(২) পেয়ে তুষ্ট হয়ে পুরোহিতগণ,
অন্নদার নিজমূর্ত্তি করায় দর্শন,—
প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি দেবালয়ের গায়,
সাধারণ লোকে তাহা দেখিতে না পায়।
তীর্থ দর্পণ।

কথায় বিশ্বাস ছিল বোলে, পাণ্ডার কাছে সে প্রস্তাব কোল্লেম। পাণ্ডাজী প্রথমে অস্বীকার কোল্লেন। শেষে বেশী অর্থের প্রলোভনে দরজা বন্ধ কোরে প্রকৃত প্রস্তরময়ী মুর্ত্তি দেখালেন। এ মূর্ত্তি অপূর্ব্ব! যেমন গঠন পারিপাট্য, তেমনি সুদৃশ্য। দেখলে আপনা হইতেই মনের মধ্যে ভক্তির উদয় হয়। অন্নপূর্ণার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখে, পাণ্ডাজীকে অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিয়ে, আমরা অন্নপূর্ণা বাড়ী হতে বেরুলেম।

অন্নপূর্ণার বাড়ীর পশ্চিম দিকে ধুন্ধুগণেশ মুর্ত্তি। প্রবাদ আছে, এঁকে দর্শন না কোল্লে, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের দর্শনের ফল হয় না। ধুন্ধুগণেশের সর্ব্বাঙ্গ রূপার পাতে মোড়া। তেমন জাঁক জমক নাই, মন্দির চাদনী নাই, সামান্য একখানি একতালা ঘরের মধ্যে ধুন্ধুগণেশ বিরাজ কোচ্চেন। লোকজন তেমন বেশী নাই, একজন পাণ্ডা পয়সার কাঁড়ী সাম্‌নে কোরে বোসে আছেন। আমরা যথাবিধি প্রণামী দিলেম। অন্নপূর্ণার দ্বোরেই অসংখ্য ভিখারী ঘিরে দাঁড়াতো। আমরা কড়ি আর চাল নিয়ে গিয়েছিলেম, তাই সকলকে দান করা হলো। কিন্তু এত ভিখারী দেখতে দেখতে জমা হলো যে, পাঁচমণ চাল আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। তখন যথাসাধ্য অর্থদান কোরে, বাসায় আস্‌তে চেষ্টা কোল্লেম। সে ভিখারীর বেড় ভেদ করা কি সহজ কথা? অনুপায় হোয়ে তুজন ষণ্ডাগোছের পাণ্ডাকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে--তাদেরই সাহায্যে বাসায় এলেম। তবু বাসার দরজা পর্য্যন্ত সে জের গেল। সেদিন আর কোথাও যাওয়া হলো না। আমার দৈনিক পুস্তিকাতে তারিখ লিখে রাখলেম,—১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

পরদিন দুর্গাবাড়ী দেখতে গেলেম। দুর্গাবাড়ী কাশীর দক্ষিণ প্রান্তে। যেখানে জীবের মৃত্যু হলে মোক্ষ হয়, যেখানকার জীবের কর্ণে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করেন, সেখানে কি জীবহত্যা হতে পারে? তাই দুর্গাবাড়ী কাশীর চতুঃক্রোশী সীমার (১) বাইরে অবস্থিত। আমরা

(১) পুরাণ বিশেষে এই কাশীর সীমাসম্বন্ধে মত ভেদ দেখা যায়।

বরণাচপ্যসিশ্চৈব দ্বেনদ্যৌ সুরবল্লভে।

অন্তরালে তয়োঃ ক্ষেত্রং ভূমাবপি বিশেষতঃ।

একার ৵০ আনা মাত্র ভাড়া দিয়ে দুর্গাবাড়ীতে পৌছিম। দুর্গাবাড়ীতে প্রকাণ্ড চাঁদনী, চারিদিকে চক মিলান ঘর। সেখানে ভক্তগণ দুলে দুলে চণ্ডিপাঠ কোচ্চেন। চাঁদনীর চাতাল সমস্তই মার্ব্বেল পাথরের। আমরা বড় শ্রান্ত হয়েছিলেম। দেবীর দিকে মুখ কোরে সেই পরিষ্কার মার্ব্বেলের উপর বোসতে সমস্ত শ্রান্তি দূর হলো। দেবীর মূর্ত্তি অতি পরিপাটি! শ্রান্তিদূর কোরে আমরা পূজার আয়োজন কোল্লেম, যথাশক্তি পূজা দিয়ে—বাসায় ফিরে এলেম। এখানে বড় বানরের উপদ্রব!

এখানে আমরা প্রায় একমাস কাল থাকি। প্রত্যহই চারিদিকে যে সব দেবতা আছেন, সে সব দেখি। আবশ্যক মত পূজা দিই। কাশীর যে দিকে চাইবে সেইদিকেই শিবলিঙ্গ। কাত হয়ে, চিৎ হয়ে, গৌরী পট্ট হীন, মস্তক হীন, গাদা গাদা শিব যেখানে সেখানে পোড়ে আছেন, তাতেই লোকের সংস্কার, কাশীতে মোলেই জীব শিবলিঙ্গ হয়। (২) একদিন ব্যাসকাশী দর্শন কোরে এলেম। ব্যাসকাশী কাশীর পূর্ব্বদক্ষিণ প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে। এখানেও অনেক দেবতা আছেন। ব্যাসদেবের বরের প্রমাণ এখানে হাতে হাতে দেখলেম। এত গাধা এক যায়গায় দেখা এক প্রকার অসম্ভব।

একদিন একজন কাশীর প্রধান পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি অনেক কথার পর কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের সঙ্গে যে সমস্ত কথা বোল্লেন, পাঠকের তৃপ্তির জন্য সেই সময়েই সেগুলি লিখে রেখেছিলেম।

তিনি বোল্লেন, "বেদজ্ঞেরা কাশীর রমণীয়তা দেখে ইহা আনন্দকানন

দ্বিযোজনন্তু তৎ ক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিম তঃ স্থিতং।
অর্দ্ধ যোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরত স্থিতং॥
ব্রহ্ম পুরাণ।

পঞ্চক্রোশাত্মিকা কাশী ব্রহ্মতেজোময়িশ্রিতা।
অর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকা দেবী দৃশ্যতে সর্ব্বজ্ঞাদিভিঃ॥
যোগিনী তন্ত্র।

(২) মোলে জীব, হয় শিব, যৎক্ষণে তৎক্ষণে।
রসসাগর।

Judge uot of two evcts,

বোলে বর্ণনা কোরেছেন। (৩) কাশীকে শিব কখনই পরিত্যাগ করেন না। এখানে অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত পাপ দেহাবশেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভস্ম হয়। (৪) যিনি ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা, গুর্ব্বাঙ্গনাগমন, ভিন্নবৃত্তি, অপহরণাদি পাপবিবর্জ্জিত এবং সংসাররজ্জু বিমুক্ত, তিনিই কাশীবাসী হয়েন। যে সকল কাশীবাসী নিত্যানন্দ বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন, তাঁহারা অবিবাদে মোক্ষ লাভ করেন। (৫) ব্রহ্মহত্যাকারীও অবিমুক্ত যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে সন্দেহ নাই। (৬) এই কাশতি একদিন উপবাস করিলে শতবর্ষের ফল, মহাদেব স্মরণে ও পূজনে জন্ম মৃত্যু রহিত ও সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়। (৭) স্বয়ং তারকব্রহ্ম জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করেন। (৮) কাশীক্ষেত্রে যাত্রা ও পরিভ্রমণ করিলে তাহার আর

---

(৩) আনন্দকাননং তস্মাৎ গীয়তে বেদ বাদিভিঃ।

যোগিনী তন্ত্র।

(৪) বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষ্যতেন কদাচন।
মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদ্ অবিমুক্তমিদং স্মৃতং।
জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎক্ষণাৎ ভস্মসাদ্ভবেৎ।

মৎস্যপুরাণ।

(৫) ব্রহ্মঘ্ন গোঘ্ন গুরুতল্পগভিন্নবৃত্ত্যান্যাসাপহারিকুহকাদি নিষিদ্ধ বৃত্তিঃ।
সংসারভূতদৃঢ়পাশবিমুক্ত দেহে বারানসিং যমপুরীং সমুপৈতি লোকঃ।

স্কন্দপুরাণ।

(৬) ব্রহ্মহা যোভিগচ্ছেত্তু অবিমুক্তং কদাচনং।
তস্য ক্ষেত্রসা মহাত্ম্যা ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে।

লিঙ্গপুরাণ।

(৭) একাহন্তমুপবাস যঃ করোতি যশঃস্বিনি।
ফলম্বর্ষশতস্যোহলভতে তৎ পরায়ণঃ।
অবিমুক্তে মহাদেবমর্চ্চয়ন্তি স্মরন্তি যে।
সর্ব্বপাপ বিমুক্তাস্তে সন্তিষ্ঠন্ত্যাহজরামরাঃ।

ব্রহ্মপুরাণ।

(৮) ঈশ্বরোবাচ,—দদামি পরমং ব্রহ্ম মুমুর্ষোঃ কর্ণগোচরে।

ব্রহ্মপুরাণ।

Learn to creep before you run,

আর পুনর্জ্জন্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। (৯) কাশীদর্শন সামান্য পুণ্যের বিষয় নহে।" এরকম অনেক প্রমাণ দিলেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর বোল্লেম না।

কাশীর জল বেশ, খাদ্য দ্রব্য অতি সস্তা, আর সব সময় পাওয়া যায়। প্রকৃতই এখানে অন্নপূর্ণা বিরাজ কোচ্চেন। এখানে অনাহারে কেহ থাকে না। অসংখ্য লোক মধ্যে মধ্যে দরিদ্রদের বস্ত্রদান কোচ্চেন কাশীতে কারও কিছুর অভাব নাই। সকলেরই হাসি মাখা মুখ। সকলেরই বেশ স্ফূর্ত্তি।

তবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কি কোন্ জিনিস্ আছে? যখন চাঁদে কলঙ্ক গোলাপে কাঁটা বিধাতার সৃষ্টি, তখন সেই বিধাতারই আবার পৃথক সৃষ্টি কি হতে পারে? এখানে একদল বদমায়েস লোক আছে। তাদের ভয় না করে এমন লোক কাশীতে নাই। স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস কমিস্যনর পর্য্যন্ত নাকি তাদের ভয়ে ভীত। কথাটা সত্য বলে আমাদের বিশ্বাসও আছে। এরা যাত্রীদের উপর সময় সময় বড় অত্যাচার করে। গবর্ণমেণ্ট যে এর একটা প্রতিবিধান কোর্ব্বেন, সেটা অবশ্যই আশা করা যেতে পারে।

আমরা আর এখানে থাকবো না। কল্যই প্রয়াগ যাত্রা কোর্ব্বো স্থির কোল্লেম। দেনা পাওনা সব চুকিয়ে দিলেম। এতদিনের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁদের কাছে বিদায় চেয়ে এলেম। স্বীকার কোল্লেম, আবার যদি কখন বিশ্বেশ্বর ডাকেন, তা হলে সেই সময় আবার দেখা হবে। বাবুরা দুঃখিত হয়ে বিদায় দিলেন। আমরা আহারাদি সেরে শয়ন কোল্লেম। কালই রওনা হব, স্থির রইল।

প্রয়াগ।

আজ ১৭ আষাঢ়। যথাসময়ে আহারাদি সেরে আমরা কাশী হতে আবার শাখাপথে মোগলসরাই এলেম। মোগলসরাই হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত

(৯)। শ্রদ্ধয়া প্রত্যহং যাত্রাঃ কর্ত্তব্যাঃ ক্ষেত্রবাসিঃ ভিঃ॥
কাশীখণ্ড।

টিকিট নিয়ে রওনা হলেম। টিকিটের দাম ১।০ আনা মাত্র। যেতেও বড় অধিক সময় লাগে না। ৫ ঘণ্টাতেই পৌছান যায়। আমরা ভোর ৪টার সময় এলাহাবাদ পৌছিলেম। এখান হতে ১৲ টাকা ভাড়ায় ঘো ড়ার গাড়ী কোরে বেণীঘাটে গেলেম। লোকালয় ত্যাগ কোরে ক্রমে এক বিস্তৃত মাঠের মধ্যে এসে পোড়লেম। গাড়ী দুর্গের নিকটে এসে থামলো। দেখলেম, নিকটেই গঙ্গা। গঙ্গার এখানকার শোভা বড় উদাসময়! গঙ্গা বালুকাময় বক্ষঃ বিস্তার কোরে কুলকুল রবে দক্ষিণবাহিনী হয়েছেন। যমুনা আর এক কুল দিয়ে পূর্ব্ব মুখে চোলেছেন। যমুনার জল কাচের ধার গঙ্গার জল একটু অপরিস্কার। যে স্থানে এই গঙ্গাযমুনা সম্মিলিত হয়েছেন, সেই স্থানই তীর্থ।—সেই স্থানই পবিত্র। আমরা নৌকা কোরে সেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে মস্তকমুণ্ডন কোল্লেম। আগে সকলের মাথায় দিব্য বাঁকা তেড়ী শোভা পাচ্চিল। মস্তক মুণ্ডন কোরে এক এক শিখা রাখা হলো। বায়ুর হিল্লেলে ফুরফুরে চৈতন ফুর ফুর কোত্তে লাগলো। পরস্পর পর-স্পরের মাথার দিকে চেয়ে হেসে আর বাঁচি না। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হলো। নৌকা প্রথমে ॥০ আনা ভাড়া হয়েছিল। ভাড়া দেবার সময় নানা ভাবে মাজী ১।১০ আনার ফর্দ্দ দাখিল কোল্লে। আমরা অনেক তর্ক কোল্লেম। বাঙ্গালাদেশের লোক, জুয়াচোরকে পুলিসে দিবার ভয় দেখালেম। সব বিফল হলো। ঝালছাতুখোর মেড়ুয়ারা পুলিসকে গ্রাহ্য করে না। পুলিসের নামে একবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলো। করি কি, বাধ্য হয়ে ১।১০ আনাই দিলেম। তারপর পাণ্ডা বিদায়। এখানকার পাণ্ডারা বড় দুর্ব্বৃত্ত, জোর কোরে পয়সা আদায় কোত্তে চায়। (১) তখন দায়ে পোড়েছি, ক্ষুধায়ও জঠরানল জ্বোলে

(১) * * * *

কার সাধ্য এটে উটে প্রয়াগী পাণ্ডারে।
ভক্তিমান যাত্রী হলে পাকা কলা পায়।
ছলে বলে কৌশলে তাহার মাথা খায়॥
কেহ আছে কুঁড়ে বেঁধে কেহ ছত্র তলে।
বসিয়াছে তীর্থকাক পাণ্ডারা সকলে॥

উঠেছে, তাড়াতাড়ি বাসা নিতে পাল্লে বাঁচি, কাজেই পয়সার দিকে লক্ষ্য না কোরে যেনতেন প্রকারে পাণ্ডাদের জিদ্ বজায় রেখে প্রস্থান কল্লেম।

এখানে বাসা পাওয়া যায় কিন্তু বাসার এত দালাল, তারা কাপড় ধোরে তল্পীতাল্পা গাঁট্‌রী ব্যাগ ধোরে এত টানাটানি করে যে, বাসা নেওয়া ত পরের কথা, পালাবার পথ পাওয়া যায় না। আমরা বেছে বেছে অপেক্ষা-কৃত একজন ভালমানুষ দেখে তারই বাসায় বাসা নিলেম। তখন আর রাঁধবার অবসর হলো না। জলযোগ কোরে বিশ্রাম কোল্লেম। খাবার এক রকম সবই পাওয়া যায়, তবে বালির এত উপদ্রব যে, যা খাবে তার সঙ্গেই খাবারের সিকি বালি উদরস্থ হবে। আমরা অনেক বাদ্‌সাদ দিয়ে যৎ-সামান্য মাত্র খেয়ে জল খেলেম। শরীর বড় অসুস্থ, শুতে পাল্লে বাঁচি, তখন কি আর রাঁধবার বাড়বার ইচ্ছা হয়? আমাদের সঙ্গের পাঁড়েঠাকুরও বড় কাতর হয়েছে। তার প্রতি আর অন্যায় জুলুম না কোরে একেবারে রাত্রেই আহারাদির বন্দোবস্ত করা গেল।

পরদিন যমুনায় স্নান কোরে অক্ষয়বট দেখ্‌তে গেলেম। অক্ষয়বট প্রায় যমুনার তটে—একটু দূরে। একটি অন্ধকূপ গর্ত্তের মধ্যে বহুকালের জীর্ণ একখানি শুক্‌নো কাঠ গাড়া রয়েছে। তারই নাম অক্ষয়বট। সে স্থান এত অন্ধকার যে, দিনের বেলাতে আলো না নিয়ে যাওয়া যায় না। করি কি, পাণ্ডার সঙ্গে আমরাও আলো নিয়ে অক্ষয়বটের নিকটে গেলেম। সেখানে যথানিয়মে তিনটি মন্ত্র পাঠ কোরে পূজা ও প্রার্থনা কোল্লেম। (১)

গেড়েছে অসংখ্য ধ্বজা চড়ার উপর।
বায়ুর হিল্লোলে দোলে করে কর্ কর্॥

*　　*　　*

দেখিয়া তীর্থের কাণ্ড হেসে হেসে মরি।
জলে স্থলে ঠাকুর বেড়ায় ভিক্ষা করি॥

তীর্থ দর্পণ।

। ১। প্রথম মন্ত্র যথা,—

ওঁ সংসারবৃক্ষশাস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয় বটায়তে॥

অক্ষয়বটের পাণ্ডাজী আমাদের ফর্সা কাপড় দেখে অনেক বায়না কোল্লেন, অনেক পণ হাঁকলেন, আমরা ক্ষমতা অনুসারে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়ে বিদায় হলেম।

এলাহাবাদ একটি বিস্তৃত সহর। এখানে কালেজ, হইকোর্ট, অন্যান্য আদালাত, দেখ্‌বার অনেক জিনিস আছে। দুর্গই কিন্তু সে সকলের প্রধান। যেখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম, তার তটেই দুর্গ অবস্থিত। এলাহাবাদ ষ্টেশন হতে দুর্গ অনেক দূরে। দুর্গ অনেক দিনের, কিন্তু গাঁথুনী বেশ মজবুত আর ভিতরের কাণ্ডকারখানাও বড় চমৎকার। পূর্ব্বদিকের দোতলার উপর হতে মাটীর মধ্যে ঘর কটী দেখতে বড় চমৎকার। গড়ের নিকটে লোকের বসতি নাই। গড়েও লোক নাই, কেবল রক্ষার জন্য সামান্য কয়েক জন রক্ষী নিযুক্ত আছে মাত্র। এখানে হিন্দু অপেক্ষা যবনের বসতীই অধিক, কেবল গঙ্গার তীরে কতকগুলি হিন্দুর বসতি আছে মাত্র। লোকালয়ের মধ্যে হিন্দুদেবদেবীর চিহ্নমাত্র নাই। কেবল দিনরাত অসংখ্য মস্‌জিদ, সীয়া ভুম্নির আজানে শব্দিত হচ্চে মাত্র।

এলাহাব্যদের গড় ইত্যাদি দেখতে ৭ দিন কেটে গেল। আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহযাত্রীদের অন্যান্য তীর্থ দর্শনে বেশী ইচ্ছা দেখে অগত্যা আমাকে বাধ্য হয়ে তাদের মতে মত দিতে হল। মনে থাক্‌লো, যাবার সময় আর একবার এলাহাবাদ আর কাশী হয়ে যাব। একথা তখন প্রকাশ কোল্লেম না। পর দিনই আমরা রওনা হলেম।

আগরা ও তাজমহল।

তীর্থ যাত্রার পূর্ব্বে পুষ্কর দেখবার বড় বাসনা ছিল। এখন পুষ্কর্ দেখতেই বেরুলেম। যদি ঐ দিকেই যেতে হলো,—তবে সামান্য খরচের জন্য

দ্বিতীয় মন্ত্র যথা,—

ওঁ নামাঽব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয় প্রাণতে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যাগ্রোধায় নমোনমঃ॥

তৃতীয় মন্ত্র যথা,—

ওঁ অমরস্তং মহাকল্পে হয়েশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোস্তুতে॥

আমরা দুর্গ আর তাজমহল না দেখি কেম? যে তাজমহলের নাম হিমালয় পর্ব্বত হতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যার নাম না জানে এমন লোক হিন্দু মুসলমানের মধ্যে খুজে পাওয়া যায় না, যে তাজমহলই দেখ্‌তে কত লোক কত দেশ হতে আসে, আমরা একটু কষ্ট স্বীকার করে—সামান্য অর্থ ব্যয় করে সেই তাজমহল—সেই আগরা দুর্গ না দেখি কেন? আমরা সকলেই আগরা ও তাজমহল দেখ্‌তে সংকল্প কোল্লেম।

এলাহাবাদ হতে তন্দুলা জংশন পর্য্যন্ত ৩৵১৫ দিয়ে টিকিট কেনা গেল। সমস্ত রাতদিন গাড়ী চোলে সকালেই আমরা তন্দুলা ষ্টেশনে পৌছিলেম। এখান হতে আগরা শাখা পথে আগরার টিকিট নেওয়া হলো। টিকিটের দাম ৶১৫ মাত্র। তন্দুলা জংশনেই আগরার গাড়ী প্রস্তুত ছিল, সেই গাড়ীতে উঠে আমরা আগরা রওনা হলেম।

গাড়ী হত্তে উৎসাহিত নয়নে তাজের শোভা দূর হতে দেখ্‌তে লাগলেম। তাজের সেই অপূর্ব্ব শোভা দূর হতে দেখেই মন মোহিত হলো। মনের এমন গতি যে, আর যেন বিলম্ব সয় না। প্রাণ তাজ দেখবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

বেলা ১০টার সময় গাড়ী আগরায় পৌছিল। তাড়াতাড়ি নেমে টিকিট দিয়ে বেরিয়ে এলেম। আগরা সহরে মধ্যে একটি বাড়ী ভাড়া পেলেম। সেইখানে সে দিন থাকা হলো।

পর দিন সকাল সকাল আহারাদি সেরে তাজমহল দেখতে চোল্লেম। আমাদের গাড়ী তাজমহলের সামনে এসে দাঁড়ালো। তাজমহল যমুনার কুলেই অবস্থিত। আমরা গাড়ী থেকে নেমে তাজমহলে প্রবেশ কল্লেম। যা দেখলেম, তা বর্ণনার বিষয় নয়।—সে দৃশ্য মনের মধ্যে অনুভব শক্তি দ্বারাও ধারণা কোত্তে পারা যায় না। মন কেবল শোভার সাগরে ডুবে থাকে।

প্রথম ফটক ছাড়ালেই সন্মুখে একতালা চকবন্দী ঘর। কতগুলি ঘর, তার সংখ্যা হয় না। এই অসংখ্য ঘর লোকজনের সমাগম হীনতায় জন্য যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে। দেখলে ভয় হয়—প্রাণের মধ্যে উদাস ভাব দেখা যায়। ফটকের দুপাশে কয়েকখানি দোকান আছে। দোকানে নানারকম নক্সা করা পাথরের বাসন, ফরাসী আয়না প্রভৃতি সাজান আছে,

তাজ দর্শনে যারা হায়, তারাই এ সব কেনে। প্রথম মহল ছাড়ালেই গোলাকার অতি উচ্চ গুম্বজ। তার উপর বড় বড় ঘর খিলানের উপর খাড়া আছে। প্রত্যেক ঘরের সাম্‌নে বারান্দা। সেই ঘরের শ্রেণীর মধ্যেই সিংহদ্বার। সিংহদ্বার এত উচ্চ যে, দুইজন লোক গজারোহণে পাশাপাশি হয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে। সেই সিংহদ্বার পার হয়ে দেখলেম, ফুলের বাগান। আগে যা ছিল অনুভবে বুঝ্‌লেম, তার সিকির সিকিও নাই, তবুও যা আছে, তার তুলনা হয় না। কত কৌশলে এঁকে বেঁকে কেয়ারীতে কেয়ারীতে ফুলের রং মিল কোরে সাজান হয়েছে, তা মনে হলে চমৎকৃত হতে হয়। বাগানের মধ্যে সরু সরু পয়ঃপ্রণালী। পয়ঃপ্রণালীতে ফুলের ছায়া পোড়ে জল পর্য্যন্ত নানা রংঙে যেন রঞ্জিত হয়েছে। বিলাসিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ইহাতেই প্রকাশ পায়।

এই সব পয়ঃপ্রণালীর পশ্চিমদিকে তাজ। আমরা সেই দিকে গেলেম। দেখলেম, অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। উপরে উঠে দেখলেম,—তাজ সমস্তই অতি পরিষ্কার শ্বেত প্রস্তরে! একটি প্রশস্ত চাতালের উপর তাজ গঠিত হয়েছে। চাতালের চার কোণে চারিটি থাম। তারই উপরে তাজ। এই স্থানে নবাব সাহজাহান সস্ত্রীক সমাহিত আছে। আরবী অক্ষরে সেই স্থানে সমস্ত বিবরণ লেখা আছে। আমরা চক্ষু থাকৃতেও অন্ধ, কি লেখা আছে বুঝলেম না। তাজের গঠননৈপুণ্য এত চমৎকার যে, এতকালের তাজ যেন নূতন বোলে বোধ হচ্চে। কবরের গায়ে এত কারীকুরী, এত লতাবুটি কাটা যে, সে গুলিতে যেন বহুমূল্য পাথর বসান আছে বোলে ভ্রম হয়। কবরের চারধারে লোহার রেল দিয়ে ঘেরা। কবরের চারিদিকে আজও শারি শারি মমের বাতি জ্বোলছে। প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুকাল হতে চিরদিন হাজার এক বাতি জ্বলে। কথাটা তত সত্য না হলেও আনক গুলি যে বাতি জ্বলে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

তাজ দেখতে সন্ধ্যা হলো। অগত্যা অতি অনিচ্ছায় বেরিয়ে আস্‌তে হলো, কিন্তু মন হতে তাজের দৃশ্য আর ঘুচলো না। বোধ হয়, এ জীবনে আর ভুলতে পার্ব্বোও না।

আগরা দুর্গ।

এটিও দেখবার জিনিস। প্রবাদ, এমন সুকৌশল দুর্গ আর কোথাও নাই। সেই প্রবাদের উপর নির্ভর কোরে আজ আমরা আবার সকালে সকালে আহারাদি সেরে দুর্গে প্রবেশ কোল্লেম। সম্রাট আকবর এই দুর্গ নির্ম্মাণ কোরে বসতি করেন। দুর্গ যমুনার কুলেই অবস্থিত। দুর্গের চারিদিকে গভীর গড়। গড়ের পারে প্রাচীর। আবার গড়খাই, তারপরে আবার পাথরের উচ্চ প্রাচীরে প্রায় এক ক্রোশ ঘেরা। ফটক পশ্চিমদিকে। গড়খাইয়ের উপর কাঠের সেতু, সেই সেতুর উপর দিয়ে গড়ের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে হয়। সেতু শূন্যের উপর। শিকল দিয়ে বাঁধা। এমন কৌশলে বাঁধা যে, শত্রুপক্ষ তার উপর দিয়ে পার হতে চেষ্টা কোল্লে, একবারে গভীর খাতে পোড়ে প্রাণ হারাবে। প্রাচীরের গায়ে স্থানে স্থানে গহ্বর কাটা। সমর কালে সেই গহ্বরের মুখে কামান বোসে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ কোত্তো। ফটক পার হতে অনেক সময় লাগলো। ঘুরে ফিরে—ফিরে ঘুরে ফটক ছাড়িয়ে আমরা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। ফটকে কয়েকজন পাহারা আছে মাত্র। আর ভিতরে গোরা সৈন্য আছে।

দেখতে দেখতে আমরা "নবাব মহলে" প্রবেশ কোল্লেম। সম্মুখেই "দরবারখানা"। দরবারখানা এত প্রশস্ত যে, তাতে তিন হাজার লোক অতি সুখে বোস্‌তে পারে। শুন্‌লেম, আকবর এইখানে বোসে দরবার কোত্তেন। দরবারখানার পশ্চাতেই "বেগম মহল" বেগম মহল অতি সুদৃশ্য। চত্বরে চত্বরে ঘরের শ্রেণী, মাঝখানে পরিপাটী ফুলের বাগান। ফুলের বাগাগের মধ্যে মধ্যে নানাবিধ চিত্রযুক্ত জলের ফোয়ারা। "গোসল খানা" বেগম মহলেরই একটি অংশ। ছোট ছোট ঘর শারি শারি। এক পাশ দিয়ে পয়ঃপ্রণালী কুলুকুলু রবে যাতায়াত কোচ্চে। এ জল যমুনার। কলের বলে এ জল আপনি আসে আপনি যায়। অবার ঘরে ঘরে কোথায় গরম হয়ে কোথায় শীতল হয়ে আসে। যে ঘরে যে দিন যেমন জলের দরকার, সে ঘরের জল তেমনি ভাবে যায়। পয়ঃপ্রণালীর নিম্নে সাদা পাথর, জল যেন তক তক কোচ্চে। স্থানে স্থানে সেই সাদা পাথরের উপর ছোট ছোট মাছ আঁকা। জলের তরঙ্গে সেই মাছগুলি

Misfortunes come by forties,

যেন সজীব বোলে বোধ হয়। কতজন সেই মাছ ধোত্তে গিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়েন। আমাদেরও প্রথমে সত্য বোলে বোধ হয়েছিল। শেষে দেখলেম সজীব নয়, কারিগরের অসামান্য নৈপুণ্য। ধন্য যবনের বিলাসিতা! এই জন্যই লোকে যবনকেই বিলাসিতার জন্মদাতা বোলে অভিহিত করে।

গোসল খানা দেখে আমরা "মতি মস্‌জিদ্" দেখতে গেলেম। মস্‌জিদ অতি প্রকাণ্ড! সমস্তই শ্বেত পাথরের। অতি সুন্দর। মতি মস্‌জিদ দেখে আমরা "নাট্যশালা" দেখতে গেলেম। এক অতি প্রকাণ্ড চাঁদনী। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় তছরী, নানারকম ফুলের তোড়া, পাথরের রকম রকম মূর্ত্তি সব সাজান আছে। এইখানে বেগমেরা নাচ শিখতেন। সম্রাটের শয়ন মন্দির দেখে মনে ভাবলেম, হায়! দুরন্ত কাল এই সব যাঁর, তিনি এখন কোথায়? বেগম নাই, সম্রাট নাই, দাস দাসী নাই, বাঁদী খোজা নাই, আছে কেবল প্রকাণ্ড বাড়ী। জনশূন্য খাঁ খাঁ কচ্চে। তার পর "আজব ঘর" দেখলেম। কলিকাতার যাদুঘরের তুলনায় এ ঘর সমতুল্য না হলেও দেখবার জিনিস আজও বিস্তর আছে। এ সব জিনিসের যত্ন নাই, সঙ্গের যবন রক্ষকের মুখে শুন্‌লেম, ভাল ভাল অনেক জিনিস ইংরাজ বাহাদুর নিয়ে গেছেন। হায় ইংরাজ এ সব জিনিস নিয়ে তোমাদের ধনাগার পূর্ণ কোরে কেন আকবরের নাম লোপ কোত্তে চেষ্টা কোরেছে? এই সব জিনিস তোমাদের তুলনায় ত সামান্য, তবে সে সকলে উপর কেন লোভ প্রকাশ কোরেছ?

তার পর "খানা মহল।" এখানে বোসে সম্রাট খানা খেতেন। খানার সময় আর কারও যাবার হুকুম ছিল না। শ্বেতপাথরের শারি শারি টেবিল। তারই উপর খানা সজ্জিত থাকতো। সম্রাট ইচ্ছামত তা হতে নিয়ে আহার কোত্তেন। এক জনের জন্য সে সকল প্রস্তুত হতো, শুন্তে পাই, তাতে হাজার এক বাঁদীর উদর পূর্ণ হতো। তার পর দেখলেম, "হাওয়া খানা।" মধ্যে এক বিস্তৃত কাল পাথরের (১) সিংহাসন, সেইখানে

(১) খোলাছাদে কষ্টি পাথরের সিংহাসনে।
বসিতেন সম্রাট লইয়া নারীগণে॥
তীর্থদর্পণ।

More haste the worse speed,

সম্রাট বেগমদের নিয়ে হাওয়া খেতেন। হাওয়া খানার ছাত নাই, এখান হতে যমুনার লহরীমালা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। হাওয়াখানা ত্যাগ কোরে আমরা "রোসনাই" খানা দেখলেম। এখানে রোসনাইয়ের সব আসবাব আছে। শ্বেতপ্রস্তরের, রূপার সোণার, নানা ধরণের দীপ, দীপাধার আজও রয়েছে। বড় বড় জালা শূন্য পড়ে আছে। শুন্‌লেম, সে সকল গন্ধতৈলে পূর্ণ থাকতো। এই সকল দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আর এদিকে নীচে উপর কোরে শরীরও বড় অবসন্ন হয়েছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেম। যবন রক্ষীকে সন্তুষ্ট কোরে আমরা গড় পার হয়ে সদর রাস্তায় এলেম। সেখানে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তাতে উঠে আমরা বাসায় এলেম। বাসায় আসতে রাত ৮টা বাজলো। আমাদের খাবার তৈয়ার ছিল, আহারাদি সেরে শুয়ে পোড়লেম। এক ঘুমেই রাত প্রভাত।

জয়পুর।

আগরায় আর এক সপ্তাহ কাল থেকে আমরা জয়পুর রওনা হলেম। আগরা হতে রাজপুতনা মলয়া ষ্টেট রেলওয়ের আগরা শাখা পথ জয়পুর। আমরা ২৲ টাকা দিয়ে টিকিট নিয়ে ৫ ঘণ্টায় জয়পুর ষ্টেশনে পৌঁছিলেম।

জয়পুরে বাসার অভাব নাই। সকলেই অতি ভদ্র। ভগবানের কৃপায় এখানে কারও কিছু অভাব নাই। সকলেই প্রফুল্ল,—সকলেরই মুখে হাসি। সকলেই সম্পন্ন। একজন মাড়য়ারী যত্ন কোরে তাঁর নিজবাড়ীতে আমাদের বাসা দিলেন। সেখানে অতি যত্নে আমরা থাকিলেম্। মাড়য়ারীর গুণের কথা শতমুখে বর্ণনা করেও ফুরায় না। তাঁর পরিবারেরা সকলেই অকপটে আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কোত্তেন। মাড়য়ারীর বৃদ্ধা মাতা ও একাদশ বর্ষিয় কন্যা যমুনা আমাদের পরিচার্য্যায় নিযুক্ত ছিল। আমাদের চাকর বামন যেন নবাব হয়ে উঠলো। তাদের কোন পরিশ্রমই ছিল না। মাড়য়ারী অতি সম্পন্ন। টাকার অভাব নাই, মানের অভাব নাই, তবুও যেন অতি বিনীত। যেন মাটীর মানুষ। আমাদেদ দেশে এত বিষয় থাকলে গর্ব্বে তার মাটীতে পা তো পোড়তো না। সন্ধ্যার সময় মাড়য়ারী যুবকেরা আমাদের

কাছে এসে আমাদের দেশের গল্প শুনতেন। আচার ব্যবহার, রীতি নীতি শুনতেন। বাবুজী বাবুজী বোলে সকলেই আদর কোত্তেন। আমরা যে অতি বিচক্ষণ, অতি বিদ্বান, অতি সাধু, তাঁদের মনে যেন এইটেই দৃঢ় বিশ্বাস। হায়! সে সুখের কথা মনে হলে আজিও প্রাণ কাঁদে। এত দেশ বেড়ালেম, কিন্তু জয়পুরের কথা আজও মনে লেগে আছে। মাড়-য়ারী পরিবারের অকৃত্রিম যত্ন, অপরিসীম ঋণ আমরা শতজীবনেও পরিশোধ কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

জয়পুরের প্রধান দেবতা গোবিন্দজী। প্রবাদ, যবণের ভয়ে তাঁকে বৃন্দাবন হতে জয়পুরে আনা হয়। যবনের ভয়ে পাণ্ডাগণ গোবিন্দজীকে জয়পুরে এনেই যে নিশ্চিন্ত হলেন, তাও নয়। তাঁকে মানসিংহের অন্তঃপুরে অতি গোপনে রাখা হলো। গোবিন্দজী এলেন, কিন্তু রাধারণীকে আনা ভার হলো। তাঁকে পাণ্ডারা অতি কষ্টে এক বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে। তার পর কেরালীতে গোপীনাথ ও রাধারণীমকে এনে পাণ্ডারা স্থাপিত করে। এই মূর্ত্তি আদি। তারপর যদুবংশের একমাত্র বংশধর বজ্র বৃন্দাবনে এসে নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করান।

আমরা জয়পুর নগরে প্রবেশ কোত্তেই নগরপাল এসে প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমরা তীর্থযাত্রী শুনে নগরপাল ছেড়ে দিলে। আর একটু যেতে না যেতে আর একদল লোক এসে আমাদের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমরা সত্য পরিচয় দিলেম। তারা সে কথা বিশ্বাস কোল্লে না। আমায় বোল্লে, কর না দিলে নগর প্রবেশ কোত্তে দেবো না। আমরা অনেক রকম বুঝালেম। কিছুতেই সে কথা কাণে তুললে না। শেষে একটি টাকা ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিলে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের তল্পী তাল্লা সব খুলে দেখাতে হয়েছিল। বাসা খুঁজতেই মাড়য়ারীর বাড়ী বাসা পাই। সেদিন সেখানে থেকে পরদিন গোবিন্দজী দেখতে গেলেম। মাড়য়ারী আমাদের সঙ্গে কোরে সমাদরে নিয়ে গেলেন।

দেখলেম, শ্রীগোবিন্দ আর গোপীনাথের মন্দির বেশী দূরে নয়। শ্রীগোবিন্দ রাজপুরীর এক অংশে অবস্থিত আর গোপীনাথ বাইরে। দুই দেবতারই তুল্য সম্মান। আমরা যথাসাধ্য পুজা আর প্রত্যেক দেবস্থানে

২৲ টাকা দিয়ে শিরপা নিলেম, শিরপা অর্থে লালরঙে ছোপান একখানি গামছা। এখানে একটি রহস্য আছে।

রাজা দেবসেবার জন্য একটি রাজ্যের আয় নির্দ্দিষ্ট দেবতার নামে, লেখা পড়া কোরে দিয়ে প্রত্যেক দেবতার একজন সেবাইত নিযুক্ত কোরে দিয়েছেন। শুন্‌লেম, সেই আয়েই দেবসেবা, অতিথিশালা, আর সেবাইতদের বাবুগিরি বেশ চলবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই অর্থে কেবল সেবাইতরাই পেটমোটা কোচ্চেন।

অতিথি সেবার নাম নাই। যাত্রীর মধ্যে যারা প্রসাদ পেতে ইচ্ছা করে, তাদের রীতিমত অর্থ দিতে হয়। ভেটের টাকা না দিলে দেবদর্শনেরও ক্ষমতা নাই। দরজায় এক খাজাঞ্চী আছেন। তাঁর কাছে টাকা জমা দিয়ে রসিদ স্বরূপ সেই রাঙা গামছা না নিলে দরজা খোলা পাওয়া যায় না। যারা রিক্তহস্তে কেবল মাত্র ভক্তির বলে দেবতা দর্শনে যায়, তাদের ভাগ্যে কেবল অর্দ্ধচন্দ্রই লাভ হয় দেখলেম। এসব ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম। একজন দরিদ্র ভিক্ষা কোরে খেতে খেতে বৃন্দাবন হতে এখানে এসেছে। বাসনা, মনের সাধে একবার গোবিন্দের চরণ দর্শন কোর্ব্বে। তার একটী পয়সারও সঙ্গতি নাই। সে সজলনয়নে খাজাঞ্চী সাহেবের কাছে কেঁদে কেঁদে নিজের দুঃখের কথা জানাচ্চে, নির্দ্দয় সে কথায় কর্ণপাতও কোচ্চে না। অনেক কাঁদা কাটিতে দয়ার পরিবর্ত্তে খাজাঞ্চীর ক্রোধের উদয় হলো। তিনি বজ্রগম্ভীরে হুকুম দিলেন, "কৈ হ্যায় রে? বাহার কর দেও বাঞ্চৎকো।" তখনি একজন চোগোঁপ্পা দ্বারওয়ান এসে সত্য সত্যই সেই ক্ষীণজীবিকে ধোরে হড় হড় কোরে টেনে বাইরে এনে ফেল্লে। আমরা এ ঘটনা চোকের সামনে দেখলেম। আমার বন্ধু বড় ধাতচড়া লোক। তিনি ত রেগে তিনটে হলেন। আমি গতিক খারাপ দেখে তাঁকে নিরস্ত কোরে রাখলেম। হতভাগা গোবিন্দ দর্শনে হতাশ হোয়ে—চোকের জলে বুক ভাসিয়ে গোবিন্দের দিকে দাঁড়িয়ে যোড় হাতে বোল্লে, "হা মধুসূদন! তুমিই এর বিচার করো। এই বোলে সে কাঁদতে কাঁদতে চোলে গেল।

দেবস্থানের এ কলঙ্ক আর যাবার নয়। যেখানে দেবতা, যেখানে তীর্থ, সেই খানেই পাণ্ডার অত্যাচার! ধর্ম্মস্থানে লোকে ধর্ম্ম কোত্তে

আসে, আর এই সকল হতভাগারা ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মের বিনিময়ে কেবল অধর্ম্ম কেনে? এদের কি পরকালের ভয় আছে? হতভাগারা মনে করে, দেবতা তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। যে এ সম্পত্তি ভোগ কোত্তে আসবে, বিনা পণে তাকে কেন ভোগ কোত্তে দেব? কিন্তু একবার ভ্রমেও ভাবে না যে, এ ধন তার বাবার নয়। দেবতাও দেবতার উত্তরাধিকারী জীব মাত্রেরই এ ধনের সমান অধিকার।

আমরা দেবদর্শন কোরে ১টার সময় বাসায় এলেম। সেদিনকার কার্য্য এই পর্য্যন্ত। ইচ্ছা ছিল, সেই দিনই সহর দেখে আসি, কিন্তু কদিন থেকে শরীর বড় অসুস্থ হয়েছে, তাই ইচ্ছা থাক্‌লেও বেড়াতে কি দেখতে শুনতে বড় কষ্ট হচ্চে। সেদিন আর বেরুলেম না।

জয়পুর অতি প্রাচীন সহর। ধোত্তে গেলে, হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী। সহরের যে দিকে চাও, সেই দিকেই পাথরের বড় বড় বাড়ী। মধ্যে মধ্যে বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার দুপাশে কলিকাতার মত ফুটপাত আছে, জলের কল আছে, গ্যাসের আলো আছে। রাস্তায় লোক জনের গতিবিধি সর্ব্বদাই। গাড়ী ঘোড়ার রপ্তানী বেশ আছে।

এখানকার প্রধান বাজার—চক। এখানেই নানা রকম দ্রব্য বিক্রয় হয়। সেখানে শ্বেত পাথরের খেলানা, রেকাবী, হুকা, বাটী, পাথর, থালা, গ্লাস প্রভৃতি তৈয়ার হয়, জয়পুরের অধিবাসীরা সেই স্থানের নাম রেখেছে, "সেলাবত খানা।" এখানে ফিরিওয়ালারও অভাব নাই। নামাবলী রং করা কাপড়, রাজপুত রাজগণের তছবী, জুতা, মেরজায় প্রভৃতি নিয়ে গলি গলি ফিরিওয়ালারা বেচে বেড়াচ্চে।

এখানে খাদ্যদ্রব্য বড় সস্তা। দুগ্ধ, ঘৃত, শর, মাখন, ক্ষীর, ক্ষীরের নানাবিধ মিষ্টান্ন, ময়দা, তরকারী সবই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেলে না, কেবল মাছ আর মাংস। এখানকার লোকের মাংস খেলে তার জাত যায় সুতরাং কেউ খায় না। যা কেউ খায় না, তাই বা পাওয়া যাবে কেন?

এখানে স্কুল, ডাক্তার খানা, আর্টস্কুল, মোহনবাগ, সখের বাগান প্রভৃতি দেখে তৃপ্তিলাভ করা যায়। নগরের চারিদিক পাহাড়ে বেড়া। বিধাতা শত্রুপক্ষের হাত হতে রক্ষা কর্ব্বার জন্যই যেন জয়পুরকে পর্ব্বতের

প্রাচীর মধ্যে স্থাপিত কোরেছেন। পর্ব্বতের উপর দুর্গ, এখানে অনেক সিপাহী থাকে। এই পাহাড় শ্রেণীর সব উচু স্থানের নাম গলদা! এর উপরে কয়েকটী দেবালয় আছে। পাহাড়ে উঠতে সুবিধামত রাস্তা নাই, বিশেষ যে রাস্তা আছে তাও তখন সংস্কার হচ্চে, সুতরাং সে সকল দেবতা দর্শন হলো না।

রাজপুরী দেখতে সাধ গেল, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হওয়া নিতান্ত ত সহজ কথা নয়। মনের কথা মাড়য়ারীকে জানালেম। রাজার দেওয়ানের সঙ্গে তাঁর বড় বন্ধুত্ব। তিনি একদিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে রাজপুরী দেখাতে গেলেন। রাজপুরীর গঠন পুরাতন হলেও দেখবার জিনিস বটে। রাজার তোষাখানা, হাওদাখানা, পীলখানা, কোতয়ালী, মালখানা, খাজনা খানা, দেওয়ানী, হকিতকী সকলেই দেখা হলো। রাজকায়দা বটে। পূর্ব্বে স্বাধীন হিন্দুরাজগণ যে কিরূপ ভাবে রাজকার্য্য দেখতেন, কিরূপ ব্যবস্থায় প্রজা পালন হতো, তার অনেক প্রমাণ পেলেম। রাজপরিবার যে স্থানে থাকে তাহার নাম "অন্দর মহল।" সেস্থানে প্রবেশ কর্ব্বার অধিকার কি? গ্রীষ্মকালে রাজা যে বাড়ীতে বাস করেন, তার নাম "হাওয়া খানা।" হাওয়া খানা রাজবাড়ীর বাইরে। সব শ্বেতপাথরের গাঁথনী, এ বাড়ী নূতন প্রস্তুত।

রাজা প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সেরে যে শিব দর্শন করেন, তাও দেখলেম। পুরীর মধ্যে এক পাথরের চাঁদনী। তারই সম্মুখে মন্দির, মধ্যে বাণলিঙ্গ শিব মূর্ত্তি,—নাম পশুপতি। চাঁদনীর পরে এক প্রকাণ্ড পাথরের ষাঁড়। আমরা এই সকল দেখে তৃপ্তিলাভ কোরে বাসায় এলেম। আসতে আসতে মাড়য়ারীকে অনেক প্রশংসা কোল্লেম। তিনি অতি উদার ভাবে সে সব কথা যেন আমরা নিজগুণে বোলেছি বোলে উত্তর দিলেন। আহা! এমন লোক মেলা ভার।

প্রায় তিন মাস জয়পুরে থাকি। প্রত্যহই মনে হয় কাল যাব, কিন্তু কেমন যে মায়া, মাড়য়ারী পরিবারের সঙ্গে কেমন যে মমতা হয়েছে; যেতে আর ইচ্ছা করে না। যাবার নাম শুনলেই বৃদ্ধ মাড়য়ারীর মাতা বলেন, "কেন যাবেন, আমরা কি অযত্ন কোরেছি? যাবার নাম শুনলেই মাড়য়ারীর কন্যা বালিকা, কাঁদ কাঁদ হয়, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। যুবারা

বলে, "আর কিছুদিন থাকলে আপনাদের কি বেশী কষ্ট হবে'? করি কি যেতে আর মন সরে না। বাঙ্গালী হয়ে ধাঁ করে মাড়য়ারীর মায়ার বদ্ধ হলেম, তবে ত তীর্থ দর্শনই বৃথা হলো। মায়া কাটাতে তীর্থ ভ্রমণে এসে পথে পথে মায়ায় বদ্ধ হলেম? স্থির কোল্লেম, কালই রওয়ানা হব। সে দিন মনকে দৃঢ় কোল্লেম।

মাড়য়ারী বাড়ী ছিলেন না। তিনি আসতে আমাদের বাসনা জানালেম। তিনি আরও ২।১ দিন থাকতে অনুরোধ কোল্লেন। ইতি মধ্যে বাড়ীর পত্র পেয়েছি। তাতে লেখা আছে, আমরা ৬ মাস প্রায় বাড়ী ছাড়া তাড়াতাড়ি বাড়ী না গেলে বিষয়কার্য্যের অনেক ক্ষতি হবে। এই পত্র মাড়য়ারীকে দেখাতে আর তিনি আপত্তি কোল্লেন না। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলেম। বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ কোরে বিদায় দিলেন। ঢাকার প্রিয় বন্ধু হেমচন্দ্রকে লিখে সেখান হতে চারিটি ঢাকাই ফুল আনিয়ে রেখেছিলেন। যমুনাকে তাই স্বহস্তে পরিয়ে দিয়ে তার কাছে বিদায় নিলেম। বালিকা কেঁদেই সারা হোয়ে গেল। তার কান্না দেখে আমার চোকে আর জল থাক্‌লো না।

মাড়য়ারী আমাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এলেন। এত যত্ন কেউ কি কখন করে? গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বারম্বার সেলাম কোল্লেন। বোলে দিলেন, "যদি কখন এ দেশে আশা হয়, তবে যেন দর্শন লাভে বঞ্চিত না হই। আমরা মাড়য়ারী—আপনারা হিন্দু, এ বন্ধুত্ব স্থায়ী হবার সম্ভাবনা নাই। তবে যদি এদেশ আসেন, তবে যে একবার দেখা দিয়ে সুখী কোর্ব্বেন, আমার এ আশা অন্যায় নয়।" আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিলেম। গাড়ী ছেড়ে দিলে, মাড়য়ারী আবার সেলাম কোল্লেন। আমরাও প্রতি-সেলাম কোল্লেম। গাড়ী হুস হুস কোরে ছেড়ে দিলে। আমরা মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেম, সজলনয়নে তখনো মাড়য়ারী দাঁড়িয়ে আছেন।

এমন সহৃদয় লোক আর কি হয়? মনে হলো, ছার সংসারে আর কাজ নাই। চিরদিন এই সদাশয় পরিবার ভুক্ত হয়ে জীবন কাটাই।

বলা বাহুল্য যে, এতদিন মাড়য়ারীর বাড়ীতে ছিলেম। আমাদের একটি পয়সাও ব্যয় হয় নাই। পাঠক! এমন এতিথি সেবা আর কেহ কোথায় দেখছ কি?

Offends are never pardon,

পুষ্কর।

জয়পুর হতে রাজপুতনা মালয়া রেলে আজমীর পর্য্যন্ত ১৸৵০ দিয়ে টিকিট কেনা হলো। এখান হতে গাড়ী বরাবর উচু হয়ে উঠেছে। তাইতে গাড়ী তত বেগে চলে না। চারিদিক দেখ্‌তে বড় মনোরম। গাড়ীগুলি যেন পিপড়ের শারের মত উপরে উঠ্‌ছে। এ দৃশ্য চোকে না দেখলে ধারণা হয় না।

যথাসময়ে আমরা আজমীরে পৌঁছিলেম। এখানে গাড়ী পাল্কী কিছু পাওয়া যায় না। যানের মধ্যে কেবল মাত্র একা ভরসা। একাতেই আমরা পুষ্কর যাত্রা কোল্লেম। একায় যাওয়া যে কি কষ্ট, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কেউ বুঝিতে পার্ব্বেন না। একায় যাওয়া আসা অভ্যাস ছিল, তবুও প্রায় আধমরা হয়ে বেলা ১২টার সময় পুষ্করে এসে পৌঁছিলেম। এখানে বাসা কোত্তেও অনেক সময় লাগলো। শেষে পুষ্করের তীরেই এক বাসা ভাড়া কোরে স্নানাহার সারলেম। পুষ্করের শীতল জলে স্নান কোরে শরীর স্নিগ্ধ হলো। পথশ্রমেরও অনেকটা লাঘব হলো। সেদিন আর কোথাও বেরুলেম না। মনে সুখ নাই। কেবল জয়পুরের কথাই মনে পোড়ছে।

পরদিন পুষ্করে স্নান কোরে তীর্থ কার্য্য করা হলো। পুষ্করের আয়তন এক ক্রোশেরও কম। জল অতি পরিষ্কার। কুম্ভীরও বিস্তর! পাণ্ডারা বলে,—"পুষ্করের কুমীরে মানুষ খেতে জানে না।" মানুষ খেতে জানে না কি বাগে পায় না, তার পরিচয় নেওয়ার অবসর আমাদের নাই। পুষ্করে মাছ অনেক। চার ধারে বড় বড় বাড়ী।—তীরে বড় বড় চাতাল। সেই চাতালে বোসে যাত্রীরা শ্রাদ্ধশান্তি করেন। পুষ্করের তিনধারে পাহাড়, একধার খোলা। সেই দিকেই লোকের বসতী। এখানকার লোকজন বড় ভদ্র। পাণ্ডারাও বেশ ভদ্র। যাত্রীর উপর পীড়ন নাই। যা দাও তাতেই সন্তুষ্ট। পাণ্ডারা আমাদের সঙ্গে করে ব্রহ্মপুকুরে পূজা ও শ্রাদ্ধশান্তি করালেন। পরদিন সাবিত্রী দর্শনে যাত্রা কোল্লেম।

সাবিত্রীদেবীর মন্দির পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের পাথর কেটে বেশ সিঁড়ি প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু সিঁড়িগুলি একবারে খাড়া উঠেছে বোলে উঠতে বড় কষ্ট হয়। কি করি, আমরা কষ্টেশ্রেষ্ঠে উঠলেম। সাবিত্রী মন্দির

অতি ছোট। তারই মধ্যে শ্বেত প্রস্তরের সাবিত্রী মূর্ত্তি বিরাজ কোচ্ছেন। এই সাবিত্রীর বংশ নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ বলেন ইনি ব্রহ্মার পত্নী, গায়ত্রীর স্বপত্নী। কোন কোন পাণ্ডা বলেন, ইনি সত্যবানের পত্নী। সাবিত্রী যিনিই হউন, এঁর মাথায় সিন্দুর দিলে জন্মান্তরে পুরুষের পত্নী বিয়োগ আর স্ত্রীলোকের বৈধব্যও ঘটে না। আমরা যথাসাধ্য সাবিত্রীকে পূজা কোরে প্রসাদ ও সিন্দুর সংগ্রহ কোরে নেমে এলেম। তার পর ব্রহ্মপুর দর্শন কোল্লেম। ব্রহ্মপুর পাথর দিয়ে গাঁথা, সামনে চাঁদনী। সেই মন্দিরের মধ্যে রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ ব্রহ্মা বিরাজ কোচ্ছেন। সেখানে যথাসাধ্য ফুল আর পট্টবস্ত্র দিয়ে ব্রহ্মার পূজা সারলেম।

ব্রহ্মপুর হতে পাতালেশ্বর দেখতে গেলেম। কাশীর পাতালেশ্বরের ন্যায় এ পাতালেশ্বরও পাতালের মধ্যে। নাম্‌তে গা কেঁপে উঠে। সিঁড়ি আছে আর উপর হতে একটা মোটা শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। তাতেই ভর কোরে লোকে পাতালেশ্বর দেখতে গহ্বরে নেমে যায়। কাশীর পাতালেশ্বর অদৃষ্ট ক্রমে দেখা হয় নাই, এখানকার পাতালেশ্বর না দেখে আর থাকতে পাল্লেম না। প্রাণটি হাতে কোরে—শিকলে দেহের ভার রেখে অতি সাবধানে পাতালেশ্বরের গহ্বরে নামলেম। যথাসাধ্য পূজা দিয়ে—পাতালেশ্বরের দর্শন কোরে তাড়াতাড়ি উঠে এলেম। কি জানি? বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হলো না।

এখানে খাদ্য দ্রব্য ভাল পাওয়া যায় না। বাজার হাট নাই বোল্লেও চলে। পুষ্করের ধারে খানচেরেক দোকান আছে। তাতেই যে জিনিস আছে, যাত্রীদের তাই ভরসা।

আমরা আর এখানে বেশী দিন থাকলেম না। বিদেশে খাবার কষ্ট হলে, মানুষ ক দিন টিকিতে পারে? আমরা পরদিনই পুষ্কর হতে রওনা হলেম।

Once a knave and ever a knave.

মথুরা।

পুষ্কর হতে আবার জয়পুরে এলেম। এত শীঘ্র আমরা মাড়য়ারীজীর আজ্ঞা প্রতিপালন কোত্তে পার্ব্ব বোলে বিশ্বাস ছিল না। মনের কেমন গতি, বিধাতার কেমন নির্ব্বন্ধ, আবার আমরা জয়পুরে এলেম। যখন মাড়য়ারীজীর দরজায় গাড়ী লাগ্‌লো, তখন রাত ৮টা। ডাকতেই—নাম কোত্তেই মাড়য়ারীজী বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলেম, যেন বড়ই আনন্দিত হয়েছেন। বুড়ী এসে কত আদর কোল্লে। যমুনা সেই রাত্রে এসে হেঁসে কুশল জিজ্ঞাসা কোল্লে। আনন্দে সকলের মুখই প্রফুল্ল। বিদেশী বাঙালীর আগমনে একটি ভিন্ন জাতীয় পরিবারের এত আনন্দ—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

জয়পুরে আরও এক পক্ষ কাটালেম। একপক্ষ পরে আমরা তন্দুলা জংশনে এলেম। আর এক দিন তন্দুলায় থেকে মথুরা যাত্রা কোল্লেম। তন্দুলা হতে হাতারস জংশন ভাড়া ।/৫ আনা। আমরা যথা সময়ে টিকিট নিয়ে হাতারস জংশনে এলেম। এখান হতে শাখা পথে মথুরা ভাড়া ।০ আনা।

মথুরায় বাসার জন্যে তেমন কষ্ট পেতে হয় নাই। আমরা একজন ব্রজবাসীর কৃপায় অবিলম্বে বাসা পেলেম। আমাদের বাসা যমুনার তীরেই সেদিন আর কোথাও যাওয়া হলো না। সন্ধ্যার সময় কুব্জানাথ দেখতে গেলেম। কুব্জানাথের মন্দিরের সামনে অতি পবিত্র বিশ্রামঘাট। কত যাত্রী দাঁড়িয়ে ভক্তিভাবে কুব্জানাথের আরতি দেখছে। প্রবাদ, কৃষ্ণ বলরাম কংসবধ কোরে প্রত্যাগমন কালে এই ঘাটে বিশ্রাম কোরেছিলেন। এই জন্য এ ঘাটের বড় সন্মান। (১) আমরা কুব্জানাথের আরতি দর্শন কোরে বাসায় এলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে ধ্রুবঘাটে স্নানাদি করা হলো। তীর্থ পুরোহিত শ্রাদ্ধশান্তি করালেন। ধ্রুবঘাটের উপরেই ধ্রুবমন্দির। ধ্রুবজীর মূর্ত্তি শ্বেত পাথরের। ধ্রুবের পূজা শেষ করে নিকটের কয়েকটী দেবতা দেখলেম

(১) শুনিলাম লোক মুখে কৃষ্ণবলরাম।
কংস বধ কোরে তথা করেন বিশ্রাম॥
তীর্থ দর্পণ।

মথুরার ঘরে ঘরে দেবতা, ঘরে ঘরে কৃষ্ণ, ঘরে ঘরে বলরাম, ঘরে ঘরে রাধারাণী। এ সব দেখে কি শেষ করা যায়?

পর দিন স্নান কোরে মধুবন প্রদক্ষিণ কোল্লেম। শুন্‌লেম, মধুবন প্রদক্ষিণ না কোল্লে এখানকার তীর্থ ফল লাভ হয় না। মধুবনের নিকটে অনেক দেবালয় আছে। সেগুলিও দেখা হলো। এ সকল দেবালয়ে সামান্য পয়সা দিয়ে প্রণাম কোল্লেই হলো।

মথুরায় ভণ্ডদলের বড় প্রাদুর্ভাব। যাঁরা সাধু, তাঁরা নগরের প্রান্তভাগে বাস করেন। লোকালয়ে কোন সংস্রব তাঁরা রাখেন না। আর যে সব ভণ্ডদল স্বার্থসাধনের জন্যই কেবল ফেরে, তারা রকম রকম ভেক নিয়ে যাত্রীদের ফাঁদে ফেলে আপনার কার্য্যোদ্ধার করে।

মথুরা মন্দ সহর নয়। অনেক লোকের বসতী। রাস্তাঘাট সহরের উপযুক্ত। খাদ্যসুখও নিতান্ত মন্দ নয়। এখানকার চৌবে আর শেঠজীরাই কি ধনে কি মানে প্রধান। শেঠজীদের ধন ব্যবসায়ে আর চৌবেজীদের ধনমান যাত্রীদের কৃপায়। তাঁরা যাত্রীদের নিকটে রকম রকম উপায়ে দান গ্রহণ কোরে বড় হয়েছেন।

দেবালয়ের মধ্যে শেঠজীদের দেবালই প্রধান। যমুনার তীরেই এদের দেবালয়। মন্দিরের ধারে ধারে চকবন্দী আনকগুলি ঘর। সদর দরজার উপর নহবতখানা। সেখানে সময় সময় নহবত বাজে। মন্দিরের সাম্‌নে বেশ প্রশস্ত পাথরের চাদ্‌নী। প্রবাদ, স্বয়ং দ্বারকানাথ সেই শেঠের মন্দিরেই বিরাজ কোচ্চেন। শেঠের দেবভক্তি আছে। তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের সমস্তই দ্বারকানাথের কৃপায়। এই ভক্তি আছে বোলেই বুঝি শেঠের এত সমৃদ্ধি। আমরা দ্বারকানাথকে দর্শন কোল্লেম। পূজা দিলেম। প্রণামী এখানে লওয়া হয় না। পাণ্ডারা কোন গোলমাল করে না। তবে মন্দিরের বাইরে তেমন হাবাবোবা যাত্রীদের কাছে দুই এক পয়সা যে আদায় না করে এমন নয়।

আমরা দ্বারকানাথ দেখে কংস গড় বা কংস কারাগার দেখতে গেলেম। পড়া ছিল, দুরাচার কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে দিয়েছিল। কৃষ্ণ বলরাম কংসকে নিধন কোরে পিতামাতার উদ্ধার করেন। যতবার এই ঘটনা পোড়েছি, ততবার এর সংযোগ স্থানটী দেখতে বাসনা হয়েছে।

আজ সেই বাসনা পূর্ণ কর্ব্বার দিন। পাণ্ডাজীর সঙ্গে দ্রুতবেগে কংশ গড় দেখ্‌তে গেলেম। গিয়ে যা দেখ্‌লেম, তাতে ত অবাক! ঘরে বসে চোক বুঁজে কংসগড়ের যে ছায়াছবি এঁকেছিলেম, মনে মনে কংসের কারাগার সম্বন্ধে একটা লম্বাচওড়া ধারণা ছিল, সে সব ভেসে গেল। দেখলেম, একটা উচু পাড়মাত্র রয়েছে। পাণ্ডাজী পরম আলঙ্কারীক, সালঙ্কারে গড়ের বর্ণনা কোল্লেন। কিন্তু আমার মন বুঝলো না। বড় দ্যুখিত হলেম।

তারপর পাণ্ডাজী ক্রমান্বয়ে চাণুর মুষ্টিক বধ, কংস বধ, রজক বধ যে সকল স্থানে হয়েছিল, সে সকল স্থান দেখালেন। দেখলেম, এক একটা ঢিবিমাত্র পোড়ে আছে।

মথুরার অন্যান্য দেবালয় এক দিনে যত পারি, দেখলেম। দুঃখের বিষয়, কটী প্রধান দেবতা ব্যতীত সকলগুলি দেখে তৃপ্ত হতে পাল্লেম না। অগত্যা বাসায় ফিরে এসে পাণ্ডাজীকে বিদায় কোল্লেম। একদিন অতিথি সেবা করানো হলো, একদিন কুমারী পূজা, কুমারী ভোজন ও কুমারীদের বস্ত্র দান করা হলো। তার পর ব্রজবাসী বিদায় কোরে গোবিন্দঠাকুর নামক একজন বৃদ্ধকে ১।০ সিকার ভোগ দিয়ে মথুরা দর্শন শেষ কোল্লেম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গোবিন্দ ঠাকুর নাকি মূর্ত্তিমান কৃষ্ণের অবতার। বলা বাহুল্য, ভোগ দিলেম—কেবল খাতিরে।

মথুরার প্রধান পাণ্ডা গুরুদাসজীর মুখে প্রমাণ সহিত এখানকার তীর্থ মাহাত্ম্য যথাশ্রুতি বর্ণনা করা আবশ্যক বোলে মনে করি। তিনি বোল্লেন, "জ্যেষ্ঠা কিম্বা মুলা নক্ষত্রযুক্ত শুক্লদ্বাদশীতে যমুনায় স্নান কোরে কৃষ্ণাদি পূজায় অশ্বমেধ ফললাভ হয়। (১) ভগবান বরাহ বলেছেন, মথুরার তুল্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। (২) ভগবান যথাবিহিত তর্পণাদি কর্‌লে জীব নিশ্চয়ই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে থাকেন।

(১) যমুনা সলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যেষ্ঠামুলাঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাস কৃৎ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলং।
বিষ্ণু পুরাণ।

(২) ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।

গোকুল।

গোকুল যমুনার অপর পারে। আমরা নন্দপুরী দেখতে যমুনা পার হয়ে গোকুলে এলেম। গোকুল দেখে তেমন. পরিতৃপ্তি হতে পাল্লেম না। নন্দপুরী, অতি জীর্ণ।—তার মধ্যে কেবল পিতলের নন্দ, যশোমতী, কৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি সাজান আছে। এখানে দেখবার জিনিস্ কিছু নাই, ভক্তি হয় এমন কোন দেবালয় নাই, কেবল পাণ্ডাদের উৎপীড়ন, আর দেহি দেহি রব। আমরা বেশীক্ষণ গোকুলে থাক্‌লেম না। পাণ্ডার উৎপীড়ন দেখে,—তাদের লম্বা লম্বা কথা শুনে বড় বিরক্তি বোধ হলো। আমরা আবার মথুরায় এলেম।

বৃন্দাবন।

পরদিন আমরা বৃন্দাবনে যাত্রা কোল্লেম। এখান হতে ৶০ আনা মাত্র গাড়ী ভাড়া। বৃন্দাবনে আমরা রাত ৭ টার সময় পৌছিলেম। বৃন্দাবনে যাঁর বাসায় আমরা থাকবো, তিনি মথুরা হতে আমাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন। বাসার জন্যে আর কোন কষ্ট হলো না। আমরা সকলে তাঁর বাসায় এসে সে দিন বিশ্রাম কোল্লেম।

এখানে প্রধান দেবতা সাতটী। শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোলকনাথ, শ্রীমদন-মোহন, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধিকারমণ, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীশ্যামসুন্দর। আমরা যমুনায় স্নান কোরে সন্ধ্যাহ্নিক কোরে অদ্য প্রথমে গোবিন্দ দর্শন কোল্লেম। গোবিন্দ দর্শনই যাত্রীর সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক। কিড় গোবিন্দ গোপীনাথ ও মদনমোহন, এই তিন জনকেই সমান প্রণামী দিবার ব্যবস্থা আছে। গোবিন্দ বাড়ীতে ২৷৷০ টাকা দিয়ে লাল কাপড় কিনতে হয় এদের সাধারণ লোকে "লাল যাত্রী" বলে।

আমরা গোবিন্দজীকে ভেট দিয়ে প্রবেশ কোল্লেম। দেখলেম, দিব্য পাথরে মূর্ত্তি। আমরা মন্ত্র পাঠ কোরে গোবিন্দজীর পূজা কোল্লেম। (৩)

সমত্বং মথুরায়াহি প্রিয়াং মম বসুন্ধরে।—

বরাহ পুরাণ।

(৩) ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃপায় গোবিন্দায় নমোনমঃ

তারপর রাধিকা দেবীকে ধ্যান (৪) কোরে পূজা ও প্রণাম কোল্লেম। (৫) তারপর সত্যভামা, জাম্বুবতী, রুক্মিণী ও রাধিকা একত্রে পূজা (৭) ও পরে গোবিন্দের সহিত পূজা কোল্লেম। (৮) এখানকার পূজা সেরে আমরা এক এক কোরে গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন, রাধাদামোদর, শ্যামসুন্দর, কেশব ও গোকর্ণেশ্বরকে পূজা ও প্রণাম কোল্লেম। রাস্তায় আসতে বৃন্দাদেবীকে পূজা কল্লেম। তারপর গোবর্দ্ধন দর্শন কোত্তে গেলেম। দেখলেম, গোবর্দ্ধন একটি অতি ক্ষুদ্র পাহাড়। গোবর্দ্ধনের এক স্থানই তীর্থ, সেখানে গিয়ে যথামন্ত্রে প্রার্থনা ও পূজা কোল্লেম। (৯) তারপর গোবর্দ্ধনের নিকটে মানসগঙ্গা, কৃষ্ণসরোবর, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড দর্শন কোল্লেম। সময়ে সময়ে ঘুরে ফিরে বৃন্দাবনের আরও কয়েকটী কুণ্ড দেখেছিলেম। তবে যে কটীর নাম পূর্ব্বে কোল্লেম, সেই গুলিই প্রধান।

কুণ্ডদর্শনের পর আমরা মধুবন, নিকুঞ্জবন, সেবাকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ, তালবন, ভাণ্ডীরবন, তমালবন, নিধুবন দেখলেম। বন আর কুঞ্জ বোলে আমাদের যে ধারণা ছিল, অভিধানে বন ও কুঞ্জের যেরূপ অর্থ দেখি, এ বনও কুঞ্জের তুলনায় সে সব ধারণা নষ্ট হলো। দু একটি সামান্য গাছ লতাপাতা ঘিরে রেখে পাণ্ডার দলে বুজরুকী জাহির করার পথ প্রশস্ত করেছে। এ দেখে ভক্তি হওয়া দূরে থাক, দর্শনার্থীর অন্ধবিশ্বাস দেখে দুঃখ হয়।

---

(৪) ওঁ ফুল্লেন্দিবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবৃতং সপ্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরীং পীতাম্বরং সুন্দরং॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গোপাসংঘাবৃতম্
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

(৫) ওঁ বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী।
প্রসন্না ভব মে দেবী শ্রীরাধে ত্বাং মমাম্যহং।

(৭) ওঁ বৃষভানু সুতাং বন্দে জীবানন্দ প্রদায়িণীং
কৃষ্ণপ্রিয়তমাং দেবীং বৃন্দাবনবিলাসিনীং।

(৮) ওঁ নমস্তে নরকারাস্তে নমস্তে মধুসূদন।
অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্দঃখ হন্ পুরুষোত্তম।

(৯) ওঁ গোবর্দ্ধন ধরাধর গোকুল ত্রাণকরণ
বহুবাহু কৃতোচ্ছ্রায় গবং কোটীপ্রদোভব।

একটি মজার কথা। এখানকার লোকেরা বলে, যাত্রীরা বিশ্বাস করে যে, কৃষ্ণের বিহার কুঞ্জের বিহার কুটিরে পুষ্পশয্যা কোরে ভাল বিষ্ণুপুরে কি গয়ার মিঠাকড়া • ফরসীতে চড়িয়ে দোর বন্ধ কোল্লে লোকজন বাইরে থেকে বেশ ফরসীর ভুড়ুক ভুড়ুক টান শুন্‌তে পাওয়া যায়। সকালে ঘর খুললে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, দুজন শুয়ে বেশ এপাশ ওপাশ, কোরেছে। রহস্য বুঝতে আমাদের বেশী সময় লাগলো না। আরও শুন্‌লেম, নিশিরাত্রে জাগরীত হলে যমুনাকুলে কৃষ্ণের বাঁশীর স্বর শুন্‌তে পাওয়া যায়। এ রহস্যও যে ঐরূপ, তাতে আর সন্দেহ কি? বুজরুকীর বুজরুকী, সাধারণ বা ভক্তের অতিরঞ্জিত যে কতদুর হতে পারে, কৃষ্ণের এই অবনতিই তার প্রমাণ। মূর্খলোকে ভাবে, কৃষ্ণ আজও বাঁশী বাজিয়ে বেড়ান। জানে না যে, এ কথায় কৃষ্ণচরিত্রে কতদুর কলঙ্ক দেওয়া হলো। কৃষ্ণকে আরও উন্নত কোত্তে গিয়ে—অতিরঞ্জিত কল্পনায় জড়ীভূত কোরে কৃষ্ণের সর্ব্বনাশ করে। এতে বরং ভক্তির অন্তরায় ঘটে।

এখানকার লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্রই সকল বিষয়ে প্রধান। প্রকাণ্ড মন্দির, চাঁদনী, সেবার ব্যবস্থাও চমৎকার। দীনদুঃখীর জন্য মন্দির দ্বার অবারিত। সকলেই ইচ্ছামত প্রসাদ পায় প্রণামী দিবারও তেমন শক্তাশক্তি নাই। আরও ব্যবস্থা, যিনি যেরূপ প্রণামী দেবেন, প্রত্যর্পিত প্রসাদাদির মূল্য তার সওয়া গুণ হবে। ১ টাকা দিলে, পাঁচ সিকার জিনিস পাওয়া যায়। এমন ব্যবস্থা আর কোথাও নাই। অতিথি অভ্যাগত দীন কাঙাল সকলেরই সহিত এরা সমান ব্যবহার করেন। এদের ব্যবহারে সকলেই তুষ্ট।

এর পরেই শেঠ বাবুদের কুঞ্জ॥ এখানে অতিথি সেবার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু পাঁচজনে পোড়ে সে সব ব্যবস্থাকে অব্যবস্থা কোরে তুলেছে। বাবুরা কি সে সব খবর পান? সাহাজী আর টিকারীর রাণীর দেবালব এর নীচে। এখানেও ঐ দশা। মহান্তের রাধাকান্ত মন্দির একটীর নীচে। এখানে দেহি দেহি রব ভিন্ন আর কিছু শুন্‌তে পাওয়া যায় না। বাঁধা আধুলী না ফেললে এক মুঠা প্রসাদ পাবার উপায় নাই। এ ছাড়া বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের অভাব নাই। এ দিকে ঘরে ঘরে যেমন রাধা কৃষ্ণ, তেমনি ঘরে ঘরে রাসলীলা।

এখানকার গোপেশ্বর নামক শিব লিঙ্গের বহুমান। যাত্রীরা যত্ন কো'রে এঁর পূজা করেন। তীর্থ ব্যবহারে আমরাও পূজা কোল্লেম।

তারপর আমরা শিঙার বট দেখতে গেলেম। রাধিকা প্রাণকান্তকে এই বটতলায় সাজিয়েছিলেন বলে এর এত মান। শিঙার বট যমুনার তীরেই অবস্থিত। এর নিকটেই চৈতন্য মূর্ত্তি। এ ছাড়া সুবল ভাণ্ডির বনে, লক্ষ্মী বিল্লবনে, রাধা মানসরোবরে অধিষ্ঠান কোচ্চেন। এ গুলি যমুনার ও পারে। রাস্তায় বড় কষ্ট, তবু পার হয়ে দেখে এলেম।

তারপর "রাধা বাইকে" দেখতে গেলেন। রাধাবাই মানবী, বয়স ষাট পঁয়ষট্টির কম নয়। ইনি শিলামূর্ত্তি নারায়ণকে পেটের মধ্যে রেখে-ছেন। ভোগ দিলে নারায়ণ বমি করে যাত্রীদের মনোরথ পূর্ণ করেন। আমরা যখন গেলেম, তখন রাধাবাই মোড়ায় বসে গুড়ুক তামাক খাচ্চেন। চারিদিকে ষণ্ডা ষণ্ডা ধরণের পাণ্ডারা বোসে আছে। আমরা যেতেই এক-জন পাণ্ডা আসন দিলে। স্বগত জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমাদের বাসনা জেনে আগে ভোগের কড়ি বুঝে নিলে। শেষে একখানি ছোট পাথরের থালায় একটু মোহনভোগ ভোগ, আর তার উপর চারপাত তুলসী রেখে রাধাবাই কাপড় ছেড়ে নামাবলী গায়ে দিয়ে এলেন। তারপর বার কতক "ওয়াক ওয়াক" কোরে কুলের মত একটী শীলা বমন কোল্লেন। তারপর সকলকে দেখিয়ে আবার গিলে ফেল্লেন।

বৃন্দাবনের শোভা নিতান্ত মন্দ নয়। বৃন্দাবনকে একটী নগর বলা যেতে পারে। পথ ঘাট বেশ প্রশস্ত। নগরের লোক গোবিন্দের কৃপায় এক রকম স্বচ্ছন্দেই থাকে। যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা কোরে জীবিকানির্ব্বাহ করা বৃন্দাবনের আবাল বৃদ্ধের সংস্কার। এখানে লেখা পড়ার চর্চ্চা বড় কম। যাত্রী খোল্লেই যখন পয়সা, তখন কে পয়সা খরচ কোরে লেখা পড়া শেখে? এখানে মূর্খলোকই অধিক। বৃন্দাবনে বড় বানরের উপদ্রব। এদের জ্বালায় জিনিস পত্র রেখে নিশ্চিন্ত হবার যো নাই।

খাদ্যদ্রব্য একরকম সবই মেলে, তবে দর বড় অতিরিক্ত। তরকারীও না পাওয়া যায় তা নয় কিন্তু তেমন স্বাদু নয়।—গোপের বৃন্দাবনে দধি-দুগ্ধের অভাব নাই, তবে যেন একটু বিস্বাদ বোলে বিবেচনা হয়। এখান-কার যাঁরা বাসেন্দা হয়েছেন, তাঁরাও একরকম কৃষ্ণ-জীবি।

Proverty is no vice,

ব্যভিচারের প্রশ্রয়ও বিস্তর। যুবতী বৈষ্ণবীরা দেহি দেহি রবে এত বিরক্ত করে যে, তাদের হাতে নিস্তার পাওয়া ভার। কি গৃহস্থ, কি বৈষ্ণব সকল স্ত্রীলোকেই এখানে ইচ্ছামত যেতে আস্‌তে পারে। স্ত্রীস্বাধীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, আর তার ফলাফল দেখতে হলে, একবার বৃন্দাবনের ব্যাপার সমালোচনা করা আবশ্যক।

বৃন্দাবন দেখা শেষ করে, আমরা অন্যত্র যাবার মতলব আঁটিতে লাগলেম। এখন যাই কোথা ?

পৃথ্বীরাজ।

আমরা বৃন্দাবন হতে মথুরা শাখা পথে হাতারস্ জংসন এসে পৌছিলেম। এখান হতে ১৷৫ আনা দিয়ে টিকিট নিয়ে দিল্লী রওনা হলেম। আমরা বেলা ৮টার সময় দিল্লী পৌছিলেম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের শেষ ষ্টেশন দিল্লী। দিল্লী ষ্টেশনের শোভা বড় চমৎকার। এখানকার মস্‌জিদ্‌-গুলি দেখিবার জিনিস বটে। দিল্লীতে মস্‌জিদের সংখ্যা করা বড় সহজ কথা নয়। এখানকার সমাধিস্থান দেখবার জিনিস। আমরা দূর হতে এ সব দেখলেম। দিল্লীতে আমাদের বাসা কোত্তে হলো না। এখানে যে সকল বাঙালী বাবু আছেন, তাঁরা বাঙালীদের বড় যত্ন করেন। আমরা কৃষ্ণবাবুর বাসায় থাকলেম। বাঙালী বাবুরা সন্ধ্যার সময় দেখতে এলেন। সদালাপে পরম সন্তুষ্ট হলেম। দেশের গল্প কোত্তে রাত অনেক হয়ে গেল। আহারাদি কোরে শয়ন কোল্লেম।

পৃথ্বীরাজপুর এখান হতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে। সকালে আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে পৃথ্বীরাজপুর দেখতে গেলেম।

পৃথ্বীরাজপুরের ঘর অতি জীর্ণ, তবুও এখনো বেশ শক্ত আছে বোলে বোধ হলো। আমরা ঘরবাড়ী কারুকার্য্য দেখে কুতব দেখতে গেলেম। কুতব আমাদের কলিকাতার মনুমেণ্টকে হারিয়ে দিয়েছে। এত উচ্চ যে, উপরের দিকে চাইলে, মাথার কাপড় পোড়ে যায়। কুতবে উঠবার সিঁড়ি আছে, আমরা বহুকষ্টে তার উপরে উঠলেম। নীচের দিকে চাইতে মাথা ঘুরতে লাগলো। নীচে আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানি দেখতে যেন

খেলনা গাড়ী বোলে বোধ হলো। পাগ বাঁধা কোচম্যানকে যেন একটী রূপী বাঁদর বলে বোধ হতে লাগলো। ধন্য কারিকরের কার্য্য। এতদুর কি করে গেঁথেছে, তা ভাবতেও পাল্লেম না। নেমে এলেম।

পৃথ্বীরাজ যেখানে যজ্ঞ কোরেছিলেন, সেই স্থানে একটী অষ্টধাতুর দণ্ড পোঁতা আছে। যে যজ্ঞে অসংখ্য রাজপুত বলি হয়েছিল, যে যজ্ঞের ফলে হিন্দুর গৌরবরবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়েছে, সে যজ্ঞের নিদর্শনও অনেক দেখলেম। অস্ত্রাগার, ধনাগার, সব দেখলেম। তবে সে সব দেখে আর ফল কি? অস্ত্রহীন অস্ত্র্যগার, ধনহীন ধনাগার দেখে তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

যোগমায়া।

যোগমায়া মন্দিরও দেখলেম। দেখলেম এক ঢোকার ভিতরে একখানি শীলা। এখানে কজন সন্ন্যাসীও দেখলেম। সন্ন্যাসীরা আমাদের দেখে দীর্ঘ দীর্ঘ জটা নাড়া দিয়ে পয়সা নেবার সাড়া দিলেন। যথাশক্তি দান কোরে তাঁদের নিরস্ত কোল্লেম। এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাত গভীর এক ইদারা আছে। পয়সা দিলে ছোট ছোট বালকেরা তাইতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। আমরা যেতেই বালকেরা ঘিরে দাঁড়ালো। কে পোড়বে তারই মীমাংসা হতে লাগলো। আমরা বালকদের পেটের দায়ে এই অসীমসাহসিকতার কার্য্যে নিবৃত্ত কোরে, প্রত্যেককে এক একটী পয়সা দিলেম। তারা সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় হলো। এদিকে বেলাও অপরাহ্ন হয়ে এলো। আমরা তাড়াতাড়ি দিল্লী যাত্রা কোল্লেম।

অযোধ্যা।

দিল্লীতে আর তিনদিন থেকে আমরা মোগলসরাই এলেম। দিল্লী হতে মোগলসরাই ভাড়া ৬।/০ আনা। এখান হতে আবার আউদ ও রহিল খণ্ড রেলে অযোধ্যা ভাড়া ১॥৵৫ আনা। দিল্লী হতে অযোধ্যায় আসতে আমাদের প্রায় সাড়ে চারিদিন লাগলো। অযোধ্যার মিছিরটোলীতে আমরা বাসা কোল্লেম। এখানে তিনদিন কাল আমরা আর বাসা হতে বেরুলেম না।

পথের কষ্ট—গায়ের ব্যথা মোরতে তিনদিন কাটলো। চার দিনের দিন সকালে সরোবরে স্নান কোরে এলেম। সরযূ আমাদের বাসা হতে প্রায় দু ক্রোশ দূরে।

অযোধ্যায় সুখসমৃদ্ধির কথা আগে যে সকল প্রবাদ ছিল, মহাকবি বাল্মীকি যে বর্ণনা করেছিলেন, এখন তার কিছুই নাই। সে রামরাজ্যও নাই, সে রাজপাটও নাই, সে সুখসৌভাগ্যও নাই। অযোধ্যা, সেই রামাবতার রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা এখন একটী ক্ষুদ্র নগরী! সে সকল রাজপুরী এখন একটী স্তূপ, সে সকল দেবালয় এখন লোক দেখান ঠাট। সে সকল বিবরণ এখন ঠাকুরমায়ের গল্প, আর পয়সা আদায়ের ফিকির। পূর্ব্ব গৌরব এখন কিছু নাই। (১)

---

(১) কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীত জনপদো মহান্।
নিবিষ্ট সরযূতীরে প্রভূত ধনধান্যবান্॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোক বিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেন যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ন্॥
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী স্ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত মহাপথা॥
রাজমার্গেন মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্ত পুষ্পবিকীর্ণেন জলরিক্তেন নিত্যশঃ॥
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমা বাসয়ামাস দিবিদেবপতির্যথা॥
কপাট তোরণবতীং সুভিবান্তরাপণাম্।
সর্ব্বযন্ত্রাযুধবতীং উষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥
সুত মাগধসম্বাধাং শ্রীমতী অতুল প্রভাম।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নী শত সঙ্কুলাল॥
বধূনাটক সঙ্ঘৈশ্চ সংকুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীং।
উদ্যানাম্রবনোপেতং মহতাং শালমেখলাম॥
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥
সামন্তরাজসংঘৈশ্চ বলিকর্ম্মাভিরাবৃতাম্।
নানাদেশ নিবাসৈশ্চ বনিক্ ভিরুপশোভিতাম॥
প্রাসাদৈঃ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম।
কুটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণাম ইন্দ্রসেবমরাবতিম॥

টীকা।

মিত্রামষ্টাপদাকারং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্ব্বরত্ন সমাকীর্ণাং বিমানগৃহ শোভিতাম্॥
গৃহগাঢ়ম বিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুল সংপূর্ণাং ইক্ষু কাণ্ড রসোদকাম্॥
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভূশমত্যর্থঃ পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম
বিমাননিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি
সুনিবেশিতং বেশ্মান্তাং নরোত্তম সমাবৃতাম,
যে চ বানৈর্ণবিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম
শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাং
সিংহ ব্যাঘ্রবরাহাণাং মত্তানাং মদতাং বনে
হন্তারো নিসিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্বাহু বলৈরপি
তাদৃশানাং সহস্রৈস্তাম অভিপূর্ণাং মহারথৈঃ
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথ স্তদা
তমাগ্নিমৰ্গ্নিগুণৈমন্ত্রিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈ-র্ব্বেদষড়ঙ্গ পরাগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্ম্মহাত্মভি—
র্ম্মহর্ষিকল্পৈর্ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ।

রামায়ণ ১ম কাণ্ড ৫ সর্গ।

"স্রোতস্বতী সরযুর তীরে প্রচুর ধনধান্য সম্পন্ন আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ অতি সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্রমনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। অযোধ্যা দ্বাদশযোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃ পথ সকল বিকশিত কুসুমসমলঙ্কৃত ও নিয়ত জল সিক্ত হইয়া, উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালী বদ্ধ আপন সকল রহিয়াছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকার ধ্বজপট সকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার রক্ষণার্থ লৌহ নির্ম্মিত শতঘ্নী (ক) নামক যন্ত্র বিশেষ উদ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধুগণের নাট্যশালা ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানাদেশ হইতে বণিকেরা

(ক) শতঘ্নীকে কেহ কেহ বন্দুক ও কামান নামে অভিহিত করেন, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইহাই মত। অন্য মতে শতঘ্নী তাড়িত যন্ত্র।

আমরা সরযু জলে স্নান কোরে হনুমান বীরের শীলামূর্ত্তি দেখলেম।

আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গম ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোনস্থানে হস্তাশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ননির্ম্মিতঃ প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাধবগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্ত-গৃহ ও সপ্ততলগৃহ নির্ম্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ (খ) নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার সুবর্ণ খচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্য তণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকের সিদ্ধগণের ও তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরুষগণের নিরন্তর সেবিত আছে তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণগ সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে! কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া কর প্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয় স্বজন বিহীন ও লুক্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে, এইরূপ ব্যক্তি সকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাহারা শানিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। এই সকল সহস্র সহস্র মহারথী-গণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। স্বাগ্নিক গুণবান বেদবেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্য-বিবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল প্রভাসম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ্য সর্ব্বালঙ্কার শোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন!" হেমচন্দ্রের অনুবাদ।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত। ৩৪ পৃঃ

(খ) পাঠক সংসার তত্ত্বে বারাঙ্গনা শার্ষক প্রবন্ধ দেখুন। বারাঙ্গনার আবশ্যকতা বাল্মীকিও স্বীকার করিয়াছেন।

Soon well soon ill,

সেখানে মন্ত্রপাঠ (১) কোরে পূজা করা হলো। হনুমান মূর্ত্তি একখানি বড় পাথর কেটে হয়েছে। আকৃতি তেমন পরিষ্কার নয়, তবে হনুমান মূর্ত্তি আর কতই বা ভাল হবে?

হনুমান দেখে রামচন্দ্রকে দেখতে গেলেম। রামচন্দ্র মূর্ত্তি অতি সুদৃশ্য। দেখলে আপনা হতেই ভক্তি হয়। প্রথমে রামচন্দ্রকে পূজা ও নমস্কার কোরে (২) তার পর কৌশল্যাকে পূজা কোল্লেম। (৩) তার পর এক এক কোরে দশরথ, সীতাদেবী, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন, জাম্বুবান, ধুম্র, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধূম্রাখ্য, সুমন্ত্র প্রভৃতির শীলামূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম কোল্লেম। তারপর কৃত্তিবাস শিবলিঙ্গ পূজা কোরে জনক কূপের জল পান কোল্লেম। তারপর

(১) হনুমানের ধ্যান।

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোর রাবণং সমুৎসৃজন॥
লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তক যমোপমং।
জ্বলদগ্নি সমং নেত্রং সূর্য্যকোটী সমপ্রভং।
অঙ্গদাদৈম হারীরৈর্বেষ্টিত রুদ্ররূপিণং॥
নমস্কার,—ওঁ হনুমতে নমঃ।

(২) রামের প্রার্থনা মন্ত্র,

ওঁ রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে।
অধমানাং কৃপানাথ ত্বমে চ শরণং গতিঃ॥
রামের ধ্যান যথা,
ওঁ কালাম্ভোধর কান্তি কান্ত কাণ্ডমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং।
মুদ্রাং জ্ঞানময়ং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুকি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভং রাঘবং।
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদি বিবিধকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥
নমস্কার মন্ত্র যথা,
ওঁ রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ঃ পতয়ে নমঃ॥

(৩) কৌশল্যার ধ্যান যথা,

ওঁ রামস্য জননীচাসীংরামময়মিদং জগৎ।
অতস্তাং পুজয়িষ্যামি লোকমতে মহংস্তুতে॥

অযোধ্যার রাজ পাটাদি দর্শন কোরে বাসায় ফিরে এলেম। এখানকার দর্শনাদি এই পর্য্যন্ত।

শ্রীক্ষেত্র।

দেখতে দেখতে প্রায় এক বৎসর কেটে গেল। অযোধ্যা হতে এসে আবার কাশীতে দু-মাস থাকলেম। এখন আর এখানে থাকা নয়, রথে একবার জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখতে মন বড় ব্যগ্র হলো। একবারে ৬।/০ আনা দিয়ে টিকিট কিনে কলিকাতায় রওনা হলেম।

কলিকাতায় এসে প্রায় ১৫ দিন অপেক্ষা করা হলো। শ্রীক্ষেত্র ত রেলের পথ নয়, ষ্টীমারে যেতে হয়। কলিকাতা হতে চাঁদবালী দিয়ে ষ্টীমারের ভাড়া ৬॥০ টাকা। সাধারণ যাত্রীরা এই ৬॥০ টাকা দিয়েই যায়, যারা একটু ভাল ভাবে যেতে চান, তাঁরা ১২৲ টাকা আর তা হতেও ভাল ২৫ টাকা দিয়ে টিকিট নিতে পারেন।

সমুদ্র দিয়ে বড় কষ্ট। অনেক যাত্রীকেই পীড়িত হতে দেখলেম। সমুদ্র হতে এমন এক রকম গন্ধ উঠে যে, তাতে বমী হয়; অনেকে সেই জন্য বড়ই পীড়িত হয়ে পড়েন। কটক যেতে ৫ দিন লাগে। তবে কোন দুর্ঘটনা হলে আরও বেশী দিন লাগে।

আমরা কটকে জগন্নাথ পাণ্ডার বাড়ীতে বাসা কোল্লেম।

সর্ব্ব প্রথমে বিরজা তীর্থে স্নান তর্পণাদি ও বিরজা দেবীকে প্রণাম কোরে বৈতরণীতে গেলেম। সেখানেও মন্ত্রপাঠ কোরে (৪) স্নান করা হলো তারপর পুরুষোত্তম দেখতে গেল্লেম। প্রথমে হর দর্শন ও নমস্কার

(৪) ওঁ আয়াত ভাগং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমং।
দেবীঃ নক্ষত্রয়ানাহুর্ভয়াক্রন্দ্রস্য শাশ্বতীং।
ইমা গাথাং সমুদ্ধৃত্য যমলোকং স গচ্ছতি।
দেবায়নং তস্য পন্থাঃ শক্রস্যেব বিরাজতে॥
গোদানের পরিবর্ত্তে তন্মূল্যদান কোরে মন্ত্র পোড়লেম, যথা,—
ওঁ যাসা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
সামতীর্ণা মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈঃ।

পরে চিত্রপর্থ নদীতে স্নান ও তর্পণ, তারপর ভুবনেশ্বর, সাক্ষী গোপাল দর্শন ও নমস্কারপূর্ব্বক মার্কণ্ডেয় হ্রদে তর্পণ ও মন্ত্র পোড়ে ডুব দিলেম। (৫) শিবমন্দিরও তিনবার প্রদক্ষিণ কোল্লেম। পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ কোরে অঘোর মন্ত্রে পূজা ও নমস্কার কোল্লেম। (৬) তারপর মন্দির সম্মুখস্থ গরুড়কে দর্শন ও পূজা করা হলো।

পরে আনন্দপুরী প্রবেশ কোরে, প্রথমে বলরামকে ধ্যান ও পূজা করা হলো, (৭) পরে জগন্নাথদেবকে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক (৮) প্রদক্ষিণ ও নমস্কার কোরে, সংকল্প পূর্ব্বক ধ্যান ও প্রণাম কোল্লেম। (৯) পরে যথা-নিয়মে স্তব করা হলো। (১০) এর পরে সুভদ্রাকে দর্শন ও নমস্কার

(৫) ওঁ সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্থমচেতনং।
পাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তুতে॥
ওঁ নম শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নান করোমি দেবেশ মম নশ্যতি পাতকং॥

(৬) ও অঘোরেভ্যোঽর্থ ঘোরভ্যো ঘোর ঘোরতরভ্যো সর্ব্বতঃ।
সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ॥

(৭) ওঁ নমস্তে হলধৃগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল।
ওঁ বনক শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দু সমপ্রভং।
কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রকান্ত তরাননং।
নীলবস্ত্র ধর দেবং ফণাবিকলমস্তকং।
মহাবলং হলধরং কুণ্ডলৈকবিভূষণং।
রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা ধ্যায়েন্মু বলধারিণং॥
ও ত্রৈলোক্য পুজিত শ্রীমান্ ক্ষমা বিজয় বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণি নারায়ণ নমোঽস্তুতে॥
ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণং
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননং।
শঙ্খং চক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণং
সর্ব্ব লক্ষণ সংযুক্তং বনমালাবিভুষিতং
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ
সেব্যমানং সদাদারু কোটি সূর্য্যসমপ্রভং
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেব চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং।

কোল্লেম। (১১) পরে যথাক্রমে নরকেশ, শ্বেতগঙ্গা, শ্বেতমাধব দর্শন ও পূজা করা হলো।

পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হলো। কুঞ্জবাটী দর্শন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ কোল্লেম। বিন্দুসরোবরে স্নান ও সূর্য্যালয় দর্শন করা হলো। তার পর রথের দিন রথে বামনরূপ দর্শন করা হলো। এখনকার অন্যান্য সামান্য সামান্য কার্য্য সমাধা কোরে, ৭ দিন পরে আমরা আবার কলিকাতায় এলেম।

গঙ্গাসাগর।

সেই বৎসরেই মাঘমাসে গঙ্গাসাগর গমন করি। গঙ্গাসাগরেও ষ্টীমারে যেতে হয়। কলিকাতা হতে ষ্টীমার ভাড়া ১০৲ টাকা। গঙ্গাসাগরে

(১০) ওঁ জয়কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্ব বিঘ্ননাশন।
জয় চনূরকেশিঘ্ন জয় কংসনিসূদন॥
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর।
জয় নীলাম্বুদশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ॥
জয় দেব জগতপুজ্য জয় সংসারনাশন।
জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ॥
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখ ফেণিলে।
ক্রোধগ্রহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লাবে॥
নানারোগোর্ম্মিকনিলে মোহবর্ত্ত সুদুস্তরে।
নিমগ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥

(১১) ওঁ সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পতপত্রায়তেক্ষণাং।
বিচিত্রবস্ত্র সংচ্ছান্নাং হারকেয়ুরশোভিতাং॥
বিচিত্রাভরণো পেতাং মুক্তা হার বিলম্বিতাং।
পীনোন্নত কুচাং রম্যাং আদ্যা প্রকৃতিরূপিণী॥
ভক্তি মুক্তিংপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাঃ॥

তীর্থফল,—বরাহ পুরাণে,—

বস্তিষ্টৈকপাদেন কুরুক্ষেত্রে মায়াধিপ।
বর্ষণামযুতং সপ্তবায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
জৈষ্ঠমাসি সিতি পক্ষে দ্বাদশ্যান্ত বিশেষতঃ।
পুরুষোত্তম মাসাদ্য ততোঽধিকফলং লভেৎ॥

যেতে যাত্রীদের বড় কষ্ট হয়। আমরা গঙ্গাসাগরে গিয়ে যথানিয়মে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে কপিল দর্শন ও পূজা, গঙ্গাসাগর পূজা ও ঢেউ নিলেম। এখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। বড় বড় ঢেউগুলি যখন দূর হতে দেখা যায়, তখন নীল আকাশের উপর সাদা মেঘের স্তূপ বোলে বিবেচনা হয়। এখানে শ্রাদ্ধশান্তিও করা হলো। তারপর আমরা কলিকাতায় এলেম।

পুরাণ বিশেষে কথিত আছে, এখানে স্নান করিলে, ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মবরে গোলোকে বা কৈলাসে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১২)

ঘোষপাড়া।

কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলে কাঁচড়াপাড়া বা মদনপুর। ভাড়া ।৵০ আনা ও ।√০ আনা। এখান হতে ঘোষপাড়া এক ক্রোশ মাত্র। এখানে সতীমাতার আরাধনা ও দুলালচাঁদের নাম কীর্ত্তন হয়। ঘোষপাড়ার তীর্থযাত্রীদের সাধারণ লোকে "কর্ত্তাভজা" বলে।

ত্রিবেণী।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানকে ত্রিবেণী বলে। এখানে একবার মাত্র স্নান কোল্লে, কোটিজন্মের পাপ ক্ষয় হয়। ত্রিবেণী হুগলীর নিকট ষ্টীমার বা গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধা। ব্যয় সর্ব্বসমেত ২৲ দুই টাকা মাত্র।

নবদ্বীপ।

কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলে বগুলা ভাড়া ৸৫ আনা, এখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে হাঁসখালী ভাড়া ৵০ হইতে ।০ আনা। পরে নদী পার হয়ে, পুনরায় ঘোড়ার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর ভাড়া ॥০ আনা। এখান হতে ঘোড়ার গাড়ীতে ৪ ক্রোশ নবদ্বীপ। ভাড়া ১৲ টাকা মাত্র। এখানে বুড়াশিব, ভবতারিণী, শচীমাতা, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি দর্শন সমধিক পুণ্যজনক।

---

(১২) যা বস্তু জাহ্নবীতোয়ং সাগরাম্ভ পরিপ্লুতং। ইত্যাদি।

ভবিষ্যপুরাণ।

শান্তিপুর।

৺মদনমোহনের রাসে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলে রাণাঘাট ভাড়া ॥/১০ আনা। নদীপারে ঘোড়ার গাড়ীতে শান্তিপুর, ভাড়া ॥০ হইতে ৸০ আনা। এখানকার মদনমোহন, গোপীনাথ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রশেখর।*

প্রথমতঃ ব্যাসকুণ্ডে গমন ও স্নান তর্পণাদি করিবে। পরে তত্তীরস্থিত ব্যাসদেবকে পূজা করিবে। অনন্তর চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের পশ্চিমদিকস্থ বটুক, মতিদক্ষ ও নন্দিকেশ্বরকে পূজা করিবে। পর্ব্বতস্থ পাতালগঙ্গাকে প্রণাম ও পূজা করিবে। পরে ভগবান লিঙ্গরূপী চন্দ্রশেখরকে পূজা করিবে। চন্দ্রশেখর পূজার মন্ত্র ও শিবপূজার মন্ত্র এক। অতএব সে উল্লেখ বাহুল্য।

হরিদ্বার।*

প্রথমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া স্নান ও তর্পণাদি করিবে। পরে বেণীমাধব ও গঙ্গাধর প্রভৃতি দেবতা পূজা করিবে। কথিত আছে, গঙ্গাদ্বার ও স্বর্গদ্বার তুল্য, তথায় স্নান করিলে কোটী জন্মের ফললাভ হয়। (১৩)

---

* এই চিহ্নিত তীর্থগুলি আমরা দর্শন করি নাই বা ইহার বিবরণও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেইজন্য এখানকার দেবতা ও কর্ত্তব্য মাত্র লিখিত হইল। গমনাগমনের ব্যয় বা সুবিধার কথা লিখিত হইল না। যদি পাঠকগণের কেহ জ্ঞাত থাকেন, জানাইলে বাধিত হইব। লেখক।

(১৩) ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞঃ নমস্কৃত্য মহাগিরিং।
স্বর্গদ্বারেণ তত্তুল্যং গঙ্গাদ্বারং নসংশয়।

কামাখ্যা।*

কামাখ্যা আসাম জেলার অন্তঃপাতি। কামাখ্যা যাইয়া প্রথমে

নিত্যক্রিয়া করতঃ নীলাচলের পূজা করিয়া, পরে গৌরীশীলায় আরোহণ পূর্ব্বক দেবীর পূর্ব্বদ্বারস্থ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিবে। পরে সিদ্ধ-গণেশ, কমলা ও কুব্জিকার পূজা করিবে। পরে যোনীরূপিণী কামাখ্যার নিকটে যাইয়া, ধ্যান ও পূজা করিবে। (১৪) পরে অষ্টযোগিনী পূজা করিয়া, অন্যান্য দেবতা দর্শন করিবে।

ব্রহ্মপুত্র।*

ব্রহ্মপুত্র তীরে গিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিবে। (১৫) পরে ভক্তিভাবে ব্রহ্মপুত্রকে পূজা ও নমস্কার করিয়া, জন্মান্তরিন পাপক্ষয় কামনায় প্রার্থনা করিবে। কথিত আছে, ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন করিলে আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।

---

(১৪) ওঁ যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তর কৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণং পদে পদে॥

প্রার্থনা মন্ত্র।

ও কামদে কামরূপস্থে সুভগে সুরসেবিতে।
করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।
ওঁ কামাখ্যা বরদে দেবী নীলপর্ব্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনি মুদ্রে নমোঽস্তুতে।

নমস্কার মন্ত্র যথা,—

ওঁ কামাখ্যা কামদা নিত্যা ভবমঙ্গলদায়িনী।
মনোঽভীষ্ট সংদাত্রী ভূয়ো দেবি নমোঽস্তুতে॥

ধ্যানমন্ত্র যথা,—

ওঁ রবিশশীযুতবর্ণা কুঙ্কুমা পীতবর্ণা।
মণিকনকবিচিত্রা লোলজিহ্বা ত্রিনেত্রা।
অভয়া বরদহস্তা সাক্ষসুত্রা প্রশস্তা।
সুরগুরু নরসেব্যা সিদ্ধি কামেশ্বরী সা॥

(১৫) ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপ লৌহিত্যমে হর।

(১৬) দর্শনাৎ যস্ত লোকানাং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

ব্রহ্মপুরাণ।

মুসলমান তীর্থ।

পেঁড়ো।

কলিকাতা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে পাণ্ডুয়া ভাড়া কেবলমাত্র ॥৹ আনা। পেঁড়ো মুসলমানদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানকার মস্‌জিদ একটী প্রধাম দেখবার জিনিষ। ইদ ও মহরম উপলক্ষে এখানে ১৫ দিন ধোরে মেলা হয়। মুসলমান মাত্রেরই ইহা দেখা উচিত।

মৌলা খাস।

কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলে কৃষ্ণগঞ্জ ভাড়া ৸৵৫ আনা। এখান হইতে মাটিয়ারী দেড় ক্রোশ মাত্র দূর। অম্বুবাচী উপলক্ষে এখানে ২০৷৩০ হাজার মুসলমান এসে থাকে এবং সেই উগলক্ষে মেলা।

মক্কা।

এখানে ধর্ম্মবীর মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁর চিহ্নের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাড়ী আর তার চারদিকে অনেকগুলি মস্‌জিদ আছে। মুসলমান ফকিরেরা তাই দেখতে বৎসর বৎসর মক্কা যাত্রা করে।

মদিনা।

এখানে মহম্মদের সমাধিমন্দির আছে। এখানেও মুসলমান ফকিরগণ ধর্ম্মের জন্য গিয়া থাকেন। এখানকার "রৌসন মস্‌জিদ" আর "অবাক মুরদ" দেখবার জিনিস।

জুম্মা মসজীদ।

দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ দেখবার জিনিস। অতি উচ্চ চাতালের উপর তিন ধারে চকবন্দী অসংখ্য ঘর। এখানে সাধু ফকিরেরা বাস করেন। মস্‌জিদ ঘর পশ্চিম দিকে। এখানে সর্ব্বদাই লোকের ভিড়। কেহ কোরাণ পোড়ছে, কেহ পারসী বয়েৎ দিয়ে মহম্মদের মহিমা কীর্ত্তন কোচ্চে, নেমাজের সময় হলে অসংখ্য যবন কাতারে কাতারে এসে সারি সারি নেমাজ পোড়ছে। লোকের ভিড় আর কমে না। উঠানে এক পাথরের চৌকা, নিত্যই জলে পূর্ণ থাকে। এই জলে মস্‌জিদ বাসীদের আবশ্যকীয় কাজ নির্ব্বাহ হয়। ফোয়ারা হতে আপনা আপনি জল এসে

এই চৌকা সর্ব্বদাই পূর্ণ রাখে। এখানকার মুসলমানেরা সকলেই সম্পন্ন সকলেই ঘোরতর বাবু! এরা কেবল সেলাম, আদব কায়দা, আর বাবুগিরি নিয়েই আছে। এখানকার মুটে মজুর পর্য্যন্ত বাবু।

খৃষ্টীয় তীর্থ।

হলিল্যাণ্ড।

হলিল্যাণ্ড এসিয়া মাইনরে অবস্থিত। ষ্টীমারে অনেক বেশী খৃষ্টান গিয়া থাকেন। এখানকার দেখবার জিনিসের মধ্যে,—যিশুর মাথার চুল, পিটরের দন্ত, মাদার মেরীর গাউন, আর যোহনের রক্ত। কত বৎসর হয়ে গেল, যিশুর জন্ম হয়েছিল কিন্তু আজও সেই সব দেখতে খৃষ্টান তীর্থযাত্রীর অপার আনন্দ।

বিবিধ তীর্থ।

বুধগয়া।

গয়ার সন্নিকট। ভারত যখন বামাচারীর অত্যাচারে টলটলায়মান হইয়াছিল, দেবদেবীগণের প্রীতির জন্য যখন ভক্তগণ পাষাণে বুক বাঁধিয়া নরবলী পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, নরশোণিতে যখন ধরণী ভাসমান হইয়া উঠিয়াছিল, অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের যখন কেহ ছিল না, তখনই ভগবানের অষ্টমাবতার বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া, ধরায় সেই জীব-হিংসা নিবারণ করেন। তিনিই "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মন্ত্রে জীবগণকে অনুপ্রমাণিত করিয়া, ধরায় জীবক্ষয় রক্ষা করেন। তাঁহারই এই মন্দির বুদ্ধগণের ইহা পরম তীর্থ। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন, বুদ্ধদেবের স্মৃতি চিহ্ন পুনরুদ্দীপ্ত করিবার জন্য সকলেরই বুধগয়া দর্শন করা আবশ্যক।

জাফরাহুন।

এই দেবতা কাবুলের হীরাণ নামক স্থানে অবস্থিত। ইনি মহম্মদের অংশাবতার। প্রবাদ আছে, বীরধর্ম্মে দীক্ষিত ও ধরার শস্য বৃদ্ধির জন্য ইনি ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েন। কাবুলের এই তীর্থ, কাবুলীরা ভক্তি-সহকারে দর্শন করেন।

ফারাতারা।

ভুটীয়াদের একমাত্র নিস্তার কর্ত্তা। ভগবানের অংশ ধরণীতে আসিয়া, জীবরক্ষা করিতে যে মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, ফারাতারা সেই মুর্ত্তি।

মৌঞ্জিল।

লঙ্কাদ্বীপে যে সমস্ত মুসলমান আছে, মৌঞ্জিল তাহাদের নিস্তারের জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের বিশ্বাস, মৌঞ্জিলকে ভোগ না দিলে, জীবের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

মারং ভুরু।

ইনি সাঁওতালদিগের দেবতা। ইহার মন্দির খাসিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে পর্ব্বত কাটিয়া সাঁওতালগণ প্রস্তুত করিয়াছে। ইহার উদ্দেশে প্রত্যহ শূকর বলি হয়। মারংভুরু নাম স্মরণ করিলে, পার্ব্বতীয়গণ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেও বিদ্বেষীকে ক্ষমা করে।

মাং চাউঙ।

চীনেরা অতি ভক্তিভাবে এই দেবতা পূজা করে। ইনি ধরণীর জল-প্লাবনের সময় জলের উপর অবস্থাপিত ছিলেন। ইনি নাকি লোকের মন বুঝিয়া, তাহার ভালমন্দের বিচার করেন। বিবাহকালে সর্ব্বাগ্রে ইহার উদ্দেশে পূজা না দিলে, বিবাহে মঙ্গল হয় না বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস।

দাউদ খাঁ।

তুরকীরা ইহাকে অতি সাদরে পূজা করে। ইনি পূর্ব্বে মহম্মদের প্রধান সাধক ছিলেন। সুকৃতি বলে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুদ্ধে, মরণে, ভোজনে, সর্ব্বকালে ইহার নাম স্মরণ না করিয়া, তুরস্কবাসীরা কোন কার্য্য করে না।

জমা মা।

গারোদিগের একমাত্র দেবতা। ইহার পূজা ও বলি পক্ষী দিলেই উত্তম হয়। গারোরা ইহাকেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী বলিয়া জানে।

ব্রত-তত্ত্ব।

ব্রতের উদ্দেশ্য কি ?

হিন্দু বলেন, ব্রত অক্ষয় ফলপ্রদ। ব্রত করিলে ব্রতফল ব্রতাচারীর অবশ্য প্রাপ্তব্য। ব্রতে ঐহিক সুখ ও পরলৌকিক শান্তি লাভ হয়। ইহকালে পুত্রপৌত্রাদি পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া ধনধান্য পরিপূর্ণ সংসারে বসতি করেন এবং মৃত্যুর পর ইপ্সিত লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বাসনা পূর্ণ করিবার একটী প্রধান উপায় ব্রতানুষ্ঠান। এই বিশ্বাস আছে বলিয়া হিন্দুনারী ব্রতাচরণ করেন। এই ফললাভ করিবার জন্য অস্ফুটবাচা বালিকা, প্রাতর্ভোজন যাহার অভ্যাস, সেই বালিকা উপবাসবিশুষ্কমুখে ছোট ছোট ব্রত গুলির অনুষ্ঠান করে।

বৈজ্ঞানিক বলেন, ব্রত পারলৌকিক সুখ দিতে পারুক বা নাই পারুক, ইহকালে সুখ দান করিয়া থাকে। তিথিনক্ষত্রাদির সহিত,—গ্রাহকগণের সহিত মনের—দেহের সংস্রব থাকায় গ্রহনক্ষত্রানুসারে দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ঐ সময় স্বাস্থ্যরক্ষা করা অতি আবশ্যক, এই জন্য প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ সেই সেই সময়ের উপযোগী পানভোজন ও উপবাসাদির বিধি করিয়া তাহাতে লৌকিক সুখের প্রলোভন সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু স্বর্গ কামনায় সকলই পারেন। সেই জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি পুণ্যজনক ব্রতাচরণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কি বৈজ্ঞানিক মত, কি পৌরাণিক মত, উভয় মতেই ব্রতের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে ব্রতাচরণে আর বাধা কি? ফললাভ ত অবশ্যম্ভাবী।

বৈশাখ মাসের ব্রত।

ফলসংক্রান্তি ব্রত।

প্রথমে স্বস্তি বাচক পূর্ব্বক সংকল্প করিবে। শ্রীমতী অমুকী দেবী বহুপুত্র বৈধ্যকামা নারিকেলজাতিফলাদি নানা ফলদান পূর্ব্বক ফল

সংক্রান্তি ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। তৎপরে গণপতি ও লক্ষ্মী নারায়ণের ষোড়শোপচারে পূজা বিহিত।

ব্রতকথা।—পিতামহ ভীষ্মকে রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন, পিতামহ! কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিলে বন্ধ্যা বহুপুত্রবতী হইতে পারেন, সেই কথা আমাকে বলুন। মহারথী ভীষ্ম কহিলেন, বয়স্য! শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, যে নারী ভক্তি সহকারে এই ফলসংক্রান্তি ব্রত ধারণ করেন, কেবল তিনিই উক্ত ফল লাভে সমর্থ হয়েন। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরাবধি প্রতি সংক্রান্তিতে ফলদান করিবে। বৈশাখে স্ববস্ত্র নারিকেল, জ্যৈষ্ঠে আমলকী, আষাঢ়ে এলাচ, শ্রাবণে দাড়িম্ব ভাদ্রে তাল, আশ্বিনে কতবেল, কার্ত্তিকে নাগরঙ্গলেবু, অগ্রহায়ণে হরিতকী পৌষে সুপারী, মাঘে কক্কোল, ফাল্গুনে শ্রীফল এবং চৈত্রে ঐ যাবতীয় ফল দ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণকে অর্চ্চনা করিবে।

অক্ষয়া ব্রত।

স্নানান্তে বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবে। তৎসদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং তিথাবারভ্যাষ্টবর্ষ যাবৎ প্রতিবর্ষ বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায়াং মোক্ষয়ায়াং যুগদ্যায়াং যথানাম গোত্রঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ সূর্য্য-লোক গমন কামোবা গণপত্যাদি দেবপূজা পূর্ব্বকং সভোজ্য বস্ত্রব্যজনান্বিতং জলপুর্ণঘটং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণয়ে দান পূর্ব্বকমক্ষয়া ব্রতমহং করিষ্যে। এই বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে সূর্য্য ও গণেশ পূজা করিবে। তৎপরে কূর্ম্মায়, হরায়, নৃসিংহায়, বামনায়, রামায়, পরশুরামায়, কল্কিশায়, রুদ্রেভ্যঃ, যমেভ্যং, আদিত্যেভ্যাঃ, বসুভ্যঃ সরস্বতৈ, গোবিন্দায় দামোদরায়, হৃষীকেশায়, দেবেভ্যঃ, মুনিভ্যঃ পূজা করিবে।

ব্রতকথা।—ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সৌনক! আমাকে অক্ষয়া ব্রতের উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করুন। সৌনক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পুরাকালে ধর্ম্মবিবর্জ্জিত এক ব্রাহ্মণ বসতি করিত। সে অতি নিষ্ঠুর ও অপ্রিয়বাদী ছিল। একদিন এক ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ শুষ্ককণ্ঠে তাহার গৃহে সমাগত হইয়া

কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আমাকে জল ও অন্ন দান করিয়া জীবন রক্ষা করুন। ব্রাহ্মণ কহিল, আমার অন্ন, জল, আসন, কিছুই নাই। অন্যত্র অনুসন্ধান কর। তৃষ্ণার্থ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ন হইলেন। তখন দ্বীজপত্নী ধর্ম্মশীলা পতিকে কহিলেন, "আমাদের এই ঐশ্বর্য্য ও ধনের আবশ্যক কি? যখন ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বিমুখ হইতেছেন? ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মশীলা সমাদরে উপবেশন করাইয়া ত্বরায় অন্ন ও জল দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মশীলা স্বকৃতপুণ্যে অক্ষয় স্বর্গ ও স্বীয় পুণ্যে দুরাচার স্বামীকে পর্য্যন্ত স্বর্গগামী করেন। এই ঘটনা বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত ফলকামনায় ঐ দিনেই এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সীতানবমী ব্রত।

পূর্ব্বদিন সংযমন ও সন্ধ্যাকালে অধিবাস করিবে। ব্রত দিনে প্রাতঃস্নান করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে সস্তিবাচন পূর্ব্বক সংকল্প করিবে। বিষ্ণোর্মোহদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বা দাসী ধনধান্যবৈধব্য অন্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্ব্বকং শ্রীজানকী পূজোপবাস ভবিষ্যপুরাণোক্ত কথা শ্রবণরূপ সীতানবমীব্রতমহং করিষ্যে পরে ঘটস্থাপন করিয়া আসনশুদ্ধি ও গণপত্যাদি পূজা করিবে। পরে জানকীকে ধ্যান (১) করিবে ও জনককে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। (২) পরে যথানিয়মে হোম কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পূজা শেষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরদিন পূজা করিয়া জানকী বিসর্জ্জন দিয়া কথা শুনিবে।

ব্রতকথা।—শিব কহিলেন, হে গৌতম! সীতানবমী ব্রত করিয়া ব্রতাচারী কিরূপ ফব প্রাপ্ত হয়েন, তাহার বিবরণ বর্ণন কর। গৌতম কহিলেন, হে স্থাণু! যে তিথিতে সীতাদেবী জনকালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন,

---

(১) চতুর্ভুজাং সুবর্ণাভাং রামালোকন তৎপরাং।
শ্রীরাঘবন্বিতাং সীতাং চিন্তয়েচ্চৃদ্ধি সর্ব্বদা।

(২) দেবী পদ্মালয়া সাক্ষাদবতীর্ণা যদালয়ে।
মিথিলা আলয়ে তস্মৈ জনকায় নমোনমঃ॥

যেই তিথি অনুসারে উৎসব করিলে পরমা প্রকৃতি জানকী দেবী প্রসন্না হইয়া ব্রতাচারিণী রমণীর তদ্রূপ ফল দান করেন। তিনি ইহলোকে পতিব্রতা ও পরলোকে স্বামীপুত্র সহিত অশেষ সুখ ভোগ করেন।

রুক্মিণী ব্রত।

প্রথমে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বক্ষ্যরেঁা তৎসদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লপক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী :দেবী বা দাসী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম পুত্রপৌত্রাদনবচ্ছিন্ন সন্ততি ধনধান্যসৌভাগ্যাদি প্রাপ্তান্তে বিষ্ণুলোক প্রাতিকা-মাদ্যারভ্য বর্ষ চতুষ্টয় পর্য্যন্তং যাবাৎ রুক্মিণী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শীলা স্নান করাইয়া যথাশক্তি পূজা ও প্রার্থনা করিবে।

ব্রতকথা।—রুক্মিণীদেবী এই ব্রত করিয়া ভগবান কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েন। বিষ্ণু কহিয়াছেন, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক রুক্মিণী ব্রত উদ্যাপন করেন, অক্ষয় বিষ্ণুলোক তাহার করতলগত হইয়া থাকে।

নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত।

পূর্ব্বদিন সংযমন করিয়া পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণু রেঁা তৎসৎ অদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বকং সলক্ষ্মীক শ্রীভগবান্ নৃসিংহ পূজা ব্রতোপবাস বৃহন্নারসিংহপুরাণোক্ত নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতকথা শ্রবণ কর্ম্মাহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে আসন শুদ্ধি ও ন্যাশাদি করিরা গণপত্যাদি পূজা করিবে। প্রথমে ধ্যান দ্বারা প্রহ্লাদকে পূজা করিবে। (৩) পরে নৃসিংহকেও ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়া পূজা করিবে। (৪) পরে যথা শক্তি নৈবেদ্য ও কুসুমচন্দনাদি নিবেদন করিবে।

(৩) প্রহ্লাদ ক্লেশনাশায় যাহি পুণ্যাচতুর্দ্দশী।
পূজয়েৎ তত্র যত্নেত হরেঃ প্রহ্লাদনমস্ততেঃ॥

(৪) মানিক্যাদি সমপ্রভঃ নিজরুচ সদত্রস্তরক্ষোগণং জানুনস্তে।
কর্ম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লাসৎ ভূষণং বাহুভ্যাং॥

ব্রতকথা।—প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নৃসিংহ! জীব কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার প্রীতিসম্পাদন করিতে পারে, তাহাই আমাকে বলুন। নৃসিংহ কহিলেন, বৎস! সেই গুপ্তকথা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পুরকালে অবন্তিনগরে বসুশর্ম্মা নামক এক দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রিয়বাদিনী সাধ্বী স্ত্রীর সহিত বসতি করিতেন। তাঁহার পাঁচ সন্তান। সকল সন্তানই পিতার অনুরূপ, কেবল কনিষ্ঠপুত্র সর্ব্বদা মদ্যপান ও বেশ্যার অনুরক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠের প্রতি সমধিক স্নেহবান হওয়ায় পুত্রের মতি পরিবর্ত্তনার্থ অনেক যত্ন করিলেন। পরিশেষে পুত্রের মঙ্গলকামনায় ব্রাহ্মণ একযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়ায় ভগবান প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, এই ব্রত ধারণ করিলে তোমার পুত্র সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া পরিণামে গোলক ধাম লাভ করিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্রত।

সাবিত্রী ব্রত।

পূর্ব্বদিন সংযমন করিয়া ব্রতের দিন কুশজলতিলপূর্ণ তাম্রপাত্র হস্তে লইয়া পূর্ব্বমুখে শ্রীবিষ্ণের্নমোহদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রী অমুক দেবী বা দাসী বিত্তভোগ্যবৈধব্য চিরজীবি পুত্রকামা চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্তং কথা শ্রবণরূপ সাবিত্রী ব্রতমহং করিষ্যে এই বলিয়া তিল জল ঈশানে নিক্ষেপ করিয়া সংকল্প করিবে। পরে বটমূলে ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক সাবিত্রীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। (৫) পরে বিষ্ণু রূপ ও গণপত্যাদি যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। তৎপরে অন্যান্য পূজা পদ্ধতির অনুসরণ কর্ত্তব্য।

ব্রতকথা।—স্ত্রীর পতিব্রতা হওনের উপায় রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! মদ্রদেশে এক ধর্ম্মশীল

ধৃত শঙ্খচক্র মনিশং দংষ্ট্রোগ্র বক্তোল্লাসৎ জ্বাল।
জিহ্বামুদার কেশব চরণং বন্দে নৃসিংহং বিভুং॥

(৫) সাবিত্রং বরাঙ্কুশাভয় করং পাশং কপালং গদাং শঙ্খং।
চক্রমথার বিন্দুযুগলং হস্তৈর্বহন্তীং ভজে॥

নরপতি ছিলেন। তিনি পতিব্রতা পত্নীর অনুরক্ত প্রজার পতি ছিলেন। কিন্তু পুত্রবদনদর্শন সুখে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখিতান্তকরণে অবস্থান করিতেন। তিনি পুত্রকামনায় এই সাবিত্রীব্রত ধারণ করিলেন। বেদমাতা সাবিত্রী চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে প্রত্যক্ষ হইয়া রাজাকে বরপ্রদান করে। সাবিত্রী বরে এক কন্যা সঞ্জাত হওয়ায় রাজা কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। এই কন্যার সহিত সত্যবানের বিবাহ হয়। (অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সত্য-বানের মৃত্যু ও যমরাজ কর্ত্তৃক বর প্রাপ্ত হইয়া সাবিত্রী পতির জীবন রক্ষা করেন। তৎকথা কীর্ত্তন করিতে হইবে।)

অরণ্যষষ্ঠী ব্রত।

জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতে প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণু নমোঽদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি, শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী শুভ সন্ততিকামা বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দষষ্ঠী পূজারিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দষষ্ঠিকে ধ্যান ও পূজা করিবে।

ব্রতকথা।—সাধুশ্রেষ্ঠ সমুদ্রসেনের অতি শোভনা সুমনা নাম্নী এক কন্যা ছিল। তিনি হিরণ্যরাজের পুত্র বিদুরকে সেই কন্যা দান করেন। বিদুর বাণিজার্থ গমন করিলে সুমনা অতিকষ্টে শ্বশ্রূ ও ননন্দাগণের সহিত অরণ্যবাসিনী হয়েন। সুমনা সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে অম্বিকা দেবীর পূজা করেন। সুমনার পূজায় সম্প্রীত হইয়া ভগবতী বৃদ্ধার বেশে উপস্থিত হইয়া অরণ্যষষ্ঠি ব্রত ধারণের অনুমতি করেন। সুমনা এই ব্রত পালন করায় বাণিজ্যগামী পতি প্রাপ্ত হয়েন এবং কালে বহুসন্তান লাভ করিয়া পরিশেষে গোলক প্রাপ্ত হয়েন।

---

(৬) দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
দিব্য বস্ত্র পরিধানাং বাম ক্রোড়ে স পুত্রিকাং।
প্রসন্নবয়দাং মিত্যাং জগদ্ধাত্রী সুখপ্রদাং॥

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত।

মঙ্গলবারে ধনধান্য সম্পত্তিকামা বা মঙ্গলচণ্ডীকা মজামহং করিষ্যে এই মন্ত্রে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি চণ্ডী পূজা করিবে।

ব্রতকথা।। রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কহিতেছেন; সত্যযুগে অঙ্গ নামক মহাতপ নরপতি ব্রতবতী সুনীথা নাম্নী মহিষীর সহিত বসতী করিতেন। সুখৈশ্বর্য্যের অভাব না থাকিলেও একমাত্র পুত্রাভাবে রাজা সর্ব্বদাই কাতর ছিলেন। একদা রাজা পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নারদ ঋষি তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল ও কামনাসিদ্ধির উপায় কহিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি ভার্য্যার সহিত ভক্তিভাবে মঙ্গলপ্রদা মাতা চণ্ডীকার পূজা করুন, তাহা হইলেই কমেনা সিত্তি হইবে। দেবর্ষির বচনে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সেই ব্রতাচারণ করিলে এক দিব্য লাবণ্য সম্পন্ন কুমার প্রাপ্ত হয়েন।

আষাঢ় মাসের ব্রত।

মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত।

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় স্নান করিয়া দিবাভাগে বিষ্ণু পূজা ও রাত্রিতে চন্দ্রার্ঘ্য এবং চন্দ্রোদয়ে পূজা করিবে।

ব্রতকথা।—পুরাকালে হয়শীর্ষ নামক দরিদ্র মনোরথ পূর্ণ কামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। দুই বৎসর ব্রতপালন করিলে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বর দ্বারা তাঁহার ইহলোকে রাজ্যপ্রাপ্তি ও পরলোকে স্বর্গ ভোগের বিধান করেন।

শ্রাবণ মাসের ব্রত।

নাগ পঞ্চমী ব্রত।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত কর্ত্তব্য। ব্রতের দিনে প্রাতঃস্নান ও স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক প্রথমে মনসাকে ধ্যানদ্বারা পূজা

করিবে (১) এবং দুগ্ধ ও কদলী প্রভৃতি নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। নাগগণকে পূজা করিবে। (২) প্রাঙ্গনে গোময়ের উপর মনসা বৃক্ষের শাখা প্রোথিত করিয়া তাহাতেই মনসা দেবীর পূজা করিবে।

সুবচনী ব্রত।

স্নানান্তে অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী সর্ব্বাপদচ্ছান্তি পূর্ব্ববৎ মনোভিষ্ট সিদ্ধি কামা সুবচনী দুর্গাপূজা ও তৎকথা শ্রবণ কর্ম্মাহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি পূজার পর সুবচনীর ধ্যান ও পূজা করিবে (৩) পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইবে।

ব্রতকথা।—কলিঙ্গ দেশে দিনপাত অচল এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পুত্র সহ বসতী করিতেন। কালে তিনি ভিক্ষাদ্বারা পুত্রের উপনয়ন সংকার নির্ব্বাহ করিলেন। পাঠশালার অন্যান্য ছাত্রগণকে নানাবিধ খাদ্য ভোজন করিতে দেখিয়া দরিদ্রের সন্তান বড় ব্যথা পাইতেন। মাতাও যারপরনাই সন্তাপিত হইতেন। একদা পুত্র জননীকে মৎস্য মাংস রন্ধন করিতে বলিলে মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পুত্র কহিলেন, আমি আজ মাংস

---

(১) দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তি বদন্যাং
হংসারূঢ়ামুদারামারুনিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব।
স্মেবাস্যাং মন্ডিতাঙ্গী কর্ণকমর্ণিগণৈ নাগরত্নৈরণেকৈঃ।
বন্দেঽহং সাষ্ট নাগামুরুকুচযুগলাং যোগিনীং কামরূপাং
(২) অনন্তং বাসুকিং শঙ্খং পদ্যং কমলমেবচ।
তথা কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ সম্বাকং॥
কালী য়ং তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মাণ ভদ্রকম।
যঃ ভক্তানসিতে নাগান দষ্টমুক্তো দিবং ব্রজেৎ॥
(৩) ওঁ রক্তপদ্ম চতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না চাম্বিকা দেবী।
পীনোন্নত কুচা দুকুল বসনা হংসারূঢ়া পদ্মিনী।
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা নানালঙ্কার ভূষিতা।
ধ্যেয়সি সুবচনী শুভাং সর্ব্বপাপ বিনাশিনী।

আনিয়া দিব। এই বলিয়া রাজার হংসশালা হইতে একটি খোঁড়া হাঁস আনিয়া গোপনে রন্ধন ও ভোজন করিলেন। হংসপালকগণ রাজার আদেশে চারিদিকে চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণ-তনয়ের ভস্মকুণ্ডে পক্ষ পতিত দেখিয়া রক্ষীগণ বালককে রাজাদেশে বক্ষে শীলা দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এদিকে ব্রাহ্মণী পুত্রশোকে যারপর নাই শোকাকুলা হইলেন। প্রতিবেশীর পরামর্শে নগরস্থ সুবচনী পূজা করিলে সুবচনী দুর্গা রাজাকে স্বপ্ন দেখাইয়া দ্বীজপুত্রের উদ্ধার সাধন করেন। রাজা দ্বীজতনয়কে বহু অর্থে সন্তুষ্ট ও স্বীয় কন্যা দান করিয়া অপরাধের ক্ষমা পাইলেন। এমন সঙ্কটে সুবচনীদুর্গা ব্রতাচারীকে রক্ষা করেন।

ভাদ্রমাসের ব্রত।

জন্মাষ্টমী ব্রত।

ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য ভাদ্রেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে রোহিণ্যাষ্টম্যান্তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোক গমনকামো শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস কর্ম্মাহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। (১) কৃষ্ণমূর্ত্তি কল্পনায় গুড় ঘৃতাদি দ্বারা প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি নাড়ীচ্ছেদ হইতে নামকরণ পর্য্যন্ত কার্য্যসমাধা করিবে। পরে বিধানানুরূপ পূজা করিয়া নমস্কার করিবে। (২) পরদিনও পূজা কর্ত্তব্য।

---

(১) মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনং।
শ্রীবৎস বক্ষপূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিং।
শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ইতি নমস্কার।

(২) ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনং।
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং।

Talk much and err much,

ব্রত কথা।—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কংসবধ ও ব্রজলীলা পর্য্যন্ত ইতিহাস কথা ব্রতকালে কথিত হইয়া থাকে।

অঘোর চতুর্দ্দশী ব্রত।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য ভাদ্রেমাসি সিংহরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথাবারেভ্যঃ প্রতি সংবাৎসরিক ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাং বর্ষ চতুষ্টয়াং যাবৎ অঘোর চতুর্দ্দশী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে গণেশাদি পূজা সমাপ্ত করিয়া ক্ষীর রচিত শিবলিঙ্গ মানপত্রে স্থাপিত করিয়া প্রতি প্রহরে পূজা করিবে। পরে কথা শুনিয়া লিঙ্গ বিসর্জ্জন দিবে। পর দিন পারণ করিবে।

ব্রতকথা।—একদা পার্ব্বতী যমরাজ ভবনে গমন পূর্ব্বক নানাবিধ পাপী ও তাহাদিগের দারুণ দুর্গতি দর্শনে কৈলাসে প্রত্যাগতা হয়েন। দেগদেব পশুপতির নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান পশুপতি কহিলেন প্রিয়ে! ব্রহ্মঘাতী, পিতৃহন্তা, গোঘ্ন, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী, পতি, দেব, গুরু, বন্ধু ও শ্বশ্রূ ভেদকারী, হিংসা দ্বেষ ও বারাঙ্গনাপ্রিয়গণ সর্ব্বদাই নরক ভোগ করে। হে শঙ্করি! এই সমস্ত পাপ নিরাকরণ করিবার যে উপায়, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, উক্ত পাপে সংলিপ্ত থাকিলেও তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না।

তুলসী ব্রত।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং।
গোবিন্দমচ্যুতে দেব প্রমথেশ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরং।
পীতাম্বরং ধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতং।
শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিং।
ত্রাহিমাং দেবদেবেশ ততো নান্যোস্মি রক্ষিতা॥

পরে তুলসীতলে নানাবিধ উপচারে গণপত্যাদি দেবতা ও তুলসী পূজা করিবে। পূজা শেষে স্তুতি পাঠ করিয়া পূজা শেষ করিবে। (১)

ব্রতকথা। বনবাসে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক জনার্দ্দনের পরিতুষ্টির উপায় কি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সাধ্বি! আমি তোমাকে সে কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীব বিবিধপাপে সংলিপ্ত, এমন কি বিষ্ণুবিদ্বেষী হইয়াও যদি তুলসী ব্রত করে, তাহা হইলে, বিষ্ণু তৎপ্রতি সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকেন।

হরিতালিকা ব্রত।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণোর্নমোহদ্য ভাদ্রে মাসি সিংহরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে হস্তানক্ষত্রাধিকরণকা তৃতীয়ায়াং তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী ভবানীশঙ্কর প্রতিকামা হরিতালিকা ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প ও যথাবিধি গণপত্যাদি পূজা করিবে। পরে বালুকাতে হরগৌরীর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ধ্যান (২) দ্বারা পূজা করিবে। পরে অষ্টশক্তির পূজা করিয়া পূজা শেষ করিবে। (৩)

ব্রতকথা।—পরমা প্রকৃতি শঙ্করী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পশুপতি কহিয়াছেন যে নিয়ম পূর্ব্বক যে নারী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, আমি সপরিবারে তাহার গৃহে সর্ব্বদাই অবস্থান করি।

---

(১) নমামি তুলসী দেবীং তাং বৈ পতিতপাবনীং।
বিষ্ণুরূপধরাং নিত্যং সর্ব্বদেবেষু পূজিতাং।
নমস্তে জগতাং মাতস্তুলসীদুর্গমোক্ষদে।
তৎপ্রসাদ তে সর্ব্বং সিদ্ধিসৌভাগ্যবৰ্দ্ধিতং।

(২) দেবং পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভুজং চন্দ্রচূড়ং বৃষারূঢ়ং।
অস্থিমালাধরং দেবং নাগযজ্ঞোপবীতিনং।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং শঙ্করী সহিতং সদা।
বালুকা বিহিতে স্থিত্বা পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে।

(৩) প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী তথা।
সুপ্রভা বিজয়া চৈব অষ্টশক্তি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দুর্ব্বাষ্টমী ব্রত।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ভাদ্রে মাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অবিচ্ছিন্ন সন্ততি প্রতিকামা অদ্যারম্ভ অষ্টবর্ষ নিষ্পাদিত গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্ব্বক সলক্ষ্মীক বিষ্ণু দুর্ব্বারাধন পূর্ব্বক দুর্ব্বাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করত গণপত্যাদির বিহিত পূজা করিবে। মণ্ডল মধ্যে দুর্ব্বা স্থাপন পূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণে ধ্যান করিবে। (৪) পরে আধার মধ্যে অনন্ত, পৃথিবী বহ্নিমণ্ডল, প্রকৃতি পূজা করিবে। পরে দুর্ব্বার ধ্যানে তাঁহার অর্চ্চণা করিবে। (৫) পূজা শেষে হরিদ্রা ও ঐ দুর্ব্বাবদ্ধ সূত্র ধারণ করিবে।

ব্রতকথা।—যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে কৃষ্ণ কহিয়াছেন, দুর্ব্বা বিষ্ণুর দেহোদ্ভূত এবং পবিত্র। দুর্ব্বাষ্টমী ব্রতাচরণে পুত্র ও স্বর্গ লাভ হয়।

রাধাষ্টমী ব্রত।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক গণেশাদি পূজা করিবে। পরে রাধিকার পূজা ও ধ্যান করিবে। (৬) এবং পূজা অন্তে কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণ কহিয়াছেন, নারদ। আমি স্বীয় পূজা অপেক্ষা পরমা প্রকৃতি রাধার পূজায় সমধিক প্রীত হই, যেহেতু তাহাতেই জগতের উদ্ভব। তিনিই সব। যিনি ভক্তিভাবে রাধাষ্টমী ব্রতাচরণ করেন, তিনিই আমার অতি প্রিয় হয়েন।

(৪) শঙ্খচক্রধরং দেবং চতুর্ব্বাহুং কিরিটীনং।
শ্রীবৎসলাঞ্ছণোপেতং পীতবাস ধরং শুভং॥
নানালঙ্কার সংযুক্তং শ্রীয়াবাল্য সমন্বিতং।

(৫) ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামং সর্ব্বদেবাসুরাঃ ধৃতাং।
বিষ্ণুদেহোদ্ভবাং পুণ্যাং অমৃতৈ রভিষেচিতং।
সর্ব্বৈশ্বরজয়া দুর্ব্বাং অমরা বিষ্ণুরূপিণীং।
দিব্য সন্তান সংদাত্রী ধর্ম্মার্থ কামসিদ্ধিদং॥

(৬) ওঁ স্মেরাননা গোরোচনাভ্যাং স্ফুরদরুণ পটপ্রান্ত হরিমুখ কমলে
যুঞ্জীতং নাগবল্লীং।
পর্ণ কর্ণারতাক্ষীং ত্রিজগত মধুরং রাধিকাং ভাবয়ামি।

বুধাষ্টমী ব্রত।

শুক্লমাসে বুধবারে অষ্টমী তিথিতে ব্রত করিতে হইবে। স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শত কপিলা সহস্র গজবাজী সহস্র কন্যা শত বাপীকুল সহস্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা জন্য সমফল কামো গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বকং বুধাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে বুধের ধ্যান (৭) ও ক্ষীরপিষ্টকাদি মোদক নৈবেদ্য দিবে। পরে নমস্কার করিবে। (৮)

ব্রতকথা।—পুরাকালে পাটলীপুত্রে বীর নামক এক দ্বীজ বসতী কবিতেন। তাহার কৌশিক নামে এক পুত্র ও বিজয়া নাম্নী এক দুহিতা ছিল। ব্রাহ্মণের নির্ধনতা হেতু তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল না। বিজয়া যৌবন সীমায় উপস্থিত হইয়াও অনুঢ়া থাকায় দ্বীজ বড়ই কাতর হইলেন। বিজয়া তদ্দর্শনে জীবন ত্যাগ কামনায় বনপ্রবেশ করিলেন। প্রথম দিন উপবাসে অতিবাহিত হইল। পরদিন বিজয়া জীবন ত্যাগ কামনায় প্রার্থনা করাতে ভগবান আবির্ভুত হইয়া "অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হও" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। বিজয়া বুধবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বুধাষ্টমী ব্রতের নিয়ম হইয়াছে। বুধাষ্টমী ব্রত অনুষ্ঠান করিলে কি পুরুষ, কি স্ত্রী উভয়েই অনুরূপ পতি বা পত্নী লাভ করেন এবং দারিদ্র দুঃখ বিমোহিত হইয়া পারলৌকিক সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

তাল নবমী ব্রত।

স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক ওঁ তৎসৎ অদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লেপক্ষে নবম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী ধনধান্যসুখসৌভাগ্যারোগ্যকামা

(৭) বুধং পীতবাসনং দ্বিভুজং সর্ব্বালঙ্কার ভুষিতং।

(৮) ক্ষত্রিয়ায় নমস্তভ্যং বুধায় বরদায় চ।
অনারাধ্য বুধষ্টম্যাং প্রাপ্যতে ফলমিপ্সিতং।

সালক্ষ্মীকং বিষ্ণুপূজা এবং তৎকথা শ্রবণরূপ তালনবমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী পূজা করনান্তর তাল পিষ্টকাদি উৎসর্গ করিবে।

ব্রতকথা।—লক্ষ্মী দেবী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু কহিলেন, "নারায়ণী! আমি সত্য কহিতেছি, এই ব্রত পালন করিলে সে নারী কদাচিৎ বিধবা বা বন্ধ্যা হয় না। দারিদ্র দুঃখ তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। সে ইহলোকে পরলোকে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরজন্মে দেবত্ব লাভ করে।

অনন্ত ব্রত।

প্রথমে চারি বর্ণ গুঁড়ার দ্বারা অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তদোপরি ঘট স্থাপন ও তন্মুখে আম্রশাখা আরোপিত করিবে। তৎপার্শ্বে অনন্ত মূর্ত্তি বা নারায়ণ শীলা স্থাপন করিবে। তাহার চারিদিকে ধ্বজ ও তোরণাদি বিনস্ত করিবে। পরে স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎস্য আদ্য ভাদ্রে-মাসি শুক্লেপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বা দেবী ইথৈব ধনধান্যদ্যবচ্ছিন্ন বিপুলৈশ্চর্য্য সন্ততি পূর্ব্বকান্তি অনন্তলোক গমন কামোঽদ্যারম্ভ চতুর্দ্দশ্যবর্ষ পর্য্যন্ত শ্রীমদনন্ত প্রীতিকামো ভবিষ্যপুরাণোক্ত অনন্ত ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে আত্মশুদ্ধি ন্যাসাদি করিয়া যথা মন্ত্রে অনন্তদেবের পূজা ধ্যান (৮) ও প্রার্থনা করিবে। পরে চতুর্দ্দশগ্রন্থি সম্বন্ধ ডোর ধারণ করিবে।

ব্রত কথা।—(সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত, অতএব অনাবশ্যক)

(৮) শ্রীমদনন্তং শ্বেতবর্ণং চতুর্ভুজং।
দক্ষিণাধঃ করধৃতং শঙ্খ বামাধঃ করধৃতং পদ্ম
দক্ষিণোর্দ্ধ করধৃতং চক্র বামোর্দ্ধং করধৃতং গদা
নানালঙ্কার ভূষিতং।

☞ অনন্ত ব্রতের চতুর্দ্দশ ফল কথা,—কদলী নবনী ধাত্রী ক্ষিরীচ বদরী তথা। এলা হরিতকী জাতি শ্রীফলং নারিকেলকৈ। নাগরঙ্গঞ্চ জাম্বিরৈ পুগস্য কামরঙ্গকৈ।

আশ্বিন মাসের ব্রত।

বীরাষ্টমী ব্রত।

স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণুঃ অদ্যাশ্বিনেমাসি শুক্লপক্ষে মহাষ্টম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী সৌভাগ্যারোগ্যসৌন্দর্য্য প্রাপ্তি পূর্ব্বক চিরজীবি পুত্রকামা অদ্যারভ্য অষ্টবর্ষ পর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয় মহাষ্টম্যাধিকরণ গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বকং শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজা জলপূর্ণ ঘট দান ও কথা শ্রবণরূপ বীরাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে দেবী পূজা সমাধা করিয়া জলপূর্ণ ঘট উৎসর্গ করিবে। তাহার পর কুঙ্কুমসিক্ত অষ্টগ্রন্থি যুক্ত ডোর বাম হস্তে ধারণ করিবে।

ব্রতকথা।—পূর্ব্বকালে এক পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণে পতির মনোরঞ্জন করিলেও পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত বইয়া স্বামীর কোপে পতিতা হয়েন। যে নারী গর্ভধারণ করেন না, তাঁহার বর্ত্তমানেও পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী অতিমাত্র ভীতা ও শঙ্কাকুলিতা হইয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিজবেশধারী হরি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বীরাষ্টমী ব্রতাচরণে অনুমতি দান করেন। ব্রাহ্মণী সেই বাক্যের অনুরূপ ব্রতাচরণ করিয়া বীর পুত্রলাভ করায় সেই হইতে এই ব্রত প্রচলিত হইয়াছে। কুমারী এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া বীরপতি লাভ করিয়া থাকেন।

দুর্গাব্রত।

স্বস্তি বচন পূর্ব্বক কুশতিলজল হস্তে শ্রীবিষ্ণুর্মোদ্যাশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাং তিথাবারভ্যাষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীদুর্গা প্রতিকামা দুর্গা ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পঞ্চবর্ণ গুঁড়া দ্বারা মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক ঘৃত দীপ জ্বালিত করিয়া গণেশ ও দুর্গা দেবীর পূজা করিবে।

ব্রত কথা।—নারদ কহিলেন, সত্যযুগে সোমশাসন পত্তনে চতুরঙ্গ বলযুক্ত এক গণিকা ছিলেন। প্রথম বয়সে কদর্য্য-কার্য্য দ্বারা কলুষিত হইলে পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করধানন্তর এই ব্রতধারণ করিয়া পাপ নির্ম্মুক্ত হয়েন।

কার্ত্তিক মাসের ব্রত।

ভুতচতুর্দ্দশী ব্রত।

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে আপামার্গ পত্র মস্তকে রাখিয়া প্রাতঃস্নান করিবে। পরে যথাশক্তি শিবলিঙ্গ পূজা ও তৎ কর্ত্তব্য সমাধা করিবে।

ব্রত কথা।--এই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক ভূতচতুর্দ্দশী ব্রত যথানিয়মে অনুষ্ঠান করিলে শঙ্কর প্রীতি হেতু ব্রতাচারীর বাসনাসিদ্ধি হয়। একথা সদাশিব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

ভীষ্মপঞ্চক ব্রত।

একাদশী হইতে পাঁচ দিন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন হবিষ্যাসি হইয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দেবীর পূজা করিবে।

ব্রত কথা।—কথিত আছে, এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম অভিষ্ট বিষ্ণুচরণ লাভ করিয়াছিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসের ব্রত।

সর্ব্বজয়া ব্রত।

স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য মার্গশীর্ষে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথারভ্য বিষ্ণুপদী সংক্রান্ত্যাং সংবৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীয় সংক্রান্ত্যাং অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী সর্ব্বপাপবিমুক্তি গৌরীলোক

প্রাপ্তি কামা গণেশাদি নানাদেবতা পূজা পূর্ব্বকং গৌরী পূজা তৎকথা শ্রবণ রূপ সর্ব্বজয়া ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। গণেশাদি দেবতা পঞ্চ পূজা করিয়া দুর্গা পূজা করিবে এবং ধ্যান, প্রণাম ও নৈবেদ্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। (১) পরে কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

ব্রতকথা।—পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! কি উপায়ে নারী সর্ব্বজয়া হয়, সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পশুপতি কহিলেন, দেবি! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। নারী সর্ব্বজয়া নামক ব্রতানুষ্ঠানেই উক্ত ফল লাভ করেন। অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসে এক একটী দ্রব্য ভোগ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অগ্রহায়ণে শাক পৌষে ফল, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে গুপারী, চৈত্রে চন্দন, মাল্য ও কেশ বিন্যাস, বৈশাখে অন্ন, জ্যৈষ্ঠে ধারা জল, আষাঢ়ে দধি, শ্রাবণে বস্ত্র, ভাদ্রে বায়ু সেবন ও নূতন বস্ত্র, আশ্বিনে ঘৃত, কার্ত্তিকে শয্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই ব্রতাচরণ অতীব কঠিন।

মাঘমাসের ব্রত।

দধি সংক্রান্তি ব্রত।

স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ আদ্যমাঘেমাসি মকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী উত্তরায়ণ সংক্রান্ত্যাং সম্বৎসরং যাবৎ প্রতি মাসীয় সংক্রান্ত্যাং ইহইবধনধান্য-সুখ সন্ততি কামা গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বকং সলক্ষ্মীক বিষ্ণু পূজয়েৎ বলিয়া সংকল্প ও গণেশাদি পূজার পর বিষ্ণু পূজা করিবে। দধির সহিত ভোষ্য উৎসর্গ করা আবশ্যক।

---

(১) লক্ষ্মী স্বরস্বতী গঙ্গা যমুনা বিজয়া জয়া।
জয়ন্তি মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বাহা নমোহস্তুতে॥

ব্রতকথা।—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ লক্ষ্মীকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছেন, সংসারে দুঃখ নাশের উপায় এই ব্রত ধারণ। এই ব্রত যথানিয়মে আচরিত হইলে তাহার সাংসারিক দুঃখ থাকে না।

ষট্‌পঞ্চমী ব্রত।

স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক বিষ্ণোর্নমোহদ্য মাঘেমাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ ষড়বর্ষ যাবৎ প্রতি মাসীয় শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী ভবিষ্যপুরাণোক্ত ষট্ পঞ্চমী ব্রতং তৎফলং প্রাপ্তি কামা ষট্ পঞ্চমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে ভূত শুদ্ধি করিয়া গণেশাদি পূজার পর লক্ষ্মীনারায়ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

ব্রত কথা।—নারদ বৈকুণ্ঠবিহারী হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধুসূদন! কোন্ ব্রতের অনুষ্ঠানে নারীর অক্ষয় স্বর্গ ও ইহকালের সকল দুঃখ বিদূরিত হয়? ভগবান কহিলেন, নারদ! যিনি সৌভাগ্যরূপিণী, মোক্ষদা, তিনিই তোমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিতেছেন, শ্রবণ কর। লক্ষ্মী কহিলেন "বৎস! যে নারী মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসের পঞ্চমীতে লক্ষ্মীজনার্দ্দন পূজা করে সেই নারীকেই আমি অভিষ্ঠ ফল দান করিয়া থাকি।

ভৈমিকৈকাদশী ব্রত।

মাঘমাসের একাদশীতে আরম্ভ করিয়া যে ব্যক্তি ষড়বর্ষকাল এই ব্রত পালন করেন, তিনি সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধিহেতু অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন। ভুতভাবন ভগবান ভবানীপতি কহিয়াছেন নারদ! নিত্যসংযমী ও একাদশী ব্রত পরায়ণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

সন্তানদ্বাদশী ব্রত।

আচমন করিয়া বিষ্ণুর্নমোহদ্য মাঘেমাসি শুক্লেপক্ষে দ্বাদস্যাং তিথৌ

অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অদ্যারভ্যবর্ষমেকং যাবৎ প্রতিমাসে শুক্লদ্বাদশ্যাং গণপত্যাদি দেবতা পূজা পলৈক পরিমিতঘৃত করণক বাসুদেব স্নাপক পলৈক পরিমিত ঘৃত করণক বাসুদেবে সম্প্রদান পূর্ব্বক ব্রতমহং করিষ্যে এই বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে গোবিন্দকে পূজা ও নমস্কার করিবে। (১)

ব্রত কথা।—দিতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কশ্যপ কহিয়াছেন যে, হে দিতি! তুমি সর্ব্বাগ্রে সন্তানদ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান কর, যাহাতে তোমার পুত্রগণ স্থির অর্থাৎ অবধ্য হইবে। তাহাদিগকে কেহ বধ করিতে পারিবে না বা অকালমৃত্যু কর্তৃকও আক্রান্ত হইবে না। দিতি এই ব্রতানুষ্ঠানে অভিষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সেই হইতে এই ব্রত প্রচলিত হইয়াছে।

ফাল্গুণ মাসের ব্রত।

শিবরাত্রি ব্রত।

ফাল্গুন মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিকালে মৃতলিঙ্গ চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিবে। প্রথম বিষ্ণোর্নমঃ আদ্যেত্যাদি ফাল্গুন মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শিবলোক গমনকামা যথাশক্ত্যুপচারৈঃ শিবপূজা জাগরণোপবাস কর্ম্মাহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া অর্ঘ্য দিবে। (২) দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা হৌঁ অঘোরায় নমঃ বলিয়া স্নান ও নমঃ শিবায় শন্তায় সর্ব্ব পাপ হরায় চ। শিবরাত্রি দাদামর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। তৃতীয় প্রহরে হৌঁ বাম দেবায় নমঃ ও দুঃখ ক্লেশ

---

(১) গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে নাথ যদপূর্ণে ময়ৈহ্যসং।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দনং॥
ইদং ব্রতং ময়াদেব গৃহীতং পুরোতস্তবঃ।
নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্নোতি তৎপ্রসাদাৎ জনার্দ্দনং।

(২) হৌঁ ঈশানায় নমঃ। অর্ঘঃ মন্ত্রং। ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং।
দেবন্ পূজা জপ পরায়ণ। করোমি বিধিবদ্ভক্ত্যা গৃহণার্ঘ্যং মহেশ্বর।

শোকেন দগ্ধেঽহং পার্ব্বতী প্রিয়ঃ। শিবরাত্রি দাদামর্ঘ্যং ভক্ত্যা দত্তং গৃহানমে বলিয়া অর্ঘ দিবে। চতুর্থ প্রহরে হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ বলিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইবে এবং মায়াকৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দাদামর্ঘ্যং উমাকান্ত নমস্ততে বলিয়া অর্ঘদান করিবে।

ব্রতকথা।—বারাণসী নগরীতে খর্ব্ব কৃষ্ণ ক্রুর উর্দ্ধকেশ এক ব্যাধ পশুপক্ষী হত্যা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ ব্যাধ বহু অরণ্য পর্য্যাটন করিয়া স্বায়ং কালে একটী মৃগ শিকার করে। সমস্ত দিন উপবাস—তাহাতে সন্ধ্যা সমাগত, ব্যাধ অনন্যোপায় হইয়া মৃগকে একটী বিল্ব বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়া নিজেও বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। সেই বৃক্ষ মূলে শিবলিঙ্গ ছিলেন। মৃগশোণিতে বিল্বপত্র রঞ্জিত হইয়া শিবলিঙ্গের মস্তকে পতিত হওয়ায় সেই উপবাসী ব্যাধ বরপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগামী হইয়াছিল। অতএব যিনি ভক্তিপুর্ব্বক শিবরাত্রির উপবাস ও জাগরণাদি করেন তাঁহার আর শমন ভয় থাকে না। একথা স্বয়ং মহেশ্বর স্বীকার করিয়াছেন।

গোবিন্দ দ্বাদশী ব্রত।

ফাল্গুন মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া যিনি ভক্তিপুর্ব্বক গোবিন্দ পুজা করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটে। বিষ্ণু কহিয়াছেন, এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রতাচারীকে স্বর্লোকে স্থান দান করেন।

ব্রতকথা।—পুরাকালে এক গোত্র ব্রাহ্মণ স্বীয়পাপ হইতে মুক্তিকামনায় অনেক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরিশেষে স্বগুরুর উপদেশ মতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পাপ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত ও দেবগণের দুর্ল্ভ গোলকে স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

পুত্রেষ্টি ব্রত।

মাঘ মাসের প্রথম ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাস কাল প্রতি মাসের পঞ্চমী সংযমন, ষষ্ঠীতে উপবাস ও বিষ্ণু পুজা এবং সপ্তমীতে

ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রতাচারিণী অন্ন গ্রহণ করিবেন। এই ছয় মাসের মধ্যে খট্টায় শয়ন ও স্বামীসঙ্গ করিবেন না। আষাঢ় মাসের ষষ্ঠিতে এই ব্রতের উদযাপন। পঞ্চমীতে সংযমন করিয়া ষষ্ঠির দিন লক্ষ্মী নারায়ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। রাত্রে আরতি ও বৈকালী দিবে, সপ্তমীতে পুনরায় পূজা করিয়া দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া এবং দক্ষিণা দান করিয়া ব্রতের উদ্যাপন করিবে।

ব্রতকথা।—ভগবান বাসুদেব অক্রুর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছেন, যে রমণী ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পুত্রলাভ অবশ্যই হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, সে সন্তান অক্ষয় হইয়া ব্রতাচারিণীর সুখসম্বদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া।

চৈত্র মাসের ব্রত।

শ্রীরামনবমী ব্রত।

চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রত কর্ত্তব্য। স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক পোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিকামং শ্রীরাম নবমী ব্রতমহং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে শালগ্রাম শীলা সমীপে ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে। (১) পরে সীতাদেবীর পূজা করিবে।

ব্রতকথা।—বিষ্ণু কহিয়াছেন যে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং যে পুণ্যবলে আমি দশরথের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, রাম নবমী ব্রতাচারীকে আমি সেই ফল প্রদান করিয়া থাকি। অতএব এই রাম নবমী ব্রতের যে ফল, তাহা সকল ব্রতাপেক্ষা সুদুর্ল্লভ।

---

(৭) কোমলাঙ্গং শিবালাক্ষ্য কোটিনীল সমপ্রভং।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণ তৎপরং॥
পৃষ্ঠতো লক্ষণোদেবং সছত্রং কনকপ্রভং।
পার্শ্বে ভরতঃ শত্রুঘ্নং তালবৃন্ত করাবভৌ॥
অগ্রেব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহ কাঙ্ক্ষীনং॥]

An ill fixed blind' no one even wind.

মদন দ্বাদশী ব্রত।

চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে মদন দ্বাদশী ব্রত কর্ত্তব্য। এই ব্রতে কামদেবকে পূজা করিলে ব্রতাচারী পরজন্মে সুন্দর রূপ ধারণ করিবে।

বালিকার ব্রত।

যমপুকুর ব্রত।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণোর্নমঃ অদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ জলবিষুব সংক্রান্ত্যাং অমুক গোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী নরক নিবারণ করণান্তে বিষ্ণুলোক গমন কামাঃ আদ্যারম্ভ চতুর্ব্বর্ষ পর্য্যন্তং গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্ব্বক যমরাজ পূজা তৎকথা শ্রবণরূপ ভবিষ্যপুরাণোক্ত যমপুষ্করিণী ব্রতমহৎ করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে অধিবাস করিবে। তৎপরে গোময় স্তূপের উপর ষষ্ঠিকে আরোপিত করিয়া তাহার মূলে গণেশাদি পূজা ও চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের পূজা করিবে। পরে কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—ধর্ম্মরাজকে ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি স্ত্রীলোকের সর্ব্বশুভপ্রদী সেই ব্রত পদ্ধতি কহিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রেতাযুগে পান্তপণ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি প্রজা প্রতিপালনে অদ্বিতীয় এবং সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রাজা শান্তপণের পূর্ণচন্দ্রবদনা সর্ব্বগুণ ভূষিতা চন্দ্ররেখা নামে মহিষী ছিলেন। চন্দ্ররেখা ব্রতপরায়ণ অতি মাত্র পতিব্রতা। ব্রতাদির অনুষ্ঠানে তাঁহার বিরতী ছিল না। তিনি হরপার্ব্বতীর পূজায় অতি ভক্তিমতি ছিলেন। কালে সেই লোকললামভূতা সতী মৃত্যুমুখে নিপতিতা হয়েন। যমরাজের কিঙ্করগণ সতী চন্দ্ররেখাকে যমপুরীতে লইয়া যম সন্নিধানে উপস্থিত করিলে, তিনি করযোড়ে যমরাজ যমকে নমস্কার করিলেন। চন্দ্ররেখার অতুলনীয় ভক্তি দর্শনে যমরাজ কহিলেন, হে সাধ্বি! বর প্রার্থনা কর। চন্দ্ররেখা মম বাক্যে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া

থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমাকে নরকে বসতী করিতে না হয়। যম কহিলেন, তাহাই হইবে। তুমি আমার ব্রত উদ্যাপন কর। যে নারী ভক্তি পূর্ব্বক যম পুষ্করিণী ব্রত পালন করেন, তিনি ইহকালে ধনধান্যপুত্রপৌত্রাদি ভোগ করিয়া পরকালে স্বর্গগামিনী হয়েন! চন্দ্ররেখা পুনর্জীবন লাভ করিয়া এই ব্রত পালন করেন।

দীপান্বিতা ব্রত।

কার্ত্তিক মাসের চতুর্দ্দশীতে স্নান করিয়া পিতৃগণোদ্দেশে দধি ক্ষীর গুড়াদি উৎসর্গ করিবে। গৃহে আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া স্বায়ংকাল অমাবস্যায় চতুস্পথে, শ্মশানে, নদীতে পর্ব্বতে, বৃক্ষমুলে, গোষ্ঠে, চত্বরে এবং গৃহাদিতে প্রজ্জলিত দীপ স্থাপন করিবে।

ব্রতকথা।—লক্ষ্মী কহিয়াছেন, যে নারী ভক্তি পূর্ব্বক এই দীপান্বিতা লক্ষ্মী পূজা ও দীপ দান করেন, তাঁহার পিতৃলোক অক্ষয় আনন্দ ও স্বর্গ ভোগ করেন এবং তিনিও লক্ষ্মীর কৃপায় ইহ ও পরলোকে দিব্য সুখ ভোগ করেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়াতে স্নানান্তে ভগ্নি ভ্রাতার ললাটে চন্দন তীলক দান করিবেন। মন্ত্র পাঠ (১) করিয়া ভ্রাতাকে স্বহস্তে স্নান ও নূতন বসন পরাইবেন।

ব্রতকথা।—কথিত আছে, এই ব্রতাচরণ করিলে ভ্রাতাকে আর যম লোক দর্শন করিতে হয় না।

---

(১) ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা।
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা॥

তিনবার তীলক দান ও প্রত্যেক বার ভুমিতলে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা চিহ্ন করিতে হইবে। তীলক দানেও ঐ অঙ্গুলি ব্যবহার করিতে হইবে।

গোকাল ব্রত।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে গোগণকে মন্ত্রপাঠ করিয়া গোগ্রাস দিবে। (২) কথিত আছে, ভগবান কৃষ্ণ এই সময়ে গোগণকে গোগ্রাস দিয়াছিলেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে বালিকা সুন্দর পতিলাভ করেন।

জন্মতিথি পূজা।

জন্ম তিথিতে প্রথমে জীবিত মৎস্য কূপে নিক্ষেপ করিবে। পরে তিল তৈল ও হরিদ্রা মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক কুশতিল ও জল হস্তে লইয়া ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছদশান্তি পূর্ব্বকং দীর্ঘায়ুষ্টকামঃ গণপত্যাদি দেবতা বিষ্ণুরাধন পূর্ব্বক জন্মতিথি পূজা তদ্‌হোমকর্ম্ম হং করিষ্যে বলিয়া সংকল্প করিবে। পরে গণেশ ও নবগ্রহ পূজা করিয়া মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান (৩) ও পূজা তৎপরে সপ্তচিরজীবির পূজা করিবে। (৪) পরে চতুর্দ্দশ যমকে পূজা ও নমস্কার করিতে হইবে। (৫) জন্মতিথির নাম, বার ও মাসাদি উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে বিষ্ণু পূজা করিবে। পূজান্তে তিল পায়স ভোজন করিবে।

ভোজন পাত্রের নিকট উপবেশন করিয়া মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ধান দুর্ব্বার সহিত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা আবশ্যক।

---

(২) গোকাল গকুলেবাস।
সোনার থালে দিয়ে ঘাস।
আমার হয় যেন স্বর্গে বাস॥

(৩) ওঁ দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনং।
মার্কণ্ডেয় নরোভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রযতস্তথা।

(৪) অশ্বত্থামা বলির্ব্যাস হনুমানশ্চ বিভীষণ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিকা।

(৫) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ।
উডম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

পুণ্যপুষ্করিণী ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল এই ব্রত করিতে হয়। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাতে বিল্ববৃক্ষ আরোপিত করিয়া মন্ত্র পাঠ করত পূজা করিবে। (১)

উদ্যাপনকালে স্বর্ণ রৌপ্য ও কড়ি দ্বারা পুষ্করিণী পূর্ণ করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

দশ পুত্তলিকা ব্রত। (২)

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল এই ব্রত করিতে হয়। বৈশাখ মাসে প্রতিদিন দশবিধ পুত্তলিকা ভুমিতলে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়। উদ্যাপন কালে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পুত্তলিকা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে।

ধূপসংক্রান্তি ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল প্রতি সংক্রান্তিতে ধূপ, উপবীত ও কড়ি ব্রাহ্মণকে দান করিবে উদ্যাপনে বস্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রণাম ও ভোজন করাইবে।

বৈশাখি চম্পক ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করতঃ প্রতি সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল এই ব্রতাচরণ করিবে। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন চম্পক পুষ্প, উপবীত ও দক্ষিণা একটী ব্রাহ্মণকে দিয়া তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইবে। উদ্যাপনে স্বর্ণ চম্পক দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

---

(১) পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা। কে পুজেরে দুপুর বেলা॥
আমি সতী গুণবতী। ভাইয়ের বোন পুত্রবতী॥
হবে পুত্র মোরবে না পৃথিবীতে ধোর্ব্বে না॥
সোয়ামীর কোলে পুত্র দোলে। মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে॥

(২) ইহার নাম চলিত কথায় "সেঁজুতি ব্রত" বলে॥

কলাছড়া ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সংক্রান্তিতে অখণ্ড কদলী, কড়ি ও উপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উদ্যাপনে ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণকে অখণ্ড কদলী, দক্ষিণা ও উপবীত দান করিয়া ভোজন করাইবে।

মিষ্টসংক্রান্তি ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সংক্রান্তিতে মিষ্ট লাড়ু, কড়ি ও উপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এক বৎসর পরে ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া মিষ্ট, দক্ষিণা ও উপবীত দান করিবে।

ঘৃত সংক্রান্তি ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল প্রতি সংক্রান্তিতে পাত্রসহিত ঘৃত, কড়ি ও উপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উদ্যাপন কালে ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাত্রসহিত ঘৃত, দক্ষিণা ও উপবীত দান করিবে।

মধু সংক্রান্তি ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সংক্রান্তিতে পাত্র সহিত মধু, কড়ি ও উপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বৎসরান্তে মধুপাত্র দক্ষিণা ও উপবীত দান করিয়া ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

ফলদান ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল এই ব্রত করিতে হয়। প্রথম বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতিদিন সুপারী, কড়ি ও উপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উপবীতাদির সহিত দ্বিতীয় বর্ষে কদলী, তৃতীয় বর্ষে আম্র এবং চতুর্থ বর্ষে নারিকেল ফল ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

Home is home be it ever so homely

উদ্যাপন কালে রৌপ্য, বস্ত্র ও ফলদান করিয়া ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

এয়ো সংক্রান্তি ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে একটী ব্রাহ্মণকন্যাকে তৈল, হরিদ্রা, ফল, তাম্বুলাদি দান ভোজন করাইবে। দ্বিতীয় বর্ষের সংক্রান্তিতে তিনটী ব্রাহ্মণকন্যা, তৃতীয় বর্ষে সাতটী এবং চতুর্থ বর্ষে ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণকন্যাকে উক্ত দ্রব্য দান ও ভোজন করাইয়া ব্রত উদ্যাপন করিবে।

ধন গছান ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল বৈশাখ মাসের প্রতিদিন ধনিয়া, আদা, হরিদ্রা, উপবীত, কড়ি ও মিষ্ট ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

পৌর্ণমাশী ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর কাল এই ব্রত করিবে। প্রতি বৎসরে বৈশাখমাসের প্রত্যহ সুপারি, হরিতকী, জাতি, এলাইচ ও উপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

গুপ্তধন ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তিতে ক্ষীরলাড়ু মধ্যে রৌপ্য মুদ্রা (দুয়ানী, সিকি, আধুলী, টাকা ক্ষমতানুসারে) রাখিয়া উপবীত সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উদ্যাপন কালে ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া ক্ষীর, উপবীত ও দক্ষিণা দান করিবে।

কালাবউ ব্রত।

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া একমাস একটী কদলী বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া বালিকা তাহার পূজা করিবে। ভোগ দিবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবে। (৩)

জীয়ন্ত ষষ্ঠী ব্রত।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আম্র বৃক্ষের তলে বালিকা মন্ত্র পড়িয়া পূজা করিবে। সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাসই প্রতিদিন পূজা বিধি। (৪)

---

(৩) কলা গাছ পূজন, সোণার থালে ভোজন।
সোণার থালে ক্ষীরের লাড়ু, আমার হাতে হয় যেন স্বর্ণের খাড়ু॥

(৪) আম তুমি যেমন ফল। দাও আমায় তেমনি ফল।
তুমি যাও স্বর্গে দেবতারা খায়। আমার হাতের লোহা ক্ষয় যায়॥

পারত্রিক-তত্ত্ব।

—•❀•—

কর্ম্মভোগ।

—•—

(বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের) প্রথম দ্বার।

দ্বারপাল—কাম।

আমি আবার আসিয়াছি। আমি নূতন নহি, তোমাদের পরিচিত আমি আবার আসিয়াছি। এতদিন ভুগিতে আসিতাম, ভোগাইতে আসিতাম, আর আজ দেখিতে আসিয়াছি, আর দেখাইতে আসিয়াছি! তোমরা একবার দেখিবে কি?

একটু পূর্ব্বে আমি যে দুই এক কথা বলিয়াছি, যে একটা আধটা চিত্র দেখাইয়াছি, তাহা রসায়ন!—আগে মিষ্ট মিষ্ট দুকথা বলিয়াছি, এখন দুটা শক্ত কথা বলিব, দুই একটা ভয়ানক ভয়ানক চিত্র দেখাইব,—শুনিতে হইবে, দেখিতেই হইবে। রাগ করিলে ছাড়িব না।—আমি পাগল; তাই আমি বেচারা পাগল। পাগলের কথায় কেহ কি রাগ করে? হয় এই পাগলের কথায় পাগল হও না হয় পাগলের কথা হাসিয়া উড়াও। রাগ করিলেও তোমার নিস্তার নাই। তাহা হইলেও লোকে তোমাকে পাগল বলিবে। তাহা হইলেও তুমি আমার দলভুক্ত। তবে পাগলের হাতে তোমার নিস্তার আছে কি? এখন কথা বলি,—মনোযোগ দাও।

মায়ের কৃপায় আমি আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছি। সংসারকে আগে আমি এক চক্ষে দেখিয়াছি, এখন আবার আর এক রকম দেখিতেছি। মা আমার চক্ষে আজ জ্ঞান-চসমা পরাইয়া দিয়াছেন। তাই আজ সবই নূতন দেখিতেছি। পূর্ব্বে স্বর্গে, মর্ত্তে, ঊর্দ্ধে, অধোতে,—দশ দিকে দশ রকম দৃশ্য দেখিয়াছি।—দশ রকম দেখিয়া মনের গতি দশদিকে ছুটিয়াছে। আর

আজ দশ দিকে এক রকম দেখিতেছি। দশ দিক যেন এক হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি,—সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ী। দিক সকল সেই বাড়ীর প্রাচীররূপে দাঁড়াইয়া—তাহার পরিধি রচনা করিয়াছে। চন্দ্রসূর্য্য সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর উর্দ্ধ চূড়ায় সংলগ্ন থাকিয়া গৃহস্থগণকে আলোক দান করিতেছে। অকাশ চন্দ্রাতপরূপে সেই বাড়ীর উর্দ্ধে স্থাপিত। এমন বড় বাড়ী আর কেহ কখন দেখে নাই। সেই বাড়ীর রেণু প্রমাণ আমি, এক প্রান্তে সংলগ্ন আছি কিন্তু দেখিতেছি সব। আমার চক্ষু যে দিব্যচক্ষু। আমি কীটানুকীট, কত কোটী কোটী অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বিন্দু বিন্দু আমার মত জীব সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর একটী ক্ষুদ্র কুঠারীতে বসতি করিতেছে। আমি ত নগণ্য—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কেবল মায়ের কৃপায় আমি জ্ঞান-চক্ষু পাইয়াছি বলিয়াই আমার দৃষ্টির সীমা নাই। যে দিকে চাহি, সে দিকেই অনন্ত পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। দৃষ্টির সীমা আমিও খুজিয়া পাই না। তাই তত বড় বাড়ী আমি দিব্য দেখিতেছি।

দেখিলাম, সেই বাড়ীর মধ্যদেশে এক অতি সুদৃশ্য সৌধ। কারুকার্য্যের নিদানভূত সেই সৌধে অগণ্য গন্ধদীপ জ্বলিতেছে। স্তবকে স্তবকে কুসুমস্তবক সজ্জিত আছে। সৌধশিরে কোটী কোটী চন্দ্রসূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে। এ সূর্য্যের উত্তাপে দাহিকা শক্তি নাই। যে শক্তিতে সূর্য্যদেব জগতের প্রাণীবর্গকে দগ্ধ করেন, এখানে সেরূপ দেখিলাম না। এ আলোক অতি স্নিগ্ধ। চাহিলে চক্ষু স্নিগ্ধ হয়, মন প্রফুল্ল হয়। সৌধের চারিদিক যেন জ্যোৎস্নায় খচিত!—অপূর্ব্ব শোভা। সৌধ দর্শনে সকলেরই বাসের স্পৃহা জন্মে। নিয়ম,—পূর্ব্ববর্ণিত বাড়ীর হতভাগ্য অধিবাসীরা প্রাণান্ত করিয়াও সেই সৌধের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। সেখানে বাস করিতে অধিক ব্যয়। আমরা ক্ষুদ্রজীবি, পত্রকুটীরই আমাদের পক্ষে উপযুক্ত, রাজপ্রাসাদ কি আমাদের সাজে? আমাদের তত পণই বা কই যে, সৌধবাসী হইব।

ইচ্ছা কিন্তু সকলেরই আছে। সৌধবাসের পণ না থাকা স্বত্বেও দেখিলাম অসংখ্য জীব সেই সৌধবাসের জন্য প্রয়াসী। যাহারা বাড়ীর অভ্যন্তরে বাস করিতেছে, তাহাদের যেমন চেষ্টা বাড়ীর বাহিরে যাহারা

তাহাদের আবার ততোধিক চেষ্টা। বাড়ীর মধ্যে যাহারা, তাহাদিগের ইচ্ছা আছে কিন্তু চেষ্টা কম। বাহিরের লোকের যেমন চেষ্টা, তেমনি আগ্রহ। ইহারা সিংহদ্বারে দারুণ হট্টগোল আরম্ভ করিয়াছে।

বাড়ীর ছয়টি সিংহদ্বার। প্রত্যেক সিংহদ্বারে এক একজন প্রধান দ্বাররক্ষক, আবার তাহাদিগের অধীনে কতকগুলি সাধারণ রক্ষী আছে। ইহারা এমন সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করিতেছে যে, ভিতরে প্রবেশ করে কার সাধ্য? সৌধশিরের জয়পতাকা আশা দিতেছে, জীবকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে, যেন বলিতেছে "আয় জীব! এই শান্তিধামে। এ ধাম তোদেরই। দয়াময় তোদের জন্যই এই পরমরমণীয় আনন্দধাম সৃজন করিয়াছেন।" কিন্তু হইলে কি হইবে, দ্বারপাল যে দ্বার ত্যাগ করে না।—দ্বারপালের ব্যবহার দেখিলাম চমৎকার!—যাহারা চরণে ধরিয়া—সাধিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে,—যাহারা নয়নজলে বুক ভাসাইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছে,—দ্বারপালগণ স্ব স্ব মন্ত্রে তাহাদিগের অনুপ্রাণিত করিয়া নিজের "গোলাম" করিয়া রাখিতেছে। বাড়ী প্রবেশে তাহারা অধিকার পাইতেছে, কিন্তু সে সৌধের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। তাহাদির চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হইয়াছে; সৌধশিরস্থ সূর্য্যের জ্যোতিতে তাহারা দগ্ধ হইয়া পলাইয়া লুকাইয়া আসিতেছে; যাহারা খঞ্জ, সৌধশিরে উঠিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই। দ্বারপালগণ তাঁহাদিগের ডানা ভাঙ্গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বলহরণ করিয়া জীবন্তে কলের জীব করিয়া তুলিতেছে। জীবগণ তাহাদিগের পদানত। আর যাঁহারা দ্বারপালের লালচক্ষু দর্শনে নিজেও চক্ষু লাল করিতেছেন, দ্বারপালের একগুণ হুঙ্কার শ্রবণে শতগুণ হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, দ্বারপালগণ ভীত হইয়া—তাঁহার শতহস্ত দূরে থাকিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিতেছে! দ্বারপালগণের সকল বল পয্যুদস্থ করিয়া তাঁহারা অনায়াসে সেই সৌধশিরে গমন করিতেছেন,—নিত্যানন্দ লাভ করিতেছেন!—পুলকপূর্ণ হৃদয়ে গাহিতেছেন,—ধর্ম্মাৎ নাস্তি পরোৎ সুখম।"

ব্যাপার দেখিয়া একটু অগ্রসর হইলাম। মনে করিলাম, ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিতে হইতেছে। একটু অগ্রসর হইয়া প্রথম দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দ্বারপাল আপনার মেজাজে

বসিয়া আছে। দ্বারপালের নামটি জানিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু কে বলিয়া দিবে? ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল। মায়ের কৃপা যাহার প্রতি,—মায়ের আমার সহস্রমুখী স্নেহস্রোত যাহার প্রতি সহস্রধারে প্রবাহিত, তাহার আবার চিন্তা কি? দেখিলাম, দ্বারপালগণের প্রত্যেকের শীরোদেশে স্ব স্ব নাম অঙ্কিত আছে। প্রধান দ্বারপালের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, শীরে লিখিত আছে—**কাম**।

কামের চেহারা প্রথম দর্শনে দেখিতে বড় মনোরম, বড় চিত্তাকর্ষক, বড় দৃষ্টিবিভ্রমকারী!—প্রথম দর্শনে দেখিলাম, কামের রূপ যেন ভুবন ভরা! দশদিক দেহের জ্যোতিতে যেন আলোকিত!—এমনরূপ যেন আর কেহ কখন দেখে নাই! আহা কি প্রশস্ত দৃষ্টি,—কি চমৎকার ভঙ্গি। ইচ্ছা করে, ঐ পুরুষরত্নের পাদপদ্মে এ ছার প্রাণ উৎসর্গ করি। একটু অভিনিবেশ সহকারে চাহিলাম।

ধাঁ করিয়া চটক ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম ও হরি! সবই ফাকি। এ যে আগুন ঢাকা পাঁশ! অমৃত ঢাকা বিষ!—স্বর্গাবরণে আবৃত কাচ যাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহারা দেখিতেছে কামের রূপ ভুবন মোহন, আমি কিন্তু দেখিলাম, এমন কদাকার চেহারা আর কাহারও নাই। চক্ষু দুটি কোটর প্রবিষ্ট, তায় অতি সুন্দর প্রবৃত্তি-চসমা ঢাকা; দেহ অতি শীর্ণ, তায় সুপরিচ্ছন্ন কারুকার্য্য খচিত ঝুট-প্রেমের বুটিদার চাপকান গায়; মাথায় চুল নাই, তায় বিচ্ছেদ-মকমলে মিলন-জরি আঁটা শূন্যগর্ত্ত তাজ মাথায়; সরু সরু দশটি অঙ্গুলীতে হাব, ভাব কটাক্ষাদি দশ ভাবের দশটি অঙ্গুরী; পা সরু, তাই পবিত্র-প্রণয় নামক বিলাতি আমদানী ঝুটা কাপড়ের "কাটা কাপড়" জড়ান। নিজের কাকপক্ষীর ন্যায় বর্ণ "পরম সুখ নামক রাঙা গুড়ায় রঞ্জিত। এত ফেরেবীতে লোক কেন ভুলিবে না? কামের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আপন মনেই খানিক হাসিলাম। অল্পবুদ্ধি জীব এই বাহ্যসৌন্দর্য্যে ভুলিয়া কামের চরণে স্মরণ লয়, শেষে যারপরনাই সন্তাপিত হইয়া জীবনধন নষ্ট করে। আর যাঁহারা বাহ্যশূন্য ভোগ করিয়া অন্তর দেখেন, তাঁহারাই বুঝেন, কামের অন্তর কতদূর অন্তঃসারহীন। ইহারাই সবলে দ্বার অতিক্রম করেন ইহাঁদিগের নিকট কামের সেই কোটর প্রবিষ্ট চক্ষুর মিটির মিটির চাউনী ধরা পড়িয়া যায়॥

আলস্যই দুঃখের প্রবর্ত্তক।

কামের রূপ দেখিয়া কামের অনুচরবর্গের স্বভাব দেখিতে বড় ইচ্ছা জন্মিল। চাহিয়া দেখিলাম, কামের প্রথম অনুচরের শীরে লেখা আছে, **পরদার হরণ।** ইহার চেহারাটী ভাল, কিন্তু ভিতরে ফাঁক। নয়নে কটাক্ষ আছে কিন্তু জ্যোতি নাই, রকম রকম বিলাসিতার মনোমোহন ভাব ভঙ্গি আছে কিন্তু সে ভঙ্গি সকলে বুঝে না, বেশভূষার পারিপাট্য আছে কিন্তু তাহা কেবল পরের মন আকৃষ্ট করিবার ফাঁসি-কল সম্মুখস্থ রমণীদিগের প্রতি বিলাসবিলোলকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, ইঙ্গিতে যেন বলিতেছে, "এস রমণি! তোমাকে সুখের পারে লইয়া যাই। তোমার স্বামী সংসার-বাজারের মুটে, মোট বহিতে পারে, প্রেমের কি ধার ধারে? প্রেমময়ি! তুমি প্রেম বিলাইতে আসিয়াছ। আমি তোমার প্রেমসাগরের নাবিক। এস, প্রেমের পারে লইয়া যাই। কোন কোন রমণী পদাঘাতে এই চাটুকারকে দূর করিতেছে। কোন কোন হতভাগিনী এই চাটুকারের প্রলোভনে সর্ব্বস্ব খোয়াইতেছে।—বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছে কিন্তু সৌধ সমীপে গমনের সাধ্য হইতেছে না।

কামের দ্বিতীয় অনুচরের প্রতি চাহিলাম। তাহার শীরোদেশে পূর্ব্ববৎ অঙ্কিত আছে,—**বারাঙ্গনাগমন।** শরীর অতি শীর্ণ,—দেহ জরাজীর্ণ, যেন কলের জীব। এককালে দেহের লাবণ্য ছিল, বুদ্ধির পরিপক্কতা ছিল, দেহে বল ছিল, হিতাহিত জ্ঞান ছিল। কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই। চক্ষুর দৃষ্টি নাই, তবুও তাহাতে কটাক্ষ আছে, দেহে বল নাই, তবুও দুষ্টপ্রবৃত্তি দমিত হয় নাই, উঠিবার শক্তি নাই, তবুও বারাঙ্গনালয়ে যাওয়া আছে, নেত্রজলে বারাঙ্গনার চরণ অভিসঞ্চিত করা আছে, অর্থ নাই, শালগ্রাম শীলার উপবীত বিক্রয় করিয়া, বারাঙ্গনা সেবায় অক্ষয় স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান আছে, পরকে মজাইতে নিজেই মগ্ন হওয়া আছে, মজা দেখিতে গিয়া, মজা দেখিয়া আসা আছে। দেখিলাম, অন্যের কাছে ইহারা ভীত—জড়বৎ, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী পাইলে, নিজের মত তাহাকে মজাইতে চেষ্টা, কোথাও কৃতকার্য্যতা—কোথাও বা নিষ্ফল। দেখিলাম, ইহারাও বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে। সৌধ কিন্তু ইহাদিগের বহু দূরে।

কামের তৃতীয় অনুচর দেখিলাম, অপূর্ব্ব জীব! ইহাকে মানব বলি কি পশু বলি, নর বলি কি নারী বলি, তাহা বুদ্ধিতে কুলাইল না। জগতের

কুকর্ম্মই কুকর্ম্মের শান্তি দান করে।

প্রাণী বৃত্তান্ত দেখিলাম, এ জীব তথায় নাই। এই অপূর্ব্ব জীব দেখিতে অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম শীরে লেখা **অস্বাভাবিক অভিগামী।** জীবের অর্দ্ধাংশ নরাকার, অর্দ্ধাংশ কুক্কুর মূর্ত্তি। ইহারা সস্ত্রীক আছেন। কোন রূপে ইহাদিগের লিঙ্গভেদ করিয়া দেখিলাম, পুরুষের সম্মুখ ভাগ নর ও অধোভাগ কুক্কুর মূর্ত্তি আর নারীর ঊর্দ্ধভাগ কুক্কুরী এবং অধোভাগ নারী মূর্ত্তি। ইহারা উভয়েই অতি কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছে, আবার সে ভাব ত্যাগ করিয়া, পরস্পর চুম্বনালিঙ্গন করিতেছে, যেন আনন্দের আর সীমা নাই। ইহা কর্ত্তৃক যাহারা স্পৃষ্টা হইতেছে, তাহাদিগকেও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

কামের চতুর্থ অনুচর দেখিলাম। প্রথমে তাহার পুরুষোচিত দেহ দেখিয়া মনে ভাবিয়াছিলাম, এটী অনুচর। এখন দেখিলাম, সে আমার ভ্রম। এটী অনুচর নহে, কামের অতিমাত্র প্রিয়কারিণী সহচরী। কামের সহিত ইহার বড় সম্প্রীতি। নাম দেখিলাম, **অভিসার।** চেহারা অতি কদাকার। কিন্তু হায়! তাহা কি সকলে দেখিতে পায়? হীরকের মধ্য কাচের আবিষ্কারে কি সকলের বুদ্ধি কুলাইয়া উঠে? চেহারা অতি কদাকার, বর্ণ অতি কৃষ্ণ, কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় কি? রকম রকম আদপ কায়দার রংদার রঙে দেহ রঞ্জিত হইয়াছে। শতমুখীতুল্য কেশপাশের মধ্যে রিপুকর্ম্ম আছে। লম্বিতস্তন মনোমোহন সোহাগ-কাঁচলীতে আবৃত আছে। চরণের স্ফীততা ভক্তগণের পৃষ্ঠে স্পর্শসুখ অনুভব করাইবার জন্যই নিয়োজিত আছে, তাইতে আবার আদর-মলের ঝুমুর ঝুমুর আছে। চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট কিন্তু তাহাতে আরও প্রেম-কটাক্ষ আছে, গলদেশের উচ্চতা প্রণয়-কণ্ঠিতে আবৃল, সে সব দেখে কে? বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, এমন লোকললামভূতারমণীরত্ন আর নাই। ইনিই বিধাতার আদর্শ সৃষ্টি বা প্রকৃতির প্রিয়তমা কন্যা! দেখিলাম, রূপের আগুণ জ্বালিয়া পুরুষ-পতঙ্গ ডাকিতেছে। কত কত হতভাগ্য সেই কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া, জীবন বিক্রয় করিতেছে। মাতা, পিতা, স্ত্রীপরিবারকে অকূলে ভাসাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। মাতাকে কাঁদাইয়া নিজে হাসিতে যাইয়া—কাঁদিয়া সারা হইতেছে।

কামের আর একটী অনুচর দেখিলাম। দেখিলাম, এটী অনুচর নহে,

মিত্রতা শত্রুকেও বশীভূত করে।

এটীও সহচরী।—আহা! দুশ্চারিণীর দুঃখ দেখিয়া—চেহারা দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া গেল!—এত কষ্ট হতভাগিনীর? নাম দেখিলাম, ভ্রূণহত্যা। হত-ভাগিনীর দুঃখ কষ্টের অবধি নাই। মুখে যন্ত্রণার কালিমা পড়িয়াছে, বিকট মূর্ত্তি বিকটতর হইয়াছে! তাহাতে কিন্তু যন্ত্রণা বোধ নাই। কষ্টকে কষ্ট বোধ নাই। হতভাগিনী বিকট মুখভঙ্গি করিয়া সম্মুখস্থ নারীগণকে ডাকিতেছে। প্রলোভনে যেন প্রলোভিত করিবার জন্য ডাকিয়া কহিতেছে, "ভয় করিও না। আইস! এমন পথ থাকিতে ভয় কেন? বিধবা, সধবা, কুমারী, যে হও আইস! প্রেম বিতরণ কর। লোকলজ্জার ভয় করিও না। ভয় করিলে প্রেমলাভ তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে কেন? এসুখ তুমি পাইবে না। সুখী হও,—প্রাণের প্রিয়তমকে প্রেম দান কর। জীবস্রোত বহিবার ভয় করিতেছ? লোকনিন্দার ভয় করিতেছে? এই দেখ, আমি সে পথ রুদ্ধ করিয়াছি। গর্ব্ভ নষ্ট করিলেই ত আপদ চুকিয়া গেল। কেহ জানিবে না, কেহ দেখিবে না, কেহ বুঝিবে না। আইস, আমরা সুখের সাগরে ভাসিয়া যাই। আমার নাম—ভ্রূণহত্যা।

ইহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দেখিলাম। আর এখানে থাকা নহে। যাহা দেখিলাম, তাহাই যথেষ্ট। এখন দ্বিতীয় দ্বারের রহস্য দেখিতে চলিলাম। এ কামচরের অগম্য কি স্থান আছে?

দ্বিতীয় দ্বার।

দ্বারপাল—ক্রোধ।

দ্বিতীয় দ্বারে আসিলাম। দেখিলাম, সেখানেও প্রবেশার্থীর অভাব নাই। দ্বারপালের দিকে চাহিয়া ভীত হইলাম। এমন বিভৎস্যমূর্ত্তি আর যেন কখন আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। দণ্ডহস্তে বিশ্বধ্বংসকারী মহা-কালকে দেখিয়াছি, প্রচণ্ড দুর্দ্দমনীয় অজেয় কালকে দেখিয়াছি, সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার পিতাকে দেখিয়াছি, রণরঙ্গে উলাঙ্গিনী রণচণ্ডীকে দেখিয়াছি, দেখিতে আমার বাকী নাই। কিন্তু এমন মূর্ত্তি আর কখন দেখি নাই।

যেন ব্রহ্মাণ্ডের উগ্রশক্তির সামঞ্জস্যে এই মূর্ত্তি সৃষ্টি হইয়াছে। তাড়াতাড়ি আগ্রহ সহকারে দেখিলাম, নাম লেখা আছে—**ক্রোধ।** ক্রোধের মূর্ত্তি অতি ভয়ানক। চুলগুলি অতিরুক্ষ, যেন ব্যোমকেশ, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ—সর্ব্বদা কুম্ভচক্রের ন্যায় বিঘুর্ণিত।—দেহ সর্ব্বদাই কম্পিত!—সর্ব্বদাই আত্মহারা—হিতাহিত জ্ঞান শূন্য—মেজাজ সদাই তেরিয়া! যাহার দিকে ক্রোধের দৃষ্টি পড়ে, সেই ছাই হইয়া যায়। যাহার প্রতি ক্রোধের কৃপা হয় তাহার কর্ত্তব্য বোধ নষ্ট হয়, আত্মপর জ্ঞান থাকে না, সম্বন্ধ বিচার থাকে না, জীবনের পর্য্যন্ত মায়া থাকে না। ক্রোধের অংশ পাইয়া সেও এক ক্রোধ-রূপী হইয়া পড়ে। ইহার হাতে পরিমাণ নাই। কামের নিকটে অনেকের বল প্রকাশ চলিয়াছে। বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে—কামকে দমিত পদানত করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে কাহারও বল প্রকাশের সুযোগ নাই। প্রবেশার্থি! হয় ক্রোধাগুণে পুরিয়া মর, না হয় নিজেও ক্রোধের অবতার হও। হইতেছেও তাহাই। ক্রোধের অনুচর গুলিও এক একটি ক্রোধের অবতার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্রোধকে আশ্রয় বা ক্রোধের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া তাহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইতেছে।

ক্রোধের প্রথম অনুচরের নাম দেখিলাম **নরহত্যা।** উঃ! কি ভীষণ মূর্ত্তি! দেখিতেই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! দেহ বলিষ্ঠ, কর্কশকেশে ঝুটী বাঁধা, হস্তে শোণিতাক্ত কুঠার!—চক্ষু বিস্ফারিত!—দেহ কম্পিত! যাহার প্রতি দৃষ্টি, তাহাকেই হনন! পরিত্রাণ নাই,—দয়া প্রকাশ নাই,—মমতা নাই। ইহারা যাহাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহার জন্য অন্যপথ দেখিলাম। সে অন্য পথে অন্যস্থানে গমন করিতেছে।—সে স্থানও সেই বাড়ীর মধ্যে বটে।

ক্রোধের দ্বিতীয় অনুচর দেখিলাম।—অপূর্ব্ব জীব। ইহাদিগের উর্দ্ধভাগ নরাকার—অধোভাগ গাভী। দুরাচারগণের হাত নাই। বাহুর সহিত অস্ত্রবদ্ধ, স্বীয় শরীরের অধোভাগ স্বহস্তে ছেদন করিতেছ। ভ্রুক্ষেপ নাই! যাতনা বোধ নাই।—পরিণাম চিন্তা নাই। ইহারা নিজে নিজের দেহ কাটিতেছে, পরকে কাটিতে শিখাইতেছে। যাহারা ইহাদিগের পথানুবর্ত্তন করিতেছে, তাহারাও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম। দুরাচারের নাম——**গোহত্যা।**

এই সব অদ্ভুত জীবের কার্য্য দেখিয়া ক্রমেই কৌতুহল বৃদ্ধি হইতেছে।

ক্রোধের তৃতীয় অনুচর দেখিতে অগ্রসর হইলাম। প্রথমে ইহাদিগকে চিনিতে পারিলাম না। ইহারা নর কি জন্তু, কি কি, কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টায় দেখিলাম, নর বটে। দুরাচারদিগের কার্য্য দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। কি বিকট চেহারা। কি বীভৎস মূর্ত্তি! নাম **আত্মঘাতী**। ইহারা আপনাকে আপনি ভোজন করিতেছে। নিজের শোণিত মাংসে নিজের উদরপূর্ণ করিতেছে। পরকে বলিতেছে, "আইস জীব! তোমাদিগকে পরমসুখ দান করিব। নিজের শরীরে নিজের উদরপূর্ণ না করিলে, এ ক্ষুধা মিটিবে না। আইস! উদরপূর্ণ কর। আমরা ক্রোধরাজের অনুচর। ক্রোধের আর কি পরিচয় দিব। দেখ, আমাদিগের মত সুখী কে?" আহার আমরা অনুসন্ধান করি না, নিজের মাংস নিজে খাই, সুখের সীমা কি?" দেখিলাম, জীব ক্রোধের প্রসাদে, ক্রোধের উত্তেজনায় এই অনুচরশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

ক্রোধের চতুর্থ মূর্ত্তি দেখিলাম। নাম—**নিষ্ঠুর্য্য**। দুরাচারের কার্য্য দেখিয়া বড় ভয় হইল! দুঃখকষ্টে চক্ষু মুদিয়া ডাকিলাম, "মা ব্রহ্মময়ি! এ কি দেখালি মা? তোর রাজত্বে এ কি দেখি মা! তোর দয়ার রাজ্যে এমন নির্দ্দয়তা কেন মা? আহা! কি নিষ্ঠুর!—নরনারী পশুপক্ষী বিচার নাই, দোষগুণের লক্ষ্য নাই, ক্ষমা পরিত্রাণ নাই। দয়ার লেশ নাই। হতভাগ্য নিষ্ঠুর ইহাদিগের কাহাকে হত্যা করিতেছে, কাহার নাসা ছেদন করিতেছে, কাহার পক্ষ ভগ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, পক্ষী যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে! নির্দ্দয় সেদিকে আর ফিরিয়াও চাহিতেছে না। কোন জন্তুর চক্ষু উৎপাটিত করিয়া লইতেছে। চক্ষুহীন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে যাইতেছে, চক্ষু নাই, সুপথে যাইতে বিপথে পড়িতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার নিষ্ঠুরের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে।—আবার আহত হইতেছে, আবার পলাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দেহ শোণিতসিক্ত। এ সব দৃশ্য কি আর দেখা যায়? তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম।

কামের পঞ্চম অনুচরের নাম—**দুর্ম্মুখতা**। অস্ত্র নাই, হুঙ্কার নাই, কিন্তু কথায় হীরার ধার। এক এক জনকে এমন কথা বলিতেছে যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা। কঠিন বাক্য সহ্য অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর। দুরাচারের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, কতজন কত ঘৃণিত কার্য্য করিতেছে।

দুর্ম্মুখের অস্ত্র নাই, কিন্তু তাহার কার্য্য বড় অধিক। দুর্ম্মুখ কত জনের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা গণনা করা যায় না। বাক্যজ্বালায় কত জন উদাসীন হইতেছে, কতজন আত্মহত্যার আশ্রয় লইতেছে, কতজন ক্রোধের আশ্রয়ে যাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। দুর্ম্মুখের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দুষ্ট কথার জোরে জিনিতেছে। এখন বুঝিলাম, বাক্যই অমৃত, আবার বাক্যই বিষ। বাক্যের গুণে লোক মোহিত হয়, পদানত হয়; বাক্যের দোষে আপন পর হয়, আপনার সর্ব্বনাশ হয়। দুর্ম্মুখের সে জ্ঞান নাই। দুর্ম্মুখ কঠিন বাক্য শুনিয়াই সুখী। পরকে ব্যথা দিয়া তাহার অপার সুখ। তাহার আশ্রয়ে লোকের প্রবৃত্তিও দেখিলাম। বুঝিলাম, এ প্রবৃত্তি পরিণামে যে কিরূপ ভয়ানক হইবে, মনুষ্য তাহা বুঝিল না।

আর এখানে নহে। অনেক দেখা হইয়াছে। এখন তৃতীয় দ্বারের কাণ্ডকারখানা একবার দেখিয়া আসি।

তৃতীয় দ্বার।

দ্বারপাল—লোভ।

তৃতীয় দ্বারে অসংখ্য লোক। প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে যত লোক দেখিলাম, এখানে তাহার চতুর্গুণ লোক। সকলেই দ্বারপালের কৃপা ভিখারী সকলেই পদানত।—সকলেই যেন কাতরে চরণপ্রার্থী। এমন পরমপদ আর যেন নাই। এমন পুরুষ আর যেন নাই। প্রবেশের এইটাই যেন অতি সুগম পথ। প্রবেশার্থীরা তাই এখানে বেশী বেশী জটলা করিতেছে। দেখিলাম, দ্বারীর নাম—**লোভ।**

লোভ মহারাজের বেশ চমৎকার। অতি ক্ষীণ শরীর। কিন্তু নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য দেহে সাবধানতার কস্না মেরজাই আঁটা। শীরে ধর্ম্ম-মুকুট। হস্তে ন্যায় দণ্ড। মুখে বলিতেছে এক, ইঙ্গিতে বলিতেছে আর। পার্শ্বে ধন, রত্ন, জন, স্বার্থ, জীব, যশ, খ্যাতি পূর্ণ প্রকাণ্ড মঞ্জুষা। লোভ থাকিয়া থাকিয়া, অন্যের অলক্ষ্যে এক একবার সেই দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছে। এক একবার দ্রুতপদে মনের অধৈর্য্যতায় অঙ্গুলী দিয়া রসাস্বাদ গ্রহণ করিতেছে। মহারাজ লোভ কহিতেছে, "জগতে ধন্য হইবার জন্য আইস মানব, আমাকে আশ্রয় কর। আমি বিনামূল্যে তোমাদিগের বাঞ্ছিত ফল দান করিব। তোমাদের কোন অভাব থাকিবে না। চেষ্টাই উন্নতির উপায়। আমার নামই চেষ্টা। লোভ না হইলে, চেষ্টা হয় না। বরং আমি চেষ্টা হইতেও শ্রেষ্ঠ। লোভ কর, অবশ্যই ফল পাইবে। ধন, জন, খ্যাতি, যশ তোমার সবই হইবে। মানব! তবে আর তোমার অভাব কি? লোকে লোভী বলিয়া ঘৃণা করিবে? সেটী তোমাদের ভ্রম! জগতের পনের আনা লোক লোভী, তাহাদিগকে কি কেহ চিনিতে পারে? সাবধান হও, কার্য্যের পূর্ব্বভিত্তি দৃঢ় কর। দেখিতেছ না, আমি সাবধানতার আবরণে দেহ আবৃত করিয়াছি, মাথায় ধর্ম্মের মুকুট, মুখে ধর্ম্ম নাম উচ্চারণ করি, হস্তে আমার ন্যায় দণ্ড। লোকে কি মন দেখিতে পায়? আমার এ বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, আমারই নাম লোভ! ভয়-নাই, মনকে দৃঢ় কর, আইস, তোমাদের উন্নতিপথে লইয়া যাই। লোভের বক্তৃতায় দেখিলাম, অনেক লোক লোভের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সেই অগণ্য লোক শ্রেণীর মধ্যে কেবল দুই একজন মাত্র লোককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিলাম। লোভ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাও, মূর্খ, সংসারে চিরদিন দুঃখ ভোগ করিতে যাও। হা অন্ন, হা অন্ন!—হা অর্থ, হা অর্থ!—হা ধন, হা ধন!—হা মান!—হা যশ করিয়া, ভ্রমণ করিতে যাও মূর্খ ঘুরিয়া বেড়াও। সংসারের ঘৃণাভাজন হইয়া,—সংসারের পদাঘাত সহ্য করিতে যাও, হতভাগ্য যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।"

লোভের ব্যবহার দেখিলাম। তখন ইহার অনুচরবর্গের কাণ্ড-কারখানা দেখা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। লোভের প্রথম পরিচারক

কার্পণ্য। অপূর্ব্বমূর্ত্তি! প্রকাণ্ড উদর—টাকার হাঁড়া। অর্থ অর্থ করিয়া—অর্থের ভাবনা ভাবিয়া মাথাটী ক্রমে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ-চিন্তায় মাথার কেশ উঠিয়া, তথায় একটী প্রশস্ত টাকের পত্তন দিয়াছে। হাত পা নাই, সর্ব্বাঙ্গেই যেন উদর। দেহের শোণিত অপেক্ষা অর্থ মূল্যবান! যাহা উদরস্থ করে, তাহা আর নির্গত করে না। ক্ষুধায় অন্ন—তৃষ্ণায় জল পর্য্যন্ত পান করিতে প্রস্তত নহে। ক্ষুদ্রচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, সম্মুখস্থ সকলকে বলিতেছে, "আইস জীব! সঞ্চয় কর। ইহার মত সুখ আর নাই। তোমাদের নাই নাই রব,আমার আছে সব। বল দেখি, কে সুখী কে দুঃখী? আহার চাই না, বসনভূষণ চাই না, বিলাসলালসা চাই না, অর্থই আমাদের সব। অর্থে শোক দমিত হয়,—ক্ষুধা নিবৃত্তি পায়, তৃষ্ণা ঘুচিয়া যায়, নিদ্রা তন্দ্রা থাকে না। অর্থে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। আইস! সেই অর্থ সঞ্চয় কর। এ জিনিস ব্যয় করিবার নহে, ভোগ করিবার নহে, দেখিয়া কেবল তৃপ্তিলাভ করাই সুখ। যাহা ব্যয় হয়, তাহা কি আর সঞ্চিত হইতে পারে? ব্যয়পথ রুদ্ধ না করিলে, সঞ্চয় হয় না। আইস! আমার শরণ গ্রহণ কর।" কার্পণ্যের কথায় মুগ্ধ হইয়া, অনেক লোককে সেই সুবৃহৎ বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে দেখিলাম।

লোভের দ্বিতীয় অনুচর বড় নম্র। যেন অতি সদাশয়,—অতি—বিনীত,—একেবারে মাটীর মানুষ।—মুখে কথা নাই—অতি সত্যবাদী। পুণ্য ভিন্ন পাপের ছায়াও স্পর্শ করেন না। দেখিয়া মনে মনে বড় ভক্তি হইল। ভাবিলাম, এই পাপপুরীতে ইনি কেন? আগ্রহে ললাট ফলক পাঠ করিলাম। দেখিলাম, লেখা আছে,—**বঞ্চনা**। তখন চৈতন্য হইল। বুঝিলাম, বাহ্যদৃশ্য এরূপ না হইলে, লোকে প্রবঞ্চিত হইবে কেন? কথার, সাধুতার, ব্যবহারের, রূপের কুহকে মুগ্ধ না হইলে, লোকে কি প্রতারিত হয়? বঞ্চনার বেশ বঞ্চনারই উপযোগী! প্রস্থান করিলাম।

লোভের তৃতীয় অনুচরের নাম **স্বার্থপরতা**। উদর ভূমিতলে সংপৃষ্ট হইতেছে, তবুও আহারে বিরতী নাই। স্বার্থ আহার করিয়া, স্বার্থপর যেন স্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছে। নাসাবিবরে বত জীবজন্তু প্রবেশ

করিতেছে, দেহভারে চলিবার শক্তি নাই, তবুও স্বার্থসাধনে বিরতী নাই। স্বার্থপর নিজের স্বার্থ লইয়া বিব্রত। লোকদিগকে নিজের দেহের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেতে কহিতেছে, "মানব! তুমি কার? পরের জন্য কেন প্রাণপণ? তুমি নিজে যাহা আহার কর, নিজে যাহা ব্যবহার কর, তাহাই তোমার। পরের জন্য প্রাণপণ করিও না। নিজের চেষ্টা নিজে দেখ! নিজের সুখে নিজে সুখী হও। পরের জন্য তোমার মাথাব্যাথার আবশ্যক কি?" দেখিলাম অগণ্য লোকে সেই স্বার্থপরতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বার্থপর হইতেছে। আত্মীয়, স্বজন, গুরুজন, প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বার্থের মন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতেছে।

লোভের চতুর্থ অনুচর অপূর্ব্ব জীব। হস্ত পদাদি অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু হস্ত প্রসারণ করিয়া হস্তের তালু ও অঙ্গুলিগুলি অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। তবুও হস্ত প্রসারণে বিরতী নাই। কেবল হস্ত প্রসারণ ও আত্মসাৎ। পদযুগ শাসনযূপে বদ্ধ, তবুও দৃষ্টি আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র। নাম-অপহরণ। দেখিলাম, চারি দিকে চাহিয়া অপহরণ আত্মসাৎ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছে। দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, "জীব! এমন বিনা শ্রমে অর্থলাভ আর কিছুতেই হইবে না। দশজনে প্রাণান্ত পরিশ্রমে আজীবনে যে দ্রব্য সঞ্চয় করে, আমার অনুগ্রহীতগণ তাহা এক দিনে সংগ্রহ করিয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়। তোমাদের কি এ বাসনা নাই? মানব! যদি ধনবান হইতে চাও, সংসারে সুখী হইতে চাও আমার স্মরণ গ্রহণ কর। তোমাদিগকে আমি এখনি দ্বার ছাড়িয়া দিব।" অপহরণের কথাতে অনেকের প্রবৃত্তি দেখিলাম। শত ধন্য ধন্য! অপহরণ তোমার মহিমা।

বাসনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদিগের কার্য্য, স্বভাব, রূপ, দেখিতে চিত্ত ক্রমশঃই ধাবিত হইতেছে। অগ্রসর হইয়া লোভের পঞ্চম অনুচরকে দেখিলাম। শীরোদেশের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিলাম লেখা আছে—কুচিকিৎসা। চমৎকার দৃশ্য! অতি কদাকার মূর্ত্তি! শরীর অতি শীর্ণ। মস্তকে দিব্য চৈতন্য, তাহাতে জড়িবড়ি বাঁধা। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত, তন্মধ্যে নানাবিধ অস্ত্র, সর্পাদি হিংস্রক জন্তু বিস্তর। বিকটমুখ ভঙ্গির সহিত হাস্য করিয়া কহিতেছে, "উপার্জ্জনের এমন পথ আর নাই!

সময়কে তাচ্ছল্য করিও না।

বিদ্যা চাই না, বুদ্ধি চাই না, জ্ঞান চাই না বহুদর্শন চাই না। যাহার ইচ্ছা, আমাকে ভজনা কর। তোমাদিগকে আমি অতুল সুখ দান করিব। জীবহত্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন আর কোথাও আছে কি? আমার প্রিয়শিষ্যগণ জীবহত্যা করে, লোককে কষ্ট দিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারে, তাহারাই আবার চরণ ধরিয়া—সাধ্য সাধনা করিয়া অর্থ দিয়া পরিতুষ্ট করে। আইস মানব! আমাকে ভজনা কর। আমি অনুপায়ের উপায়। জগতে যে কোনও কাজ করিতে পারে না, যে মূর্খের অগ্রগণ্য আমার কৃপায় সে অতুল ধনের অধিকারী হয়। তাহার চরণ ধারণ করিয়া লোকের সাধ মিটে না। অর্থ দিয়া কেহ পরিতুষ্ট করিতে পারে না। আমি মূর্খের পরিত্রাতা! আইস জীব! আমার নিকটে অক্ষয় ফল লাভ করিবে আইস।" কুচিকিৎসার বক্তৃতা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম সকলই সত্য। আরও দেখিলাম, অনেক মুর্খ কুচিকিৎসার আশ্রয় লইয়া সেই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড গৃহে প্রবেশ করিল।

লোভের ষষ্ঠ অনুচর **কুসীদের** সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুসীদের ভেক বড় চমৎকার। উত্থান শক্তি নাই। সুদ গ্রহণ করিয়া সুদে পেট মোটা হইয়া পড়িয়াছে। কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় নাই। দরিদ্রকে একটী পয়সা দান মহাপাতক বলিয়া বিশ্বাস। এদিকে শকুনী গৃধীনীতে উদরে বসিয়া নাড়ীভুঁড়ী খাইতেছে। হাত তুলিবার ক্ষমতা নাই। সর্ব্বদাই চিন্তিত। সুদের হিসাবে বিব্রত। সাত ডাকে কথা নাই। পীড়াপীড়ি করিলে অতি কষ্টে উত্তর পাওয়া যায়—**আমি কুসীদ**। সুদ শুইয়া শুইয়া বেলমাথার উপর চৈতন দোলাইয়া বলিতেছে, আমি আছি বলিয়াই পৃথিবী আছে। আমি না থাকিলে অনেক ধনবানের গৃহে হরিম-টুকের উৎসব লাগিয়া যাইত। অনেক অপগোণ্ড শিশু অনেক কুলপ্রদীপ বংশকুলতীলক ধনুর্দ্ধর যুবা, অনেক বিধবার আমি না থাকিলে দিনান্তে হাঁড়ি চড়িত না। আমি আছি, তাই সংসার আছে। তবে তোমরা আমার ভজনা করিবে না কেন? আমি দুষ্টের পালন শিষ্টের শাস্তি-দাতা। দরিদ্রকে আমার কাছে আসিতে দিই না। যাহারা দিন আনে দিন খায়, তাহাদিগের ছায়া স্পর্শ করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। আর যাঁহারা মোটা মোটা বৃত্তি পান, যাঁহারা ব্যবসায়ে বাটপাড়িতে;

মিতব্যয় ধনবান হইবার প্রধান উপায়।

বা যে কোন উপায়ে ধনী হইয়াছেন, তাহার উপর আবার যে মহাত্মা আমার পরম পূজনীয় অগ্রজ কার্পণ্যচন্দ্রের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কুলরত্নেরা আমার মাথার মণি। তাঁহাদিগের প্রতি আমি করুণাময়। আইস মানব! ধন থাকে, তাহার সদ্ব্যবহার শিখিবে আইস।” কুসীদের যুক্তিকে দৃঢ় করিতে অনেকেই প্রস্তুত হইলেন দেখিলাম।

সপ্তম অনুচর **ধূর্ত্ততা।** ধূর্ত্ত কামরূপী। দেখিতে দেখিতে রকম রকম বেশ পরিবর্ত্তন, রকম রকম ভাষা—রকম রকম চেহারা পরিবর্ত্তন ধূর্ত্তের স্বভাব। কখন সুদীর্ঘ অর্কফলা মাথায় লইয়া হরিনামাবলী গাত্রে দিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিগুণগান করিতেছে, আবার কখন আনাভিচুম্বিত শ্মশ্রু ধারণ করিয়া, পায়জামা চাপকানে দেহ লুকাইয়া কাফেরী ছাড়িয়া ফকিরী ধরিতেছে। ধূর্ত্ততা যে যেমন লোক, যে যাহাতে রত, তাহার তাহাই হইয়া তাহাকে মজাইতেছে। ধূর্ত্ততাকে দেখিয়া—তাহার কার্য্য দেখিয়া শঙ্কা হইল। ধূর্ত্ততা বলিতেছে, “যদি সুখ চাও, তবে তোমরা আমার আশ্রয় লও। আমি তোমাদিগকে সুখদান করিব।” ধূর্ত্তের সে ক্ষমতার বিচার না করিয়া অন্য অনুচরের কার্য্য দেখিতে অগ্রসর হইল্যম। মনে করিলাম, আর এখানে নহে। এইটী দেখিয়া এ দ্বার পরিত্যাগ করিব!

লোভের অষ্টম অনুচর দেখিতে চলিলাম। শীরোনামা পড়িয়া জানিলাম, ইহার নাম **বিশ্বাসঘাতকতা।** বড় নবীন নধর চেহারা। মুখে যেন বড় সত্যবাদী, অতি সদালাপী, অতি ভদ্র। সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান। অতি কর্ম্মঠ। বাহ্যদৃশ্যটি বেশ, কিন্তু আমি শীরোনাম পড়িয়াছি, আমি সে বাহ্যদৃশ্যে মোহিত হইব কেন? অনেকে বিশ্বাসঘাতকতার রূপ দেখিয়া—কথার বাঁধুনী শুনিয়া—আত্মীয়তা দেখিয়া মোহিত হইল; কিন্তু আমি তাহাতে ভুলিব কেন? বিশ্বাস, হইল, কিন্তু আমি তাহাতে ভুলিব কেন? বিশ্বাসঘাতকতা গর্ব্ব করিয়া বলিতে লাগিল, স্বীয় কার্য্য উদ্ধারই প্রধান পুরুষত্ব। কৌশল, বল বা যে কোন উপায়ে স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করাই প্রধান পুরুষত্ব। এই কার্য্যোদ্ধারের যে কয়েকটি পথ আছে, আমি তন্মধ্যে প্রধান। বল প্রকাশে অনেক ক্ষতি। আমি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কার্য্য সমাধা করি। মানব! আমার নিকটে আইস।

কার্য্যের প্রণালী ও উদ্ধারের উপায় তোমাদিগকে উপদেশ দিব। কোন ব্যয় নাই। আমি শিষ্যগণের প্রতি দয়াময়। আমি না পারি কি? কার্য্যই ত সংসার? কার্য্যের জন্যই ত মানবজন্ম?—অতএব সেই কার্য্যোদ্ধারের সুগম পথ দেখাইতে আমার জন্ম। আইস মানব! তোমাকে দিক্ষীত করি।” বিশ্বাসঘাতকের কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেক মূর্খ দিক্ষীত হইল। অনেকেই সেই প্রাচীর বেষ্টিত বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি চতুর্থ দ্বারে যাইলাম।

চতুর্থ দ্বার।

দ্বারপাল মোহ।

তৃতীয় দ্বারের আর কি দেখিব? বিরক্ত হইয়া চতুর্থ দ্বারে উপনীত হইলাম। চতুর্থ দ্বারপালকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দ্বারপালের নাম **মোহ।** মোহের অঙ্গসৌষ্টব পরিপাটি, যেন রাজকুমার! ভিতরে কিছু থাকুক বা না থাকুক. বাহ্য চাকচিক্যটি বিলক্ষণ আছে। বড় কাহারও দিকে দৃষ্টি নাই, বড় কথায় আড়ম্বর নাই, বড় মেজাজ, আমিরী ধরণে অমীর হইয়া উপবিষ্ট মুখে বেশী কথা নাই, কিন্তু বড় তেজ, অধিক বিক্রম। অন্যান্য দ্বারপালের নিকটে পরিত্রাণ আছে, অনেককে বিমুখ হইয়া যাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু মোহের দ্বারে যাহারা আসিতেছেন, তাঁহাদিগের আর পরিত্রাণ নাই। কেমন যে আকর্ষণ,—প্রবেশার্থীরা আপনা হইতে মোহের চরণে গড়াইয়া পড়িতেতেছে, আর অনুচরগণের সাহায্যে অতি কষ্ট পাইয়া গৃহ প্রবেশ করিতেছে। মোহের অনুচরগুলির সকলেই ক্ষমতাপন্ন।—সকলেই গম্ভীর। মোহের ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। এখন অনুচরগণকে দেখিতে চলিলাম।

মোহের প্রথম অনুচর দেখিলাম। একি চৈতন্য না অচৈতন্য, জীব না জড়? প্রথম দর্শনে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুচরের কথা নাই, নীরব চৈতন্যযুক্ত জড়মূর্ত্তি!—ধুধু প্রজ্বলিত বহ্নি শিখা! কর্ষন স্নিগ্ধ, যেন জ্যোৎস্নার শান্তি রসাশ্রিত মধুর জ্যোতিঃ। জ্যোতি সবল,—জ্যোতিতে শান্তি আছে,—শিখার আকর্ষণ আছে,—শিখাগতিতে মন

ভুলান প্রলোভন আছে। জ্যোতির উপরে সেইরূপ অক্ষরেই নাম অঙ্কিত আছে,—**রূপজ মোহ।** বুঝিলাম, এ রূপের জ্যোতিঃ। দেখিলাম, অনেকে এই জ্যোতির গতিতে মোহিত হইয়া রূপের জ্যোতিতে ঝম্প প্রদান করিতেছে। প্রথমে দেখিতেছে, এ জ্যোতি অতি স্নিগ্ধ, অতি শান্ত, কিন্তু যখন পড়িতেছে তখন দেখিলাম, তাহারা সকলেই দগ্ধ হইতেছে। তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিলে—তাহাদিগের যন্ত্রণা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। রূপ দেখিতে স্নিগ্ধ, স্পর্শ করিতে বহ্নি। দূর হইতে দেখিতে ভাল, ব্যবহারে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। রূপজমোহের এই বৈচিত্র দেখিয়াও লোকে বুঝিতেছে না। আপনার মনে আপনি মোহিত হইয়া লোকে এই রূপের আগুণে পুড়িয়া মরিতেছে। এই সকল হতভাগ্যগণের যন্ত্রণায় পাষাণহৃদয়ের চক্ষেও জল আইসে।

মোহের দ্বিতীয় অনুচরের নাম **ধনজ মোহ।** ধনজ মোহের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, হীরকাদি বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। গর্ব্বেরও সীমা নাই। অতি গম্ভীর।—অতি গর্ব্বিত!—অতি বাবু! নিজের অঙ্গের দিকে চাহিয়া নিজেই সন্তুষ্ট। বিশ্বাস, এত ধন আর কাহার আছে? আছে কি না, সে অনুসন্ধান লইবার অবসর নাই, নিজের ধন দেখিয়াই জগতের ধনরত্নের তুলনা হয়। তাই নিজের বিশ্বাস, এত ধন আর কাহার আছে? মোহ গর্ব্বিত ভাবে আমিরী ভাষায় বলিতেছে, "মানব! ধনের ন্যায় বন্ধু আর কে আছে? দেখ দেখি, আমার কিসের অভাব!—ধনে না হয় কি? ইচ্ছা করিলে ধনের সাহায্যে আমি দ্বিতীয় জগৎসৃষ্টি করিতে পারি, দেবতাদের দেবত্ব নষ্ট করিতে পারি, সমুদ্র শুকাইয়া দিতে পারি। ধনবলের কাছে আবার অন্য কি বল? আইস! তোমরা আমার অনুগমন কর। আমি তোমাদিগকে অতি সহজ নীতি শিখাইব। মান, খ্যাতি, যশঃ, স্ত্রী-কন্যা, পুত্র, পরিবার, সবই অর্থের বলে পাইবে, কোন অভাব থাকিবে না। অভাবই ত দুঃখ? তোমার অভাব না থাকিলে আর ভয় কি?" ধনজমোহের বক্তৃতা শুনিয়া অন্যস্থানে গমন করিলাম।

মোহের তৃতীয় অনুচরের নিকটে যাইতে না যাইতে বহুলোকের চীৎকার শুনিলাম। আরও আগ্রহ বাড়িল। দ্রুতপদে চলিলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি লোক অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একজন লোকের কণ্ঠে শত শত সরস্বতী বসিয়া শত শত সুখের কথা কহাইতেছেন। ইহার দেহ অতি ক্ষীণ, সর্ব্বাঙ্গে কাপড় বাঁধিয়া দেহতৃণকে যেন সালতরু রূপে পরিণত করা হইয়াছে। মস্তকটি যেন বলে। তাহাতেই আবার বীরত্বের চিহ্ন রাজ মুকুট। চেহারা দেখিয়াই ত হাস্য সম্বরণ কঠিন হইল। নাম দেখিলাম,

জনজ মোহ। ইনি লম্ফ লম্ফ করিয়া—কখন হস্তদ্বয় ইতস্ততঃ দোলাইয়া কখন মুষ্টিবদ্ধ করিয়া—কখন উর্দ্ধে কখন বা অধোতে নিক্ষেপ করিয়া অতি উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছেন, "মানব! আমার মত প্রতাপশালী আর কেহ নাই। আমি যদি মনে করি, তাহা হইলে না পারি কি? শত সহস্র লোক আমার আজ্ঞাকারী। ইচ্ছা করিলে আমি নভোমণ্ডলে স্তরে স্তরে পদ্ম ফুটাইতে পারি, পশ্চিম দ্বাদশাদিত্য উদিত করিতে পারি, পর্ব্বতশৃঙ্গে যুথে যুথে হাঙ্গর কুম্ভীরকে সাঁতার দেওয়াইতে পারি, লোক বলের নিকটে আবার বল? যাহার লোকবল আছে, সেই সংসারের রাজা! আইস মানব! আমি তোমাদিগকে জন বল সংগ্রহের পদ্ধতি শিক্ষা দিব।" জনজ মোহের এই বক্তৃতায় দেখিলাম, দলে দলে তাহার অনুবর্ত্তি হইল। সকলেই বলিল, "জনবলই বল। আমরা জনবলে বলবান হইয়া জগত ইতিহাসে অক্ষয় যশ লাভ করিব। ধরণীকে রক্তস্রোতে ভাসাইব।" ইহাদিগের হুঙ্কারে কর্ণ বধির প্রায় হইল। প্রস্থান করিলাম।

মোহের চতুর্থ অনুচরের নাম হিংসা। শরীর অতি রুগ্ন। চক্ষু অতি ক্ষুদ্র কিন্তু যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকের লোকই দগ্ধ হইয়া যায়। পরের সৌন্দর্য্যে,—পরের ধনে, পরের সুখে হিংসা বড়ই কাতর। কাহারও সহিত কথা নাই পরের ভাল দেখিয়া হৃদয় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! নাসিকা কুঞ্চিত! মুখভঙ্গি বিকৃত!—যন্ত্রণায় যন শরীর বক্র!—ইহার সম্মুখে যে যাইতেছে, সেই বদন বিকৃত ও নত হইয়া——হিংসা—পাইয়া হিংসা

বহুদর্শন প্রধান শিক্ষক।

হইতেছে। গৌরবর্ণ কৃষ্ণ হইতেছে, ধনী দরিদ্র হইতেছে, সুখী দুঃখের সাগরে ভাসিতেছে। দৃষ্টির এমন লোকদগ্ধকারী শক্তি আমি আর কখন দেখি নাই। অনেকক্ষণ পরে হিংসর বদনে কথা সরিল। আগ্রহ সহকারে নিকটে গিয়া শুনিলাম, হিংসা বলিতেছে, "মানব! আমার মত ক্ষমতাপন্ন কে? আমি যে দিকে চাই, সেই দিকেই শুকাই! উদ্যান মরুভূমি হয়, বিচিত্র অট্টালিকা পত্রকুটীর হয়, সুখের চাঁদ রাহুগ্রস্থ হয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবা অশীতিপর কদাকার বৃদ্ধ হয়—কেবল আমার দৃষ্টিতে। আইস! আমার এই চক্ষু গ্রহণ কর। নিজের প্রাধান্য—নিজের মান যশঃ ধন অক্ষুণ্ণ রাখ, পরকে বাড়িতে দিলে—পরে অতুল বৈভব পাইলে তোমাকে কে গণনা করিবে? পরকে নীচ করিয়া—পরের যাহা তাহা হিংসাদৃষ্টিতেই দগ্ধ করিয়া নিজের প্রাধান্য রক্ষা কর। পরের সর্ব্বনাশ না করিলে নিজের কি কখন ভাল হয়? আইস মানব! আমার নিকটে সংসারে প্রাধান্য লাভের ঔষধ শিখিবে আইস।" দেখিলাম, কতকগুলি লোক হিংসার কথা শুনিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল,—কতকগুলি আবার হিংসার বক্তৃতায় মোহিত হইয়া হিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ও সেই বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি অগ্রসর হইলাম।

অগ্রসর হইয়া মোহের পঞ্চম অনুচর গুরুদ্বেষকে দেখিলাম। অপূর্ব্ব জীব। অতি দীর্ঘ দেহ।—যেমন দীর্ঘ তেমনি কৃশ। সর্ব্বাঙ্গ এক। সন্ধি নাই,—সব এক। হাত পা নাড়িবার—মস্তক সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা নাই। হতভাগ্যের দর্পের কিন্তু বিরাম নাই। অতি শীর্ণ, তবুও শীর্ণ মুষ্টিতে মুষ্টিবদ্ধ করা আছে। গুরুদ্বেষ সম্মুখস্থ জনসাধারণকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, "মানব! পরের জন্য কেন খাটিয়া মর? নিজের সুখের পথে কাঁটা দিয়া পরের জন্য কেন প্রাণান্ত কর? জান ত সংসারে কেহই কাহার নয়! মাতা, পিতা, গুরু, খুল্লতাত, মাতৃষ্বসা, ইহারাও যে, তুমি আমিও সেই। তাহারা তাহাদিগের জন্য ভাবুন, আমরা আমাদিগের জন্য ভাবি। তাদের জন্য তোমার এত কষ্ট কেন? ঈশ্বর যাহাকে যে কার্য্য দিয়াছেন, সে ত বাধ্য হইয়াই সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। সে জন্য মাতা গর্ভধারণের জন্য, কি পিতা ঔরস দাতা বলিয়া সন্তানের প্রতি কোন দেবী করিতে পারেন না। সন্তানের প্রতি জুলুম

করিবার অধিকার ন্যায়ানুসারে তাহাদিগের ন্যাই। এ কেবল সমাজ বন্ধন! সমাজ শাসন ত মনুষ্যকৃত! তাহাতে অবাধ্য হইতেও পরকালের ভয় কি? মনুষ্যসমাজ পশুসমাজের আদর্শ লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কেননা জগতে পশু জন্ম আছে। সেই পশুদিগের ব্যবহার দেখিলে সমাজের অনেক কথা শিখিতে পারা যায়। পশুরা যতদিন সন্তান উপযুক্ত না হয় ততদিনই প্রতিপালন করে, উপযুক্ত হইলে পিতামাতার সহিত সন্তানের কোন সম্বন্ধই থাকে না। তাই তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি, আপনার পথ আপনি পরিস্কার কর। আইস! আমি তোমাদিগকে সুখদান করিব।" গুরুদেবের এই বক্তৃতায় অনেক হতভাগ্যকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দেখিলাম। হতভাগারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে কাঁদাইয়া আত্মসুখের জন্য গুরুদেবের স্মরণ গ্রহণ করিল। আর কতকগুলি ইহার বাক্যে হাস্য করিয়া কেহ বা তিরস্কার করিয়া প্রস্থান করিল, আমি প্রস্থান করিলাম।

পঞ্চম দ্বার।

দ্বারপাল মদ।

পঞ্চম দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বারপাল আপনার মেজাজে আপনি মোহিত হইয়া বসিয়া আছে। অনুচরেরা করতালী দিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া—প্রভুকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার গুণগান করিতেছে। লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, ভয় নাই সকলেই উন্মত্ত। বাহ্যজ্ঞান শূন্য! দ্বারপালের নাম মদ। এই মত্ততায় অনুচরগণও প্রভুর ভাবাপন্ন। ভ্রূক্ষেপ নাই, আপনার ভাবে আপনি উন্মত্ত। মদ আপনার মনেই বলিতেছে, "এই জন্যই জীবের এত দুর্গতি। আমাকে অবজ্ঞা করিয়াই জীবের দুঃখ কষ্ট। সংসার কি?—পাপপুণ্য কি? সবই অসার।—এই সংসারেই নরক এই সংসারেই স্বর্গ। সাংসারিক সুখই স্বর্গসুখ, সাংসারিক দুঃখই নরকভোগ। এই সামান্য কথাটা কেহ বুঝে না। পরকালের নাম করিয়া, পরকালে সুখী হইব বলিয়া হতভাগারা প্রকৃত ঐহিকসুখ নষ্ট করে। ইহাতেই সংসারে এত দুঃখ। হস্তিমূর্খ মানব! এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারে না?" মদের স্বগত বক্তৃতায় অনেকের মন টলিল। যে হতভাগ্য পর-

কালের দোষারোপ করে, যে মূর্খ করতলন্যস্ত বস্তু চিনিতে পারে না তাহার নিকটে থাকিলেও অনিষ্ট আছে।

মদের প্রথম অনুচর দেখিলাম, অতি ভদ্র স্বভাব। যেমন সৌন্দর্য্য, তেমনি রূপ। মুখখানি বেশ হাসি হাসি, কিন্তু অসার—অস্থায়ী। নাম **মিথ্যা।** মিথ্যা বহুরূপী! এক একবার সম্মুখস্থ মানবগণকে এক এক মূর্ত্তি দেখাইতেছেন। বড় কৌতূহল হইল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম ইহার প্রথম মূর্ত্তি **ব্যবহার।** (ওকালতী মোক্তারী ইত্যাদি।) মাথায় দিব্য সত্য-রেসম মোড়া মিথ্যা পাগড়ী। প্রকাণ্ড মস্তক। দেহ মস্তকের পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র। মিথ্যার তরজমা করিয়া—মাথা খাটাইয়া মাথাটী কিছু বড় হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবহার অতি সদ্বক্তা, অতি ধীর ভাবে বলিতেছে, "আইস জীব। আমার নিকটে আইস। ব্যবহারশাস্ত্রের কুটপ্রশ্ন তোমাকে শিক্ষা দিব। আমি রাজার প্রজা নহি, মহাজনের খাতক নাহি। রাজা বরং আমার অধীন। আমি রাজার রাজা। আমি সত্যের মুখস পরিয়া হয় কে নয় করি, নয় কে হয় করি। আমার তর্কজালে বড় বড় বিচারসিংহ পড়িয়া যায়। মিথ্যাকে আমি সত্যের সাজে এমন সাজাই যে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া কে চিনিতে পারে? আমি যে কথায় এক জনকে রাজা করি, সেই কথাতেই আবার আর এক জনকে ফাঁসিতে ঝুলাই। আমার নীতি কে বুঝিতে পারে? সত্য বলিয়া একটা যে উপকথা আছে, সেই কথার জোরে আমরা না পারি কি? আইস! ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কীর্ত্তি রাখ।" বলিতে বলিতে এ মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া এক গোয়ালন্দ-তরমুজ বৃন্ত মস্তকে করিয়া পবিত্র চটিপদ এক বৃদ্ধ টিকি নাড়িয়া দেখা দিলেন। বলিলেন "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু মুখে আমাকে আঁটিতে পারে কে? আমি প্রজাপতির সেনাপতি।—আমার অসাধ্য কাজ কি আছে? কাহাওর মিত্তভোজী নই, লোকে সন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজা দেয়। পাত্র অন্ধ, খঞ্জ, মূক, মূর্খ হইলে তাহাকে কন্দর্প করি, গন্নাকাটা খাদা কালপ্যাঁচা মেয়েরা আমাদের বচন তুলিতে রং হইয়া এক একটী বিদ্যাধরী মেনকা হইয়া পড়ে। আমাদের আটে কে? নাম আমার **ঘটকালী।"** দেখিতে দেখিতে আবার সে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। দেখিলাম, এক তালপত্র নির্ম্মিত

আজ যাহা পার তাহা কল্যকার জন্য রাখিও না।

আতপত্র স্কন্ধে বামকুক্ষিতে তুলাটে লেখা পুঁথি, হস্তে এক যষ্টি, নাম, **দৈবজ্ঞান।** দৈবজ্ঞান চসমা চক্ষে দিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছে, "আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কোন ধার ধরি না, তবুও লোকে আমার তোষামদ করে। আমি যাহা বলি, তাহাই লোকের বেদবাক্য। আমি চতুস্পাটীর মুখ দেখি নাই, পিতামহ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারই ত্যজ সম্পত্তি স্বরূপ এই "জ্যোতিষ" পুথিখানির বলে আমি লোকের সৌভাগ্য দান করি, গ্রহ শান্তি করি, দৈবকার্য্য করি। আমার প্রতিদ্বন্দী নাই। দৈবের নামে দোহাই দিলে তাহার আর প্রতিদ্বন্দী হইবে কে?—আইস জীব। এই ব্যবসা আরম্ভ করিয়া মানবজাতির প্রতি নিস্কর সম্পত্তির সত্ব হাসিল কর।" দেখিতে দেখিতে রূপ পরিবর্ত্তন। দীর্ঘ শরীর—প্রকাণ্ড ভুড়ী,—নাম **দালালী।** কথার রকম রকম কায়দা আছে, মুখের জোরে রাজা-উজীর মারা আছে ভূলাক দশলাকের খবর দেওয়া আছে, **দালাল।** বলিতেছে, আমাকে ভজনা কর। আমি কাহারও চাকর নহি, অথচ আমার উপার্জ্জন আছে! কথার জোরে সব। আমাদের কথা লোকে টাকা দিয়ে কেনে। আমরা মিথ্যার চামড়ায় মোড়া—তবুও আমাদিগের প্রতি সমাজনের বিশ্বাস আছে। এমন বোনেদী কাজ করিয়া ধনবান হইতে তোমাদের কি সাধ যায় না? দালালী দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে এক কদাগার নারীমুর্ত্তিতে পরিণত হইল। অতি মোটা, স্তনযুগল আনাভিলম্বিত, মস্তকের কেশ নাই, পশ্চাভাগে পাকা, দুই এক গাছি যাহা আছে, তাহাতে কোনরূপে সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য একটি খোপা আছে. পরিধানে সতীত্ব বসন, নাম **দূতপনা।** দূতপনা কহিতেছে, "আমি শান্তিদেবী। প্রেম রাজার রাজ্যে আমি শান্তি দিয়া থাকি। পৃথিবী রাজার কি অত্যাচার। যে যাহাকে ভালবসে সে তাহাকে পাইবে না? ভালবাসাতেই ত সংসার! ভাল না বাসে কে, ভাল বেসে লোকে ভালবাসা পায় না বলিয়াই আমরা পৃথক প্রেমের রাজ্যে স্থাপত করিয়াছি। মানবগণ! মানবীগণ! আইস! তোমরা প্রেমের রাজ্যে যাইবে। সেখানে প্রণয় ভালবাসা। সোহাগ আদর গাছ কত ফল, হাত বাড়াইয়া ফল পড়িয়া দিব। খাইয়া জন্ম স্বার্থক করিবে। আইস।" আর না।—আর দেখিব না। এক মিথ্যার

মূর্ত্তিভেদ দেখিতেই সময় কাটিল। আরও না জানি কতই আছে। দেখিতে গেলে চলিবে কেন? মিথ্যা এই পর্য্যন্ত থাকুক, অন্যান্য মূর্ত্তি দেখি।

মদের দ্বিতীয় মূর্ত্তি নাম **ধর্ম্মত্যাগ।** আশ্চর্য্য মূর্ত্তি। বেশভূষা ও বাহ্যদৃশ্য দেখিলেই লোকের ধর্ম্ম জানিতে পারা যায়। প্রত্যেক জাতিতে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর এক একটী নির্দ্দিষ্ট বেশ ও চেহারা আছে। এই মূর্ত্তিতে তাহার কিছুই নাই। যেন সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীর বেশভূষা—সমস্ত ধর্ম্মের আকৃতিগত পার্থক্য একীকৃত হইয়া ইহার শরীরে বিরাজ করিতেছে। ধর্ম্মত্যাগ হাসিয়া হাসিয়া লোকদিগকে বলিতেছে, "মানব! নিশ্চয় জানিও, স্বধর্ম্মে সুখ নাই। মনুষ্য হৃদয় নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করে; পরিবর্ত্তনময়ী সংসারের যখন সকলই পরিবর্ত্তন, তখন মনুষ্যচিত্ত পরিবর্ত্তনের জন্য কেন লালায়িত না হইবে? তবে স্বধর্ম্মের সেই এক টানা স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইয়া ক্ষুদ্রচিত্ততার পরিচয়ে আবশ্যক কি? যে ধর্ম্মে যত সুখ, সেই ধর্ম্ম হইতে সেই সুখটুকু সংগ্রহ না করিলে চলিবে কেন? আইস মানব! আমার মত গ্রহণ কর। জগতের ধর্ম্মসমাজ আলোড়িত করিয়া সুখসংগ্রহ কর। ধর্ম্ম কি?—মজাদারী ভড়ং বৈত নয়? তবে স্বধর্ম্মের প্রাচীর মধ্যে থাকিয়া সেই একভাবে জীবন যাপন করা কি সামান্য দুঃখের বিষয়।" ধর্ম্মত্যাগের বক্তৃতায় কেহ বা প্রত্যক্ষে কেহ বা পরোক্ষে মোহিত হইতে দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

মদের তৃতীয় মূর্ত্তি দেখিলাম। প্রকাণ্ড মস্তক, হস্তপদাদি অতি সরু। সেই প্রকাণ্ড মস্তকে বিধি-ব্যবস্থার দারুণ গোল। দেশের যত বিধিব্যবহার, আইনকানুন, সকলই তাঁহার মস্তকে কুণ্ডলীত—নাম **বিচার বিপ্লব।** বিচারের নাকে আইন-চসমা, গায়ে কুট-নীতির অঙ্গরাখা, মাথায় ধর্ম্মের-পাগ। বিচার করিতেছে, "আমি অনেক পুণ্যফলে এই পদ পাইয়াছি। জগতের সকলেরই আমি পূজনীয়। বিচারককে মান্য না করে কে? আমি বাসনা অনুসারে কুটনীতিজাল বিস্তার করিয়া বিচারার্থী মৃগকে ধরিয়া থাকি। ইচ্ছমেতে ছাড়িয়া দিই, ইচ্ছা অনুসারে মৃগমাংস খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করি। যে নিয়মে একজনকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাই, কুটতর্ক জালে জড়িত—মোহিত করিয়া সেই নিয়মের বলে আর

একজনকে বেকসুর খালাস দিই। আমার মাথায় ধর্ম্মের টুপি, সেই জন্য বুঝিলেও কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম,—আমার প্রসাদভোজীরা ধর্ম্মাবতার!!! আমার বরে তাহারা চিরকালই অমর। হে মানব! তেমরা কি বিচারের ভজনা করিবে না? আমার এক দল প্রসাদভোজী আছে, তাহাদিগের নামে **জমিদার।** ইহারা আমার নামে ও বরে চিরদিন অমর। প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াও ইহারা নিস্তার পায়—কেবল আমার বরে। অতএব মানবগণ! আমার কার্য্য দেখিয়া—ক্ষমতা বুঝিয়া আমার পায় তোমরা স্মরণ গ্রহণ কর।” বিচার, বিপ্লবের কথা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম।

তৎপরে মদের চতুর্থ-অনুচর দেখিলাম! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, বদন বিত্রস্থ মুখে যন্ত্রণার কালিমা পরিব্যাপ্ত, ভ্রূক্ষেপ নাই। হতভাগ্যের এত যন্ত্রণা, যেন যন্ত্রণা বলিয়াই জ্ঞান নাই। নাম **নেশা।** “নেশা নেশার ঘোরে হাসিয়া, টলিয়া টলিয়া কহিতেছে, এমন মজা, মানব আর কোথাও পাইবে না। আমার কৃপায় মুকের কথা ফুটে, খীর লাঠি লইয়া ছুটে, অন্ধ চক্ষু পায়, লোকে দিব্য চক্ষে জগত দেখে।—আমার প্রসাদ পাইয়া লোক ধরায় অতি সুখে বিচরণ করে। আইস! আমি তোমাদিগোকে প্রসাদ দিব।” অতিকষ্টে নেশার কথা বুঝিলাম। এত জড়তার মধ্যে কথা গুলি সংগ্রহ করা সহজ নহে। যাহারা ক্ষুদ্রচিত্ত, তাহারা নেশার প্রলোভন ছাড়াইতে পারিল না। দলে দলে নেশার পায়ে গড়াইয়া পড়িল। আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। সকল অনুচরের কাণ্ড কারখানা দেখিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম।

ষষ্ঠ দ্বার।

দ্বারপাল—মাৎসর্য্য।

ষষ্ট দ্বারে আসিলাম। দেখিলাম, ষষ্ঠ দ্বারপাল আপনার খোস মেজাজে বসিয়া আছে। ভয়ানক গম্ভীর! চেহারায় কোন গাম্ভীর্য্য নাই, তবু যেন ভয়ানক গম্ভীর। মুখে নাই, কাহারও দিকে লক্ষ্য

নাই, আপনার ভাবে আপনি মত্ত। নাম দেখিলাম—**মাৎসর্য্য।** তখন বুঝিলাম। মাৎসর্য্য এইরূপই বটে! মাৎসর্য্যেরও অনেকগুলি অনুচর।

প্রথম অনুচরের নাম **অহংকার।** অহংকার মূর্ত্তি যেন দ্বিতীয় মাৎসর্য্য। পাছে ভূমিতলে পাদস্পর্শ হয়, এই ভয়ে অহঙ্কার উর্দ্ধপদ হইয়া আছে। মস্তক অতি ক্ষুদ্র; তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির গন্ধও নাই। অহঙ্কার বলিতেছে, "মানব! আমি আছি আর আমার আছে। পরের যা কিছু, তা কিছুই নয়! তোমরা হয় আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, নতুবা তোমাদের কিছুই থাকিবে না। অন্ততঃ আমার কিঙ্করগণ তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করিবে না। অহঙ্কার না থাকিলে সে আত্মাদর বুঝে না। যে নিজের ওজন নিজে বুঝে না," সে ক্ষুদ্রচিত্ত। সংসারে থাকিয়াও সে নাই। নিজের যে ওজন বুঝে অর্থাৎ নিজের ওজন বুঝিয়া লোকের কাছে যে তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ প্রদর্শন করে, সংসারে তাহারই মান, যশ, খ্যাতি অক্ষুন্ন হয়। যে নিজের মানমর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারে, কে তাহাকে গণনা করে? নিজে নত হইয়া উন্নত হইতে হয়, এ নীতি ক্ষুদ্রচিত্তের। যাহার ক্ষমতা আছে, সে চিরদিনই উন্নত থাকিবে। লোকে না বলুক, নিজের কাছে সে নিজে উন্নত। তাহাতেই তাহার অতুল সন্তোষ। যে নিজে সন্তুষ্ট—নিজে সুখী, তাহার আবার ভাবনা কি? অহঙ্কারের অহঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতায় কেহ বা তাহাকে ভজনা করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মাৎসর্য্যের দ্বিতীয় অনুচর **দম্ভ।** দম্ভের আকার অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু দম্ভ কম কি? সেই কোটর প্রবিষ্ট মটর-চক্ষু দিবা রাত্রি ঘূর্ণিত হইতেছে, তৃণ-পরিমিত হস্তের কণা পরিমিত অঙ্গুলীতে ঘন ঘন মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, সেই ভেকের ন্যায় পদে ভূমি তলে পদাঘাত হইতেছে, আস্ফালনের সীমা কি? দম্ভ কহিতেছে, "আমার মত বীর আর কে আছে? গর্ব্ব আমার ভ্রাতা। যেখানে সূচ চলে না, আমি সেখানে "হলচালন" করি, যেখানে শত সহস্র কৌশল হারি মানে, আমি সেখানে এক কথায় কার্য্যোদ্ধার করি, আমরা লাল চক্ষু দেখিয়া কত কত সুরবীর শঙ্কিত হয়। আমাকে ভজনা করিয়া যদি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিতে চাও, অগ্রসর হও।"

ভব-কারাগার।

পাপ-ক্ষেত্র।

ভিতরে যাই কিরূপে? এ সব দুর্দ্ধর্ষ দ্বারপালকে অতিক্রম করা আমার ত ক্ষমতায়ত্ত নহে। ক্ষমতা আছে কি না, পারিব কি না, তাহাও ত জানি না। নিজের বিশ্বাস বড় ভ্রান্ত! শেষে আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া কি দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইব? শেষে কি আবার দুরাচারের পীড়নে পীড়িত হইব? আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া আবার কি সংসারে ঘুরিব? আবার জন্ম? একদিকে শঙ্কা, অন্যদিকে কৌতুহল! এখন করি কি? সৌধশীরে চাহিলাম। দেখিলাম মা। মা আমার শক্তি-রূপা! শতশক্তির আসনে মা আমার বিরাজিতা? আহা! কি দেখিলাম! অপরূপ রূপ! এমন রূপ আর কখন দেখি নাই! কাতরে মা মা বলিয়া ডাকিলাম,—কত রোদন করিলাম, কত যাতনা জানাইলাম, চক্ষু মুদিয়া দেখিলাম; হৃদয় অন্ধকার। মা আমার হৃদপদ্মাসিনী, মা আমার যেন অপরূপ রূপে সাজিয়াছেন। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। শুনিলাম, কর্ণে যে অতি মধুস্বরে ধ্বনিত হইল, "আত্মা! মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর। আমি যে তোমাদেরই।" আহা। মা না হইলে এমন করুণা? করুণাময়ী মা আমার তাই এত করুণা। প্রাণ জুড়াইল, কর্ণ শীতল হইল, ধন্য জ্ঞান করিলাম। চাহিয়া দেখি, আমি সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে। দ্বারপালগণ কোথায় রহিল, জানিতেও পারিলাম না। আমি একেবারে বাড়ীর মধ্যে। অদূরে সৌধ। প্রাচীরে চারিদিকে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘর জীবপূর্ণ!—কিন্তু বিষাদ ময়!—অন্ধকার! একি হইল? জীবের এ পরিবর্ত্তন কেন?—নিরানন্দ কেন? হাসি গিয়া বিষাদ দেখা দিল কেন? রোদন কেন? আবার হাহাকার কেন? চীৎকারে কর্ণযুগল বধির হইল যে? আর্ত্তনাদে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে যে? হুঙ্কারে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে যে? এ কি ব্যাপার! অন্ধ-কারে জীবের এ কি যন্ত্রণা! কেন এ যন্ত্রণা? মনে করিলাম দেখিতে হইতেছে। দেখিলাম, কক্ষে কক্ষে অসংখ্য জীব,—দ্বারে দ্বারে নীল আলোকে শীর্ষোনাম লেখা। গৃহমধ্যে অন্ধকার।—আলোকের মধ্যে কেবল

দাতার ঋণ ঈশ্বর পরিশোধ করেন।

সেই নীল আলোক। গৃহমধ্যস্থ জীবের অস্তিত্ব কেবল কথা শুনিয়া বুঝিতে হয়। দেখিবার উপায় নাই। তবে কি আমি দেখিতে পাইব না? আমার দিব্য চক্ষু। মায়ের সন্তান আমি! আমি কি দেখিতে পাইব না? মায়ের কৃপায় অবশ্য দেখিব।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। এক প্রান্ত হইতে দেখিতে আরম্ভ করিলাম। আর্ত্তনাদ শুনিয়া—মর্ম্মভেদী বাক্য শুনিয়া হাসিতে কাঁদিতে বড় ইচ্ছা, তাই অগ্রসর হইলাম।

প্রথম গৃহে দেখিলাম, দ্বারদেশে নীল আলোকে লিখিত আছে, **কামুকাগার।** অতি অন্ধকার মধ্যে অসংখ্য লোকের চীৎকার, কর্ণবধির করিতেছে। পাপাত্মাদিগের আর্ত্তনাদে বড়ই কষ্ট হয়। এক স্থানে দেখিলাম, অতি অন্ধকার ঘরে একজন পাপী চীৎকার করিতেছে;—ঘরের চারিদিক হইতে চারিটি অগ্নিশিখা সবলে দুরাত্মাকে দগ্ধ করিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "প্রাণ যায়! রক্ষা কর! হায়, কেন কামের প্ররোচনায় এ পাপ করিলাম। পরস্ত্রীতে আশক্ত হইয়া কেন নিজের সর্ব্বনাশ করিলাম!—সতী! ক্ষমা কর। তোমার সতীত্ব-বহ্নিতে পুড়িয়া মরি।—ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! প্রাণ যায়। অসহ্য যন্ত্রণা! রক্ষা কর! রক্ষা কর। আমি **পরস্ত্রীগামী,** আমার এ যন্ত্রণা কি নিবারণ হইবে না? আর কতদিন দগ্ধ হইব? এ যাতনার ভার আর কতদিন বহিব?—প্রাণ যায়।" দুরাত্মার কথায় কেহ কর্ণপাতও করিতেছে না। আপন মনে চীৎকার করিতেছে। পাপীর শাস্তি দেখিয়া বুঝিলাম, এই বুঝি প্রায়শ্চিত্ত, এই বুঝি দণ্ড।

এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি লোক অনবরত চীৎকার করিতেছে। বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া অগ্নিশিখা বহিতেছে। দুরাচারগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আর যন্ত্রণা সহে না। অনুতাপ-আগুনে জলিয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম! হায় হায়! কি কুক্ষণে ইন্দ্রিয়পর হইয়াছিলাম, কোন অশুভক্ষণে বারাঙ্গণায় মজিলাম, হায় এ যন্ত্রণায় এখন প্রাণ যায় যে! মাতাকে কাঁদাইয়াছি, পিতার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি, পুত্রকন্যার মুখ চাহি নাই, সংসারে যাহারা আমার মুখ চাহিয়া ছিল, আমার প্রতিপাল্য যাহারা,

তাহাদিগকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি ! নিজের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য বারাঙ্গণা চরণে অর্পণ করিয়াছি ! তাহারই কি এই ফল ? হায় ! এ যন্ত্রণা নিবারণের কি উপায় নাই ? কুক্ষণে **বারাঙ্গনা গমন করিয়া** এই ফল হইল ?"

আর একস্থানে কতকগুলি লোকের দুর্গতি দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। পাপাত্মাদের উত্থান শক্তি নাই। সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। —কুক্কুর শৃগালাদি হিংস্র জন্তুরা দুরাত্মাদিগের হস্তপদাদি চর্ব্বণ করিতেছে। সেই বিভৎস দর্শন দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। দুরাত্মারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, হায় ! কেন ইন্দ্রিয়সেবা করিলাম। **অস্বাভাবিক অভিগমনে** কেন পাপ সঞ্চয় করিলাম ? এখন যে প্রাণ যায় ? হায় হায় ! শেষে শৃগালকুক্কুরের ভক্ষ্য হইলাম ?—এ যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না ? পরিণামে পোড়া অদৃষ্টে এই ছিল ? কুক্কুরী ! শৃগালী ! রক্ষা কর, ক্ষমা কর,—আর যাতনা দিস্ না !—আর চর্ব্বণ করিস্ না ! তীক্ষ্ম দন্তাঘাতে আর যাতনা দিস্ না !--রক্ষা কর।—উঃ ! প্রাণ যে যায় ?"

কুক্কুর শৃগালগণ এমন ভাবে সানন্দে চর্ব্বণ করিতেছে, তাহাদিগের ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা যেন বলিতেছে, "দুরাচার ! সতীত্ব জীব মাত্রেরই সমান। আমরা উন্নতিপথে যাইতেছিলাম, জীব জন্মের উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছিলাম, তুই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ ! আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া শৃগালী কুক্কুরী করিয়াছিস্, আজ তাহার প্রতিশোধ আর পাপের প্রতিশোধ লইব।" দুরাচারগণের যাতনা আর দেখিতে পারি না ! অন্যত্র প্রস্থান করিলাম।

সম্মুখে দেখি, আর এক বিভ্রাট ! কতকগুলি বিকটাকার স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিতেছে। অলক্ষ্য—সুতপ্ত লৌহশলাকায় বিদ্ধ হইয়া- হতভাগিনীরা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। অতিকাতরে শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ধড়ফড় করিতেছে। কহিতেছে হায় ! কেন রমণীর অমূল্য ধন সতীত্বরত্ন বিক্রয় করিলাম ? কেন নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলাম ? হা রূপ ! হা নয়ন ! হা হাবভাব ! তোরাই ত আমার সর্ব্বনাশ করিয়ছিস্ ! কেন এ পাপ করিলাম ! কতরূপের ছটা দেখাইয়াছি, কত সোহাগ আদরের প্রলোভনে কত লোককে প্রলোভিত করিয়াছি, কত যন্ত্রণা দিয়াছি,—ধন্য অর্থ ! তোর

অন্য না করিয়াছি কি? যাহার অন্নে প্রতিপালিত দেহ, তাহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছি! নারী জাতির অলঙ্কার দয়ারত্ন বিসর্জ্জন দিয়া কতজনকে পদাঘাতে দূর করিয়াছি, কতজনের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পথে বসাইয়াছি, তারই এ ফল! উঃ! প্রাণ যায়! সেই দুষ্কার্য্যের এই ফল জানিলে কি এ পাপ করি?" হতভাগিনীদিগের চীৎকারে দয়া হইল না। মনে ভাবিলাম, পাপিনি! পাপ করিয়াছ, ফলভোগ করিতে কুণ্ঠিত হইতে চলিবে কেন? কুলটা! স্বকার্য্যের ফলভোগ যে নিশ্চয় একথা তখন স্মরণ কর নাই কেন? বিবেককে পদাঘাত করিয়া দুষ্টবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়াছ, এখন তাহারই ফল ভোগ কর!

এবার যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়! উঃ! কি ভয়ানক! দেখিলাম, এক হতভাগিনী বিকট মুখভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হতভাগিনীর পেট ফাটিয়া অসংখ্য জীব নির্গত হইতেছে। যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তবুও সে জীব নির্গমের নিবৃত্তি নাই। অসংখ্য কুকুর শৃগাল, সিংহ, ব্যাঘ্র, মেষ, ছাগ, পক্ষী, কর্কট বিড়ালাদি নির্গত হইতেছে! যন্ত্রণায় চীৎকারে প্রতিধ্বনী মিশিয়া অতি ভীষণশব্দের ঘাত প্রতিঘাত উত্থিত হইতেছে। পাপিনী অতি কাতরে বলিতেছে, "হায় স্বপ্নেও জানিতাম না, ভ্রূণহত্যাকারিণীর পরিণাম এইরূপ হইবে! যে সন্তান পিতা মাতার জীবনধন, যে সন্তান পিতামাতার আশা ভরসা, যে সন্তান পিতা মাতার জলপিণ্ড স্থল, হতভাগিনী আমি, সেই সন্তান নষ্ট করিয়াছি। সংসারের সারধন সন্তান আমি স্বহস্তে নষ্ট করিয়াছি! উদর বিদীর্ণ হইয়াছে যন্ত্রণায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, তাতে যত না কষ্ট হইতেছে, সন্তানগণের এই দুর্গতিতে যে আমি ততোধিক যন্ত্রণা পাইতেছি। এখন মনে হইতেছে, হায়! এখনো যদি পাই, তাহা হইলেও জীবনধনগণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া—মুখ চুম্বন করিয়া এই যন্ত্রণা নিবারণ করি। হায়! রক্তপিণ্ড সন্তান শেষে হিংস্রক জীবজন্তুরূপ ধারণ করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে? প্রাণ যে যায়! পাপিনী—কুলকলঙ্কিনী আমি, যথেষ্ট প্রতিফল ভোগ করিতেছি। আমি যেমন ভ্রূণ অবস্থায় আপন সন্তান হনন করিয়াছি, ইহারাও যে আমায় তদ্রূপ যন্ত্রণা দিতেছে। উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতেছে, নাড়ী চিবাইয়া—বুকের শোণিত পান করিয়া যথেষ্ট ফল দিতেছে। হায়!

প্রত্যেক কার্য্যে ন্যায়ের অনুসরণ করিবে।

এখন উপায় কি? এ যন্ত্রণা কতদিনে ঘুচিবে? এ ভীষণ যাতনার হাত হইতে কতদিনে অব্যাহতি পাইব?"

একস্থানে দেখিলাম, বিকটাকার চেহারা। কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণদেহ, কতকগুলি মনুষ্য চীৎকারে গগণ ফাটাইতেছে। লোক নাই, জন নাই, শান্তিদাতা নাই, বড় বড় লৌহ যষ্ঠি আপনা হইতে দুরাত্মাগণের দেহে পতিত হইতেছে। দুরাচারগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "মার! মার! একবারে হত্যাকর। জীবন গ্রহণ কর! আর এ যন্ত্রণা সয় না! জীবনে তোদের জীবনে হত্যা করিয়াছি, তোদের প্রাণ নষ্ট করিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি, প্রতিশোধ গ্রহণ কর!—হত্যা কর!—দগ্ধ করিস না। জ্বালাস না!—একবারে হত্যা কর! প্রাণ নে! আর যন্ত্রণা সয় না! প্রাণ যাক, ক্ষতি নাই। জীবন এ যন্ত্রণার নিকটে তুচ্ছ!" নরহন্তাগণ অনবরত চীৎকার করিতেছে। শোণিতে দেহ ভাসিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। যন্ত্রণায় উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতেছে, রণরঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে।

আর একস্থানে দেখিলাম, হস্তপদহীন জীবন্ত নরদেহ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ গাভী কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইতেছে, হস্ত নাই—প্রতিনিবৃত্তি করিবে কিসে? পদ নাই—পলায়ন করিবার উপায় কি? দুরাত্মারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "মা! তুমি ভগবতী। তোমার কৃপায় শৈশবে প্রাণ পাইয়াছি, অসীম তোমার কৃপায় যৌবনে জীবন রক্ষা হইয়াছে! দুরাচার আমরা, তবুও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই, শেষে স্বহস্তে তোমাকে হত্যা করিয়া উদরস্থ করিয়াছি! উঃ! হত্যা করিয়া পোড়া পেট পূর্ণ করিয়াছি! প্রতিশোধ দাও মা, শৃঙ্গাঘাতে প্রাণ নষ্ট কর। পাপের প্রতিফল দাও। আমরা উপকার মানি নাই, তোমার শত উপকার মনে না করিয়া হত্যা করিয়াছি, তার প্রতিশোধ লও!—প্রাণ লও। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। তোমার শৃঙ্গাঘাত যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণে যন্ত্রণাপ্রদ যে মর্ম্মযন্ত্রণা, তাহাই ভোগ করিতেছি। আর পারি না মা! আর সহ্য হয় না!" গোঘাতীগণের কষ্ট দেখিয়া চক্ষে জল আসিল! তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

এবার যাহা দেখিলাম, তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠিল। অন্ধকার গৃহ! তন্মধ্যে যুগে আবদ্ধ দুরাত্মারা পরস্পর পরস্পরকে আহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। নিজের দেহে নিজের উদর পূর্ণ করিয়া—নিজের শোণিতে

নিজের পিপাসা দমন করিয়া তৃপ্তি হয় নাই, তাই এখনো ক্ষুধাতৃষ্ণা তাই পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করিবার চেষ্টা! প্রকাণ্ড মস্তক!—গলদেশ অতি ক্ষীণ! হস্তপদ অতি ক্ষুদ্র—ক্ষীণ, তবুও দুরাশা আছে। ইহারা **আত্মঘাতী।** নিজেকে নিজে হত্যা করিয়াছে। যন্ত্রণার ক্রটী নাই কিন্তু যে নিজের প্রাণ নিজে নষ্ট করিতে পারে, তাহার যন্ত্রণা বুঝিবার বুঝি ক্ষমতা নাই। এক একবার যন্ত্রণায় যেন ম্লান হইয়া পড়িতেছে; আবার আনন্দে পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। দুরাত্মাদিগের ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।
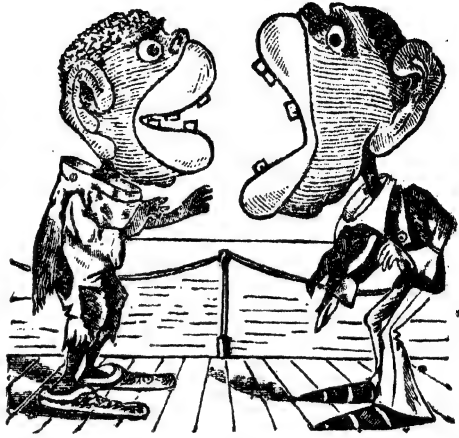
এক স্থানে দেখিলাম, অগণ্য লোক হস্ত হীন—একস্থানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। অসংখ্য কাক, শকুনী গৃধিনী তাহাদিগের কাহারও চক্ষু, কাহারও নাসা, কাহারও বা তালু ছিন্ন করিয়া আহার করিতেছে, দুরাত্মাদিগের চীৎকারে কর্ণপাত করে কে? হস্ত হীন, কাক শকুনীর আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষার উপায় কি? কহিতেছে "হায় কেন নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। তখন ফলাফল মানি নাই, কার্য্যের দণ্ডপুরস্কার আছে বুঝি নাই, তাই আজ এই যন্ত্রণা। **নিষ্ঠুর** আমরা, যাহাদিগকে নিষ্ঠুরতায় কষ্ট দিয়াছি, তাহারাই পক্ষীরূপে আজ প্রতিশোধ লইতেছে। যে সকল পক্ষী আনন্দের সহিত হত্যা করিয়াছি, তাহারাই এখন আমাদিগকে হত্যা করিতেছে। প্রাণ যায় এ যন্ত্রণা আগে জানিতাম না, এ শাস্তির প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাই আজ এত কষ্ট! উঃ! হৃদয় ফাটিয়া যায়, প্রাণ তবু বাহির হয় না!"

আর এক স্থানে উর্দ্ধমুখে কতকগুলি লোক রোদন করিতেছে। লোক

নাই, কিন্তু তাহারা যেন উপরের কোন লোকের কোন কথা শুনিতেছে। বলিতেছে, "প্রভু! আর যন্ত্রণা দিও না। **দুর্ম্মুখ আমরা**, কতজনকে কত মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়াছি, কতজনকে কত বিদ্রূপ কত শ্লেষ করিয়াছি, তখন বুঝি নাই কথার এত বিষ! আর যন্ত্রণা দিও না। মারিয়া ফেল, হত্যা কর,—জীবন শেষ কর, কথার বিষে আর দগ্ধ করিও না। বাক্যবাণে আর বিদ্ধ করিও না। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর। আর না প্রভু আর না।"

এবার দেখিলাম, এক যুপে বদ্ধ মণ্ডিতশীর্ষ বক্রদেহ মূর্ত্তি। নাম চোর। এখনো লোভ যায় নাই। যন্ত্রণায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, পশ্চাতে কালমূর্ত্তি বিকট মুখ ভঙ্গীতে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। এত শঙ্কা, তথাপি স্বভাব এখনো পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যন্ত্রণার মধ্যেও বাহু প্রসারণ আছে। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, চক্ষে জলধারা, হৃদয়ে যাতনা, তবুও স্বভাব যায় নাই। আত্মসাতের চেষ্টা আছে। দুরাচার কাতর হইয়া কহিতেছে, "আমি **চোর**। কতজনের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত, আমি একদিনে তাহা আত্মসাৎ করিতাম। এক এক জনের সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন আমি এক দিনে হস্তগত করিয়াছি। কাহাকেও দয়া করি নাই। কত বিধবার জীবনধন সবলে হরণ করিয়াছি, কত বালকের অমিয়বচন—করুণরোদন উপেক্ষা করিয়া সবলে গাত্র হইতে আভরণ হরণ ও পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। তখন ভাবি নাই, এমন দিন চির দিন থাকিবে না। তখন বুঝি নাই, কার্য্যের ফলাফল ভোগের এক দিন আছে। তাহা বুঝি নাই বলিয়াই ত আজ আমি বন্দী। হায়! কেন এ পাপ করিলাম শরীর ছিল, বল ছিল, বুদ্ধি ছিল, চেষ্টা করিলেই ত জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতাম, চেষ্টা করিলেই ত সৎপথে থাকিয়া সংসার চলিত। এত লোকের চলে, আমার চলিত না? কিন্তু হায়! তখন ত এ জ্ঞান আমার আইসে নাই, তখন ত বুঝি নাই, তাই এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হায়! কতদিনে পরিত্রাণ পাইব।

আর এক স্থানে অগণ্য রজত মুদ্রার মধ্যে এক এক জন লোক বসিয়া আছে। নীরবে নয়, চীৎকার করিতেছে। তাড়াতাড়ি আগ্রহ সহকারে

সেই রজত মুদ্রা কুড়াইতেছে, হাতে লইতেছে আবার "আগুন! আগুন! পুড়িয়া মরিলাম" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্যাপার দেখিতে গিয়া শুনিলাম, চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "এ স্বভাব হায় আজিও যায় নাই! এ কি শাস্তি? অর্থের লোভও ত্যাগ করিতে পারি না, স্বার্থ বুঝিয়া অর্থের জন্য প্রাণ দিয়াছি, স্বার্থ সাধনের জন্য—অর্থের জন্য কত কত অসাধ্য সাধন করিয়াছি, এখনও সে স্বভাব যায় নাই। তাই এই অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা। মনকে ত বাঁধিতে পারি না? স্বভাব ত যায় না? এ যে অগ্নি। অর্থ যে বহ্নি হইয়া দগ্ধ করিতেছে। এত পুড়িতেছি, এতবার দগ্ধ হইতেছি, তবুও ত এ স্বভাব যায় না। আবার!—আবার হাত দিতেছি! এই আবার দিলাম! এ যন্ত্রণার বিরাম কি হইবে না? যাই যে! এ শাস্তি কেন দিলে প্রভু। প্রাণ দিতে কাতর নই, শত শত বার সৃজন করিয়া শত শত বার নির্দ্দয়—অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রাণবধ কর, অকাতরে সহ্য করিব, কিন্তু এ যন্ত্রণা যে আর সহে না।"

আর এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি লোক পড়িয়া থাকিয়া চীৎকার করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখি, বিবিধ অস্ত্রে দুরাত্মাদিগের রক্ত মোক্ষণ হইতেছে। মস্তক খলে চূর্ণ হইতেছে। হতভাগ্যগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "তুচ্ছ জীবিকার জন্য অনেক লোক হত্যা করিয়াছি। পসারের জন্য অসাধ্যরোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াও প্রকাশ করি নাই, অধিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য রোগীকে অধিক দিন কষ্ট দিয়াছি, রোগীর সহিত কত ব্যবহারদুষ্ট কার্য্য করিয়াছি, চিকিৎসা না জানিয়া চিকিৎসক সাজিয়াছি, সর্ব্বনাশ করিয়াছি। জীবন লইয়া যাহাদিগের সম্বন্ধ, জীবনমরণ যাহাদিগের হাত, আমরা সেই চিকিৎসক হইয়া কতজনের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাই আজ এ যন্ত্রণা হায়! কেন দুষ্কার্য্য করিলাম? অন্য উপায়ে কি অর্থ উপার্জ্জন হইত না? জীবন কি থাকিত না? তাহাতেও ত ক্ষতি ছিল না। এ যন্ত্রণা অপেক্ষা তখন যদি প্রাণ দিতাম, তাহাও ভাল ছিল। হায়! এ পাপের এই শাস্তি?"

একটি মূর্ত্তি দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। মাথাটি অতি ক্ষুদ্র কর্কশ কেশে আবৃত। প্রকাণ্ড পেট। পেটের উপরে বসিয়া কাক, শকুনী প্রভৃতিতে উদর বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান করিতেছে।

উত্থান শক্তি নাই। কাক শকুনীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা থাকিলেও সিদ্ধ মনোরথ হইতেছে না, পড়িয়া থাকিয়াই চীৎকার করিতেছে। দন করিয়া বলিতেছে, "হায় কেন আমি **কুসীদজীবী** হইলাম! অধমর্ণের শোণিত তুল্য অর্থে আপন উদর পূর্ণ করিলাম কি কাক শকুনীর জন্য? হায়! ঋণ দান করিয়া অধিক সুদ গ্রহণ করিলাম, অর্থ লাভ হইল, শেষে কি এই যন্ত্রণা পাইবার জন্য? প্রাণ যে যায়? এ যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না? বুক যে ফাটিয়া গেল? প্রাণ যে যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। কেন এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম, কেন এ পাপ করিলাম, আজ শকুনী কাকের দংশনযন্ত্রণায় প্রাণ যে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। হায়! প্রাণ যে যায়?"

আর এক স্থানে দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড উদর। দূর হইতে বোধ হইল যেন একটী উদর মাত্র। হস্তপদাদি বিহীন এক অদ্ভুত মূর্ত্তি। নিকটে গিয়া দেখিলাম, হস্ত পদাদি আছে, কিন্তু উদরের তুলনায় তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিকটে গিয়া দেখিলাম, উদরের উপর লেখা **কৃপণ**। কৃপণের কথা কহিবার শক্তি নাই। ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বলিতেছে, "পেটের ভারে আমি যাই। এ যন্ত্রণা কি সহ্য হয়? এত কষ্টে পেটের উপর বাণিজ্য করিয়া ধনসঞ্চয় করিলাম,—পেট মোটা হইল। এখন পেটের ভারে মারা যাই। কাহাকেও এক পয়সা দিই নাই অতিথি ভিক্ষুককে কখন চাউল মুষ্টি দান করি নাই, নিজের আত্মাকে কত কষ্ট দিয়াছি, ভাল করিয়া পেট পুরিয়া আহার করি নাই, তাই আমার মোটা পেটের এত যন্ত্রণা। উদরের মধ্যে দিবারাত্রি আগুন জ্বলিতেছে, হস্তপদাদি দিন দিন উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদরের পরিধী বৃদ্ধি করিতেছে, পেটের দায়ে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না—"

এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি লোক ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া একটি কুসুম স্তবক ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। কুসুমস্তবক অতি নমিত হইতেছে, ইহারা তাহাই ধরিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছে, অমনি কুসুমস্তবক দূরে সরিয়া যাইতেছে। কুসুমস্তবকের উচ্চ নীচতার বিরাম নাই, লোকগুলিরও লম্প ঝম্পের বিরাম নাই। দেখিলাম কুসুমস্তবকে লেখা আছে, **আকাশকুসুম**। আর সেই গৃহদ্বারে লেখা আছে, **বঞ্চক আগার**। বঞ্চকগণ কহিতেছে,

"জীবনে কত জনকে বঞ্চনা করিয়াছি, কত জনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছি, কত জনকে আশায় নিরাশ করিয়াছি, কত জনকে হত্তাশকু- নিক্ষেপ করিয়াছি, কত জনকে আশার পর্ব্বতচূড়ায় তুলিয়া নিরাশ সাগরে ডুবাইয়াছি, কত জনের মর্ম্মযাতনায় হাসিয়াছি, তাই এখন আমাদের এ দুর্গতি! তাই এই আশায় নিরাশ। এ প্রতিফল কতদিন ভোগ করিব, এ কর্ম্ম ভোগ কত দিনে ঘুচিবে, তাহা জানি না।"

আর এক স্থানে এক জনের কষ্ট দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। এমন কষ্ট আর কেহ কখন পায় না। দুরাচারের উদর হইতে অগণ্য অস্ত্রশস্ত্র নির্গত হইতেছে। উদরাবরণ চর্ম্ম ভেদ করিয়া বিষাক্ত অস্ত্ররাশি নির্গত হইতেছে, বিদ্ধ হইতেছে, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। পাপাত্মা যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। শত শত অস্ত্রের আঘাত সহ্য করা কি সামান্য যন্ত্রণার বিষয়? হতভাগ্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিতেছে, "হায়! এত দিনে স্বকৃত পাপের শাস্তি পাইলাম। কত প্রলোভনে কত জনের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, প্রথমে ভাল কথায়—সদ্ব্যবহারে মোহিত করিয়া পরিশেষে সেই বিশ্বাসীর যথা সর্ব্বস্বধন হরণ করিয়াছি! বিশ্বাসী হইয়া বিশ্বাস জানাইয়া সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছি, বক ধার্ম্মিকসাজিয়া অসত্য সত্য নামে অঙ্কিত করিয়া সত্যের ধ্বজা উড়াইয়া—স্বার্থ সাধন

করিয়াছি। **বিশ্বাষ ঘাতক**, আমি, আমার এ পাপের কি পরিত্রাণ আছে? শতজীবন ধারণ করিয়া শত শত বার এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে! যন্ত্রণা ভোগে কাতর নই, কিন্তু হায়! রে পোড়া মন! এ কথা আগে কেন ভাবিস নাই? পাপের যে শাস্তি নিশ্চয়, এ কথা ত পূর্ব্বে এক দিনের জন্যও ভাবিস নাই? এত দিনে কর্ম্মভোগ আরম্ভ হইল। জানি না, আরও কত কাল এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।"

আর এক স্থানে দেখিলাম, অসংখ্য লোক অনবরত চীৎকার করিতেছে, তাহাদিগের শরীর আপনা হইতে ক্ষয়িত হইতেছে। যন্ত্রণার সীমা নাই। ব্যাকুল হইয়া কহিতেছে, "হায়! আমার এ যন্ত্রণা নিবারণ করিবার কেহ কি নাই? আগে কতজনকে দৃষ্টিতে দগ্ধ করিয়াছি, লোকের ভাল সহ্য করিতে পারি নাই, যে দিকে চাহিয়াছি, তাহাই দগ্ধ করিয়াছি, লোককে কত কষ্ট দিয়াছি, উন্নতির পথে কত বিঘ্ন দিয়াছি, কত কদাচারে—কত অসদ্ব্যবহারে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাই আমার দেহও ক্ষয় হইতেছে। জীবন্ত থাকিতে শরীর যেন ক্রমশঃ ক্ষয়িত হইতেছে, আমি হিংসা প্রবৃত্তির দাস হইয়া **হিংস্রক।** নাম কিনিয়া শেষে এই প্রতিফল পাইলাম? এ যন্ত্রণা নিবারণের কোন উপায় কি নাই? আমার এ কাতর রোদন কেহ কি দেখিবার নাই? এ যন্ত্রণা নিবারণের—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বলিয়া দিতে কাহাকেও ত দেখিতেছি না। এই কি প্রায়শ্চিত্ত?"
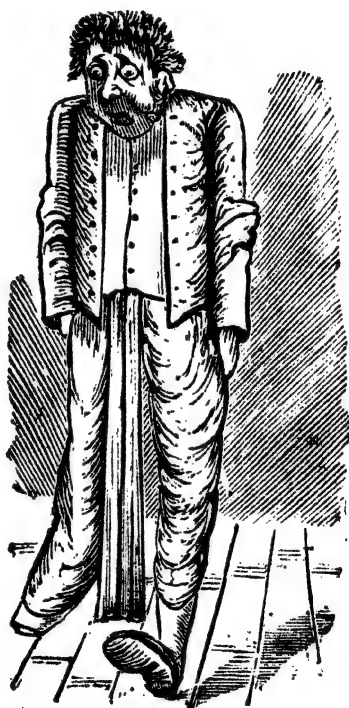
এবার দেখিলাম, একস্থানে বড় গোল! আর্ত্তের রোদনে—পাপীর চীৎকারে কানপাতা দায়। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম, একস্থানে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে কেহ বা যেন কোন দৈবীশক্তিতে আপনা হইতে ঘৃতপূর্ণ কটাহে পড়িতেছে, কেহ তপ্তলৌহ ফলকের উপর দাঁড়াইয়া লাফাইতেছে, শূন্যে থাকিতে পারিতেছে না, আবার নিম্নে পড়িলেও তপ্তলৌহে পদতল দগ্ধ হইতেছে। একস্থানে দেখিলাম, ক্ষুধাতুর মর্কটাবতারগণ সুপক্ক ফলভারাবনত বৃক্ষে উঠিয়া ফল আহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না। ক্ষুধায় জঠরানল প্রজ্বলিত, উপায় নাই। স্থানের নাম লেখা আছে, **গুরুদ্বেষীগণের কারাগার।**

তপ্তঘৃতপূর্ণ কটাহে পড়িয়া রোদন করিয়া বলিতেছে, "গুরো! রক্ষা কর! তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি, অধম তোমার অবাধ্যশিষ্য! উপদেশ গ্রাহ্য করি নাই, সদুপদেশ হাসিয়া উড়াইয়াছি, তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি। আর যন্ত্রণা দিও না। আর অশান্তি-ঘৃতকটাহে ফেলিয়া দগ্ধ করিও না। চৈতন্য হইয়াছে গুরো! আর দগ্ধ করিও না। ক্ষমা কর!"

তপ্ত লৌহফলকে ঝম্প দিতে দিতে দগ্ধপাদ হতভাগ্যগণ রোদন করিয়া বলিতেছে, "পিতা! পিতা! বড় কষ্ট দিয়াছি, সময়ে সেবা করি নাই, মান্য করি নাই, গ্রাহ্য করি নাই! তোমার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে কত আঘাত করিয়াছি! পিতা! আর কেন যন্ত্রণা দাও? প্রাণ যে যায়! এবার সুপুত্র হইব, পিতৃ আজ্ঞা পালন করিব, পিতৃ চরণ সার করিব! ক্ষমা কর, পিতা ক্ষমা কর! আর যাতনা দিও না।"

মর্কটাবতারগণ অতি কাতরে কহিতেছে, "মা! একটী ফল দাও মা! ক্ষুধায় মরি যে! কত কষ্ট দিয়াছি, তোমার কুসুমকোমল প্রাণে কত ব্যথা দিয়াছি মা! সময়ে পুত্রোচিত কার্য্য করি নাই, বৃদ্ধবয়সে প্রতিপালন করি নাই, কত কটুক্তি করিয়াছি, ক্রোধের বশে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি, কত গালি দিয়াছি, সেই পাপের আজ এই শাস্তি। মাতার দুগ্ধের ঋণ শত জন্মেও পরিশোধ হয় না, তা এখন জানিতেছি। আগে যদি জানিতাম, তবে কি এ পাপে পুড়ি? কিন্তু মা! মাতার প্রাণ যে স্নেহপ্রবণ, মাতার শতমুখী স্নেহস্রোত কুপুত্রের প্রতিও ত প্রবাহিত হয়। তবে কেন মা এ যন্ত্রণা? ক্ষুধায় মরি যে! এ জঠরানল যে নিবৃত্তি হইবার নয়।

ক্ষুধার্ত্ত সর্ব্বদাই পাচকের আলস্যতা দেখে।

এ মহাক্ষুধা যে শান্তি হয় না! প্রাণ যে যায় মা! একবার কৃপা কর! এবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সুপুত্র হইব মা! আর না, যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা আর কি শাস্তি আছে মা?” ইহাদিগের কাতরোক্তিতে বড় দয়া হইল। আহা! নির্ব্বোধ মোহমত্ত হইয়া কি ভয়ানক কার্য্যই করিয়াছে!

একস্থানে দেখিলাম, প্রকাণ্ড শোণিতপুরিষ-পূর্ণ হ্রদ। তন্মধ্যে অগণ্য পাপী পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। নাসাহীন, চক্ষুহীন, পদহীন, ছিন্নতালু অগণ্য পাপী সেই হ্রদমধ্যে পড়িয়া যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে। একজন বলিতেছে, “আমি ছার অর্থলোভে **ব্যবহারজিবী** হইয়াছিলাম, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিয়াছি, তর্ক জালে হয়কে নয়, নয়কে হয় করিয়াছি, তাই এখন অন্ধ হইয়া কৃমীপূরীষের হ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছি।” একজন বলিতেছে, “আমি ভ্রমেও কখন সত্য কথা কহি নাই। অর্থের লোভে কি স্বার্থসাধনের জন্য ত দূরের কথা, রহস্য করিয়াও মিথ্যা কথা কহিয়াছি, তাই আমার জিহ্বা তপ্তলৌহে দগ্ধ হইতেছে। পুরিষকূপে ডুবিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি **মিথ্যাবাদী,** ঘোর যাতনা ভোগ করিতেছি।” একজন বলিতেছে, “হায়! আমি অর্থলোভে কন্যা পুত্র বিক্রয় করিয়াছি, নয়নপুত্তলী কন্যা আমার বৃদ্ধের করে অর্পণ করিয়াছি, অর্থের দাস হইয়া কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, সুকুমার কুমার আমার অপরকে পিতৃ সম্বোধন করিয়াছে, আমার পোষ্য অপরের পোষ্যপুত্র হইয়াছে, আমি **শুক্রবিক্রয়ী,** তাই এই গলিত শোণিতমাংসহ্রদে ডুবিয়াছি, তালু গৃধিনীর তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ছিন্ন হইয়াছে।” কেহ বলিতেছে, “আমি **দৈবজ্ঞ** সাজিয়া মিথ্যায় প্রতারিত করিতাম। চতুরতায় লোককে মোহিত করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতাম কে জানিত যে, সেই পাপে আমাকে এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে? কে জানিত যে প্রতারণা পাপে লিপ্ত হইলে এতদূর কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে? **প্রতারক ও বঞ্চকের পরিণাম যে এই,** তাহা কে জানিত? আর একজন বলিল, আমি বিবাহ দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতাম। বংশজকে কুলীন করিয়াছি, কুলীনকে মৌলিক করিয়াছি, অন্ধ খঞ্জকে কন্দর্পতুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছি, তাই বুঝি আমার এ শাস্তি। আগে জানিলে এ যন্ত্রণায় আর কি দগ্ধ হই? **ঘটক** হইয়া শেষে আমার এই যন্ত্রণা?”

একজন বলিল, "আমি কখন ত কোন পাপ করি নাই। লোকের সম্পত্তি অর্থ প্রয়োজন হইলে তাহারই সংযোগ করিয়া দিতাম। তাহাতে সামান্য মিথ্যা কথা মাত্র বলিয়া আমার এ শাস্তি! আমার পাপ এতই কি গুরুতর যে আমি আজ নির্জ্জিত? আমার কি রক্ষাকর্ত্তা নাই?". একটী স্ত্রীলোক কাঁদিয়া বলিতেছে, "হায়! কে জানিত যে, এক জনকে সুখী করিলে এত কষ্ট পাইতে হয়! যুবক যুবতীর বাসনা পূর্ণ করিয়াছি, তাহা-দিগের সন্মীলন করিয়া দিয়াছি। মনে ছিল এই পুণ্যফলে স্বর্গবাসিনী হইব, কিন্তু হতভাগিনীর কপাল গুণে শেষে এই হইল! চিরকালই ত দূতীর মুক্তি গল্পে শুনি, আজ তার বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি! হায়! কপাল গুণে শেষে এই হইল?"

এক স্থানে দেখিলাম, একটী তেজোরাশীতে অসংখ্য মানব দগ্ধ হইতেছে। তেজের দাহিকাশক্তি অমানুষী। আমি দেখিতেছি, সে তেজ অতি শান্ত স্নিগ্ধ কিন্তু পাপীরা তাহাতে দগ্ধ হইতেছে। পাপীরা কাঁদিয়া কহিতেছে, "হায়! কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলাম। কেন সুখপ্রাপ্তির কামনায় পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম? এখন দেখিতেছি, ধর্ম্মতেজ সকলই সমান। তখন বুঝি নাই, তাই এখন এই শাস্তি! ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর—আর দগ্ধ করিও না, আর যন্ত্রণা দিও না, ধর্ম্মত্যাগী হইয়া বেশ শিক্ষা পাইলাম। আর কেন প্রভু?"

আবার দেখিলাম, এক ব্যাঘ্রভল্লুকপূর্ণ পিঞ্জর মধ্যে কয়েকটী মানব নিক্ষিপ্ত হইয়া আতঙ্কে কম্পিত হইতেছে। হিংস্র জন্তুগণ এক একবার বিকট মুখব্যাদন করিয়া দশনাগ্রে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। পাপীগণ অতি কাতরে রোদন করিয়া বলিতেছে, "বিধি! ব্যবস্থা! আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছি, একদেশদর্শিতামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীকে কত কষ্ট দিয়াছি, তাই বুঝি এ শাস্তি! এখন ত বুঝিয়াছি, উত্তম শাস্তি পাইয়াছি, আর তবে কেন কষ্ট দাও? অবিচারক যাহারা, তাহাদেরই এই শাস্তি! যে সকল দুর্বৃত্ত, ভুস্বামীগণ নিয়ম বিধি না মানিয়া প্রজার রক্ত শোষণ করে, তাহারও এই শাস্তি।"

একস্থানে দেখিলাম, অসংখ্য মানবকে কাল সর্পে দংশন করিতেছে। বিষে তাহাদিগের অঙ্গ জীর্ণ, কিন্তু মৃত্যু হইতেছে না। কাতর হইয়া

কহিতেছে, "যথেষ্ট হইয়াছে! সুরায় উন্মত্ত হইয়া—নেশায় মত্ত হইয়া যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহার শাস্তি যথেষ্ট ভোগ করিতেছি। জীবনে সুরা-বিষে দেহ জীর্ণ করিয়াছি, আর এখন এই বিষের প্রভাবে প্রাণ যে যায় উঃ! এ বিষম যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না। ক্ষণিক সুখের জন্য পরিণামে এত যন্ত্রণা? **মদ্যপ নেশার দাস** যাহারা, সেই সমস্ত হতভাগ্যগণ পরিণামে এই ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করে? হায়! এ জ্ঞান কেন পূর্ব্বে হয় নাই? এখন চক্ষু পাইয়াছি, তাই এত যন্ত্রণা ভোগ! এ কর্ম্মভোগ আর কি ফুরাইবে না?

দেখিতে দেখিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আর ঘুরিতে পারি না। পাপীগণের চীৎকার—আর্ত্তের রোদন আর শুনিতে পারি না! একদিক দিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাই, একবার সৌধ দেখিতে হইবে। যে স্থানের জন্য জীবমাত্রেই লালায়িত, সর্ব্বজন কাঙ্খিত সেই দিব্য স্থান দর্শন করিতে মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।

পথিমধ্যে একস্থানে দেখিলাম, এক অন্ধকার গৃহে কাষ্ঠ দণ্ডবৎ কতকগুলি জীব ঝুলিতেছে। শরীর এত শীর্ণ যে, কাষ্ঠ দণ্ড হইতে কোন প্রভেদ নাই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই শুষ্ক হইয়া দেহের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে! কথা কহিবার তাদৃশ শক্তি নাই। অতি ক্ষীণকণ্ঠে চিচি আওয়াজে শব্দ পাইলাম, "হায়। জীবনের এই পরিধাম। আমি যে বড় **অহঙ্কৃত** ছিলাম অহঙ্কারে মাটিতে পা দিতাম না, ধরাকে সরা জ্ঞান করিতাম, জগত আমার সম্মুখে তৃণ তুল্য ছিল, তাহারই বুঝি এই প্রতি-শোধ! এখন আমাকেই তৃণ হইতে হইয়াছে। আমার সব শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।" এই কথায় বাধা দিয়া আর একজন বলিল, "আমি বড় **গর্ব্বিত** ছিলাম, তাতেই বুঝি এখন এই দশা হইয়াছে। গর্ব্বোন্নত মস্তক তাহাতেই নিম্ন দিকে গিয়াছে। হায়! প্রাণ যায়। কি করি উপায়! কোথায় আশ্রয় পাই। রক্ষা পাই কিসে? হায় হায়! এ যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না?" আর একজন কাঁদিয়া কহিল, "হায়! **দাম্ভিক** হইয়াছিলাম? কেন সবলে দ্বার অতিক্রম করিলাম না? ক্ষুদ্রচিত্ত আমাদের, তাই আজ এই নরককুণ্ডে দগ্ধ হইতেছি।"

এসব আর সহ্য হয় না। তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম। পথিমধ্যে

দেখি, এক প্রকাণ্ড জ্যোতিঃ অগণ্য পাপীদিগকে দগ্ধ করিতেছে। দুরাত্মাগণ চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছে। একজনের কাতরতা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। হায়! কেন প্রলোভনে পড়িয়া লোকে পাপ সঞ্চয় করে? চিত্তবৃত্তি দমন না করিয়া স্বেচ্ছায় কেন এ-বহ্নিকুণ্ডে নিমর্জ্জিত হয়? এক জনের দেখিলাম তালু নাই,—দরদরিত শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত, দুরাচার চীৎকার করিয়া কহিতেছে,—"দয়াময়! অনাথ শরণ! পাপীর পরিত্রাতা! রক্ষা কর—রক্ষা কর। জ্বলিয়া গেল, দেহ পুড়িয়া গেল! হৃদয় ভস্ম হইয়া গেল, হায় হায়! প্রাণ যায়! করযোড়ে বলি, ক্ষমা কর! আর যাতনা দিও না! তুমি বিভাবসু! তুমি বহ্নি! তুমি সূর্য্য! তুমি চন্দ্র! আর না—আর প্রভু জ্যোতি দ্বারা দগ্ধ করিও না। প্রাণ যায়! দয়াময়! রক্ষা কর! পরিত্রাণ কর। উঃ! যাই যে! আর যে সহ্য হয় না!—রক্ত মাংস পচিয়া গেল, পুড়িয়া গেল,—প্রাণ গেল না কেন? দেব! জীবন লও!—শত শত বার জীবন লও!—পশুযোনীতে নিক্ষেপ কর,—আর যন্ত্রণা সহে না! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর!" আর সহ্য হয় না। পাপীদিগের এত যন্ত্রণা? পাপীর এত কষ্ট—এমন শাস্তি? এই শাস্তি ভুলিয়া লোকে আবার পাপ করে? আর ত থাকিতে পারি না। আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। দ্রুতপদে সৌধমুলে উপস্থিত হইলাম।

এই আমার শান্তি-কুঞ্জ।

এই সেই দিব্য সৌধ।

সৌধ মুলে আসিলাম। দেখিলাম, জ্যোৎস্নার গতিতে অতি স্নিগ্ধ—অতি মধুর আলোক রেখায় লেখা আছে,—শান্তিকুঞ্জ! আহা! এমন রমনীয় স্থান আর দ্বিতীয় নাই। পুষ্পসৌরভে দিক সকল আমোদিত। এখানে অন্ধকার নাই, শোক নাই, বিরহ নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, কেবল আনন্দ! প্রেম! শান্তি!

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড চাঁদনী। মধ্যে

মা আমরে রত্নসিংহাসনে আসীনা। সম্মুখে সাধুগণ ভক্তিচন্দনে সাধনা কুসুম চর্চ্চিত করিয়া মনের সুখে মায়ের চরণে অঞ্জলী দিতেছেন, অলক্ষ্যে সুমধুর বাদিত্র ধ্বনি কর্ণকুহরে সুধা সিঞ্চন করিতেছে। ভক্তগণের শত শত কণ্ঠ স্তুতিপাঠ করিতেছে,—আনন্দের সীমা নাই।

মায়ের এই দিব্য বেশ দেখিয়া হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইল। গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু বহিল। করযোড়ে জানু পাতিয়া বলিলাম, "মা! তোর এ বেশ সকলে দেখিতে পায় না কেন? তোর এবেশ দেখিলে তোর স্নেহের রাজ্য কি পাপস্রোতে ভাসিয়া যায়? তোর এ রূপ দেখিলে কি পাপাসক্ত জীব কষ্ট পায়? মা নত্যানন্দময়ি! অসংখ্যসন্তানপরিপালিনী বিশ্বমাতঃ! বিশ্বের সকলই ত তোর সন্তান! তবে সকলে তোর এ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না কেন? সকলকে এরূপ দেখাস না কেন মা? শুনেছি, সন্তান ত মায়ের সবাই সমান। কুপুত্র বলে তোর এত ঘৃণা তবে কেন মা? আশীতি লক্ষ যোনী ভ্রমণ কোরিয়ে—সন্তানদের পাপকূপে ডুবিয়ে এত যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কেন দিস মা? আজ যা দেখলেম, আজ পাপীদের যে কষ্ট দেখলেম, তাতে পাষাণের চোকেও যে জল আসে মা? আনন্দময়ি! এসব দেখেও কি তোর দয়া হয় না? তুই যে মা বিশ্বধাত্রি। তুই ত সবই দেখিস,— সবই শুনিস, তবে এ যন্ত্রণা দিস কেন মা? দয়াময়ি! এতদিনে নামে কলঙ্ক দিলে? এতদিন জানতম, তো হতেও তোর নামের মহিমা বড়, আজ, সে ভ্রম ঘুচালি মা? যারা পাপের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, তারাও ত তোর সন্তান? তারাও ত দয়াময়ী বলে রোদন কোচ্চে, তবে তাদের প্রতি তুই এত নিদয় কেন মা?" মা চাহিলেন। করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বৎস। সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি স্বকৃত কর্ম্মফলে এখানে আসিতে পারিয়াছ বলিয়া, দুষ্কৃত সন্তানের সাধ্য কি যে, এখানে প্রবেশ করে। আমি কর্ম্ম ফলের অধীন। যাহার যে বিধি, তাহা কি আমি অন্যথা করিতে পারি? সন্তানের জন্য—সন্তানের কাতরতায়—সন্তানের রোদনে— আমার বুক ফাটিয়া যায়; কিন্তু কি করিব, উপায় কি? আমি যে কর্ম্ম-ফলের অধীন। যে যেরূপ কার্য্য করে, সে যে তদ্রূপ ফলই লাভ করিয়া থাকে। পাপীরা পাপ প্রবৃত্তির বশে দুষ্কার্য্য করিয়াছে, আমি কি করি? আমার এই সব সন্তানও ত সেই একস্থান হইতে আসিয়াছেন? ইহাদিগকে

ত পাপের কবলে পতিত হইতে হয় নাই? ইহারা সবলে পাপকে দমন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ত এখানে স্থান পাইয়াছেন।" মা আরও বলিলেন, "সংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র। আমার সন্তান আমার মুখ রাখিতে পারিবে কি না, তাই দেখিবার জন্য তাহাদিগকে সংসারে পাঠাই। জীব আপন কর্ম্ম দোষে যাতনা ভোগ করে আমি কি করিব বৎস? *

যিনি সংসারে যাইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত না হয়েন, যিনি পাপের প্রলোভনকে তুচ্ছ, ভাবিয়া উপযুক্ত পথে গমন করেন, তিনি,—

"যিনি সংসারের নিয়ম বুঝিয়া হিতাহিত ও কর্ত্তব্যজ্ঞানকে দৃঢ় রাখিয়া সংসারী হয়েন, তিনি,—

যিনি সংসারকেই দিব্যস্থান মনে করিয়া বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, ও বৃদ্ধ বয়সের কর্ত্তব্যতা সমভাবে প্রতিপালন করেন, যিনি পিতামাতা জ্ঞাতি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, প্রতিবেশীর সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করেন, তিনি,—

যিনি সংসারে থাকিয়াও আমাকে না ভুলেন, যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া ভব সমুদ্রে জীবন-তরী সঞ্চালন করেন, যিনি সত্য ও ন্যায়কে মস্তকে রাখিয়া সংসারী হয়েন, যিনি জিতচিত্ত ও সংযত থাকিয়া সংসারী হয়েন, তিনি,—

যিনি সমস্ত কার্য্য করিয়াও তাহাতে কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহার কামনা কেবল সংসারের হিতের জন্য, যিনি পরের জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করেন তিনি;—

এবং যিনি ধর্ম্ম, ন্যায়, মিত্রতা, সৎ ও সদালাপে কালাতিপাত করেন, তাঁহারই জন্য এই—**শান্তি কুঞ্জ।**

পাঠক। এই আমার শান্তি-কুঞ্জ। আমি পাগল, বেশী কথা বলিলে আপনারা হয় ত শুনিবেন না। ইতি মধ্যেই হয় ত কত অসার কথা বলিয়াছি ক্ষমা করিতে হয় করিবেন, না হয় "পাগলের ফিলজফি" বলিয়া হাসিবেন। আমার কিন্তু এই পর্য্যন্ত শেষ। আমি আপনাদিকে শান্তিকুঞ্জ দেখিয়াছি, আহ্বান করিতেছি, আসুন! এই শান্তিকুঞ্জের সুখভোগ করিবেন।

বিদায় লইতেছি মনে রাখিবেন, পাগল শঠতা জানে না, প্রবঞ্চনা জানে না, কল্পনা জানে না। তাহার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা, তাহার সাধের ধন, আদরের বস্তু, জীবনের লেখা এই,—**শান্তি-কুঞ্জ।**

সমাপ্ত।